বাংলার ডাকাত

পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য

শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থা
এম.টি.৭৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০০০৭

BANGLAR DAKAT

By

PANCHUGOPAL BHATTACHARYYA

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৭০

শিল্পী : শ্রীবঙ্কিম সেনগুপ্ত

শিশু-সাহিত্য প্রচার সংস্থার পক্ষে শ্রীমতী শুভ্রা দত্তচৌধুরী কর্তৃক এম টি, ৭৩ কলেজস্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীপরাণ ঘোষ কর্তৃক পরাণ প্রেস ১১এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

দীপু, হাবুল, বুড়ো
ও বুড়ীকে—
—বাবা
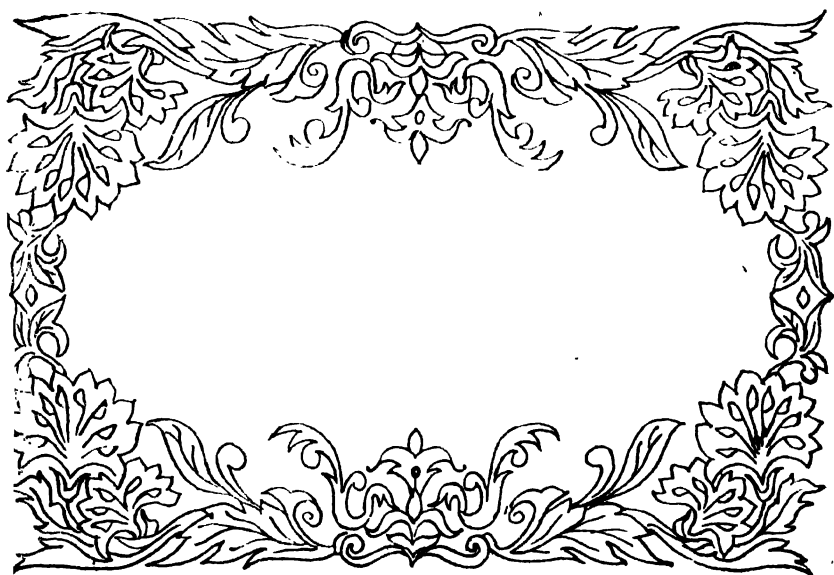
আমার কথা

গল্প কখনো লিখিনি। কোনোদিন যে লিখব তাও ভাবিনি। হঠাৎ একদিন সকালে শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র মশাই টেলিফোন করে বললেন—'বাংলার ডাকাত—এ সিরিজে ছোটদের জন্যে একখানা বই লিখুন না কেন?' বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে তাঁকে আমি আমার অক্ষমতা ও অনভিজ্ঞতার কথা জানালাম। কিন্তু সে সব কথা তিনি কানেই তুললেন না। বরং আমাকে বাক্‌বন্দী করে টেলিফোন রেখে দিলেন। প্রকাশনার দায়িত্ব নেবার আগে শ্রীসঞ্জীব দত্ত চৌধুরীও আমাকে বিশেষ কোনো কথাই বলতে দিলেন না। আমাকে না জানিয়েই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন। তারপর খগেনদা একদিন আমার বাসায় এসে উপদেশ নির্দেশ যা দেবার দিয়ে গেলেন। আমি তখন নিরুপায় হয়ে পুরোনো দিনের সরকারী নথিপত্তর ঘাঁটতে আরম্ভ করলাম। আমার অনুরোধে কেউ কেউ সেকালের ডাকাতদের গল্পও কিছু কিছু যোগাড় করে দিলেন।

এই করেই বইটি কোনো রকমে খাড়া করলাম। মানিক ঘোষ ও বিষ্টু ঘোষের জবানবন্দী দুটি সরকারী নথিপত্তের উপর ভিত্তি করেই লেখা। তবে এদুটি ঝাড়া অনুবাদও নয়, আবার নিছক গল্পও নয়। পরের তিনটী রচনার মূলে আছে লোকের মুখে শোনা টুকরো টুকরো গল্প। বাদবাকীটা কল্পনা দিয়ে গড়া।

বলা বাহুল্য যে খগেনদা ও সঞ্জীবের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। আর যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের নাম করা সম্ভব নয়। একত্রেই তাই তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নিজের তরফ থেকে সাফাই হিসেবে এইটুকুই শুধু বলতে চাই যে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে বইটী লিখতে হয়েছে। তাই দোষ-ত্রুটির পরিমাণ হয়ত একটু বেশী ভারীই হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও যাদের জন্যে লেখা তারা পড়ে আনন্দ পেলেই আমি খুশী। আর কিছু চাওয়ারও নেই, বলারও নেই।

ইতি
বিনীত
পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি

সাহিত্যক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এমন দু-একটি আকর্ষণীয় রচনার সহসা সন্ধান মেলে যে, রচয়িতা সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। এ যেন পুষ্পিতকাননে আচম্বিত এক নতুনের প্রকাশ যার শ্রীআছে, মাধুর্য আছে এবং যা চিত্ত-বিনোদন-গুণসম্পন্ন। সুতরাং আর পাঁচটি ভালর পাশে সযত্নে রক্ষার যোগ্য। শুধু তাই বা কেন তা প্রদর্শনেরও বটে। এই গল্পগ্রন্থখানি সেই রকমেরই কতকগুলি রচনা-সংগ্রহ যেগুলি বাংলার কিশোর পাঠক-সমাজের উদ্দেশ্যে রচিত, কিন্তু ভাল লাগবে সকলেরই। কেবল যে ভাল লাগবে তা নয়, তাদের মনে এমন সুস্থ চিন্তারও উদয় হবে, এমন অন্যায়, অমঙ্গল-কর্ম কেন করে এবং তা কি দূর করা যায় না? যেমন সকল রোগ একটি বা একাধিক কারণ-প্রসূত যা দূর বা উৎপাটন করলে সুস্থতা ও স্বাস্থ্য লাভ হয়, সমাজ-দেহ থেকেও এই অমঙ্গলের কারণগুলি দূর করলেও এমন অনর্থ ঘটতে পারবে না। কিন্তু মানবসমাজে স্মরণাতীত-কাল থেকে এই দুষ্ট রোগ ও তার কারণগুলি বর্তমান। তা দূর ও প্রতিষেধ করতে যে মানুষ সচেষ্ট নয়, তাও বলা যায় না। তবু এই রোগ নানা রূপে বর্তমান। কিন্তু কেন?

লেখকের কয়েকটি গল্পের নায়ক, অশিক্ষিত ও অতি সাধারণ স্তরের মানুষ, নিজ জবানবন্দীতে যা প্রকাশ করেছে, তা অতি মর্মস্পর্শী। তা থেকেই কিছুটা বোধ জাগে যে, মানুষ কেন নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, হিতাহিত-জ্ঞানহীন, দুর্নীতিপরায়ণ, সমাজ-বিরোধীতে পরিণত হয়। মানব-সত্তায় কেবল একটি ভাবই থাকে না—হিত-অহিত দুটিই বিদ্যমান। সুযোগ ও পরিবেশে তা নিজ নিজ রূপে প্রকাশ পায়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রত্নাকর ও অঙ্গলিমালের কাহিনী কে না পাঠ করেছে? মধ্য বা আমাদের সময়েও এমন কাহিনীও বিরল নয়। আমাদের আচার্য জগদীশচন্দ্রের শৈশবের পরিচর্যাকারী ত ছিল, এক কয়েদখাটা দুর্ধর্ষ দস্যু যে মুক্তি পেয়ে আচার্যমশায়ের পিতা যিনি মহকুমাশাসক ছিলেন এবং বিচারে লোকটিকে কারাদণ্ড দেন, তাঁর কাছে এসেই সৎপথে চলার উদ্দেশ্যে কর্ম প্রার্থনা করে। তিনিও তৎক্ষণাৎ নির্দ্বিধায় তাকে স্বীয় পুত্রের পরিচারক নিযুক্ত করেন। আর, সেও তার বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর পরিবার-বর্গকে নৌকাপথে একবার জলদস্যুদের কবল থেকে রক্ষা করে।

এই গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য কর্মজীবনে এমন এক দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত যে নিয়মিত সাহিত্য-কর্মে নিযুক্ত থাকার অবসর তাঁর নেই। তা থাকলে তিনি নিজে কতটা লাভবান হতেন বলতে পারবো না। তবে আমাদের বাংলার

বিশেষ করে কিশোর-সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হোত সে আশা প্রকাশ করতে বাধা নেই। তাঁর রচনার ভাষা, শৈলী, প্রকাশভঙ্গী যে সাবলীল, পরিচ্ছন্ন ও চিত্তগ্রাহী তা বলতে পারি। সাহিত্যের এক প্রধান উদ্দেশ্য হিতসাধন ও সৎশিক্ষাদান সে গুণ তাঁর সাহিত্যে আছে। তবে তাঁর সাহিত্যের যোগ্য-বিচারক পাঠক-সমাজই। তাঁদের সমাদর লাভই সাহিত্যিকের কাম্য। বিজ্ঞাপনে প্রচারের ব্যবসায়িক লাভ হতে পারে, কিন্তু তাতে সাহিত্য চিরন্তনী হয় না। কালজয়ী সাহিত্য কতকগুলি বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তা লেখকের ইচ্ছাধীন নয়, সমকালীন কত সাহিত্যই ত বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে!

এই পুস্তকের রচয়িতা যদি বাংলার পাঠক-সমাজে অতি পরিচিত হতেন তাহলে তাঁর রচনা বিষয়ক আলোচনায় আমাকে অতগুলি কথা বলতে হতো না। মানুষটির সম্বন্ধে পরিচয় দিলেই চলতো। মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশক মশায়েরই কাউণ্টারের ধারে। দেখলাম, একটি নেহাৎই সাদাসিধে মানুষ—চেহারায় বেশ কমনীয়তা, মুখে স্মিত ভাব, কথায় মিষ্টতা, কিন্তু একটু যেন ধারালো, হাতে একটা 'ফোলিও ব্যাগ' পোশাক, ট্রাউজার হাওয়াই শারট। দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না, মানুষটি বেশ বড় সরকারী চাকুরে; পদটি সমীহ করবার। চলে যেতে পরিচয় পেয়ে খুবই বিস্মিত হলাম। মনে পড়লো, মাসকতক পূর্বে 'সোনার কাঠিতে' পঠিত ভট্টাচার্য মহাশয়ের রচনাটি। তারপর ক্রমে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটলো। দেখলাম, মানুষটি বেশ পরিহাস-রসিক, 'বাঙলা' ও সংস্কৃত সাহিত্য বেশ মন দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং এখনও করেন। না করলে অমন সরস বাক্-পটুতা ও পরিহাস-প্রিয়তা সাধারণতঃ লাভ হয় না। অবশ্য এই গুণটি মানসিক গঠনের ওপরও অনেকটা নির্ভরশীল। মানসিক গঠনও হয় কতকটা স্বাভাবিক, কতকটা শিক্ষাগুণে। চাকরির কারণে, উঁচু-নিচু সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশতে হলেও মানুষটি অন্তরে খাঁটি বাঙালী।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশে জন্ম হলেও ভট্টাচার্যমহাশয়ের ও পরিবারবর্গের আচার-আচরণে কোন গোঁড়ামি নেই। পিতৃদত্ত শিক্ষা ও উপদেশ অন্তরে সযত্নে ধারণ করে কর্মপথে চলছেন। তার ফলেই চারিত্রিক নিষ্কলুষতা রক্ষা করতে সদাসচেষ্ট এবং তাতে সফলকামও বটে। ফলে কি কর্মক্ষেত্রে, কি সমাজে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

একদিন কথায় কথায় জানতে পারলাম, ভট্টাচার্যমশায়দের পৈতৃকভিটা চব্বিশ-পরগণা জিলার ভালুকা গ্রামে। সেখানে ডাকঘর নেই। ডাকঘর হলো আমডাঙা। ভালুগা নিতান্ত 'অজ-পাড়াগাঁ' হলেও কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষের বসবাসহেতু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভট্টাচার্যমশায়ের জন্ম সেখানেই; শৈশব পল্লীজননীর শ্যাম-স্নিগ্ধ কোলেই কাটে। ফলে পল্লী-সাহিত্যের, সঙ্গীতের প্রতি বেশ একটু টান দেখেছি। ভট্টাচার্য মশায়ের জন্ম ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বৎসরস্য প্রথম দিবসে।' পিতা বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যমশায় অনেকদিন স্বর্গত হয়েছেন, কিন্তু মাতা শ্রীমতী রামরঙ্গিনী দেবী এখনও জীবিতা।

তিনি মাতা-পিতার কথা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করলেন। তাতে বুঝলাম, তাঁর স্বভাবের কোমলতা, দীন-দুঃখী ও স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ এই দুটি মানুষের কাছ থেকে লাভ করে সযত্নে অন্তরে পোষণ করছেন।

পণ্ডিতের পুত্র হলেও ইংরেজীশিক্ষার প্রতি বীতরাগের পরিবর্তে অনুরাগই ছিল। সেকারণ, কলেজীয় শিক্ষা লাভ করেন, হুগলী মহসিন কলেজে এবং সেখান থেকেই ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে পর বৎসরেই কর্মজীবনারম্ভ এবং এখনও সেই বিভাগে সু-উচ্চপদে সুনামের সঙ্গে কর্মরত।

ভট্টাচার্যমশায়ের সাহিত্য-কীর্তি বৃহৎও নয়, বহু দিনেরও নয়—মাত্র তিনবছরে কয়েকটি রচনা। তাও ১৩৮২ সালে শিশু ও কিশোর পাঠ্য 'সোনার কাঠি' নামক মাসিক পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা থেকে। কিছুকাল আগে একদিন অপরাহ্নে তাঁর গৃহে গিয়ে দেখি, কতকগুলো পুরনো পাঁজি-পুঁথি, কাগজ-পত্র সদ্য রচিত পাণ্ডুলিপি পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। আমার উপস্থিতিটা হলো, বাণীর কমলবনে মত্তহস্তীর মতো। কিন্তু তাতে তাঁর কিছুমাত্র বিরক্তি উৎপাদন বা প্রশান্তির বিঘ্ন ঘটালো বলে মনে হলো না। সহাস্যে উঠে করজোড়ে আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। প্রসঙ্গক্রমে জানলাম, একটি বিষয় গবেষণা করছেন। শুনে আশ্চর্য হলাম! কর্মক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালনের পরও সাহিত্যিক-গবেষণায় মগ্ন হবার মতো মানসিক শক্তি ও অবসর কি থাকা সম্ভব? ক্ষুধা-তৃষ্ণা অবসাদ-নিদ্রা জয় না করলে কর্মটি সম্পাদন করা যায় কি করে? তিনি প্রাচীন 'বাঙলা' মুদ্রিত গ্রন্থের যতটা সন্ধান পেয়েছিলেন তার চেয়েও প্রাচীন গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয়টার উল্লেখ করলাম এবং কোথায় পাওয়া যাবে তারও হদিশ দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজের টুকরো নিয়ে আমার সঙ্গী 'সোনার কাঠির' পরিচালক তাঁর স্নেহভাজন সঞ্জীবচন্দ্রকে গ্রন্থখানি সংগ্রহের অনুরোধ জানালেন। তখনই জানতে পারলাম, বিখ্যাত হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশমশায়ের একখানি গবেষণামূলক চরিতকথা ভট্টাচার্যমশায় রচনা করেছেন। তদ্রচিত এই 'বাংলার ডাকাত' নামক গল্পগ্রন্থখানি 'গবেষণামূলক' না হলেও ইংরেজ আমলে বঙ্গসমাজের যে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তা পাঠের ফল। কেউ কেউ এই প্রতিবেদন পাঠ করে তৎকালীন সমাজের চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন বটে! তা কতদূর সাহিত্যপদবাচ্য হয়েছে, কিশোর পাঠক-সমাজই বলতে পারে। এখানিরও সাহিত্যিক-বিচার করবে তারাই। আমার মন্তব্য পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক, তবে আশা রাখি, 'বাঙলা' কিশোর সাহিত্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় কিছুটা সমৃদ্ধি লাভ করবেই। আর, এই সমৃদ্ধি যেমন হবে আনন্দের আকর, তেমনি চরিত্রগঠনের সহায়—মূলের বিশ্লেষণে এই পাপের কারণ উন্মুলিত করতে সচেষ্ট হবে। সমাজ একভাবে থাকে না, থাকতে পারে না। তা সতত পরিবর্তনীয়। সে পরিবর্তন ঘটায় মানুষ। তারই কর্মের ফলে সমাজ ভবিষ্যে এমন একটা স্তরে উন্নীত হতে পারে যখন সমাজ-বিরোধিতার কারণ থাকবে না।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

মাণিক ঘোষের (গোয়ালার) আত্মকথা

"আমি কেন ডাকাত হ'লাম ? সে আর কি বলবো, হুজুর ! আমার বয়স যখন এককুড়ি দুই কি তিন তখন বাবা হঠাৎ খেরেস্তান হয়ে গেলেন। তা যান গিয়ে তিনি। কিন্তু বাড়ীশুদ্ধ সবাইকেই যে তিনি খেরেস্তান বানাবার তাল খুঁজতে লাগলেন। বাবার পয়সায় তখনও খাই পরি বটে বাবার জমিতেই চাষ আবাদও করি। কিন্তু পেটের জন্যে তো আর জাতধম্মো খোয়াতে পারি না। তাই বাবার বাড়ী ছেড়ে পালালাম। গিয়ে পড়লাম একেবারে সেই খিদিরপুরে। সেখানেই আমার ডাকাতিতে হাতে খড়ি।"

নদীয়া জেলার নামকরা ডাকাত মাণিক ঘোষ ডাকাত-ধরা সাহেবের কাছে জবানবন্দী করে চলেছে। সে প্রায় একশ বিশ বছর আগেকার কথা। নদীয়ার কয়েকজন দুর্দ্দান্ত গোয়ালা মিলে একটা জবরদস্ত ডাকাতের দল খুলেছিলো। তখনকার দিনের সরকারী কাগজ পত্রে নদীয়ার গোয়ালা ডাকাতের কথা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আছে। জেলার গাঁয়ে গাঁয়ে তারা ডাকাতি করে বেড়াত এবং সুযোগ বুঝে নৌকার ওপরও তারা চড়াও হতো। তাদের অত্যাচারের ভয়ে গাঁয়ের লোকেরা আতঙ্কে রাত

কাটাতো ও ভগবানের নাম জপ করতো। শেষে একদিন মাণিকের পাপের ভরা পূর্ণ হলো। সে ধরা পড়ে গ্যালো। তখন তার বয়স মাত্র সাঁইতিরিশ কি আটতিরিশ। এইটুকু বয়সেই সে কম সে কম আটতিরিশটি ডাকাতি করেছে ও ডাকাতদের সর্দার বলে নাম মানে দুর্নাম কিনেছে। বুদ্ধিও তার তখন যথেষ্ট পেকেছে। ধরা পড়ার পর বুঝতে আর তার বাকী রইলো না যে এবার আর জাল কেটে বেরোবার উপায় নেই। তাই সে ডাকাতধরা সাহেবের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করলো ও আটতিরিশটি ডাকাতির কথাই খুলে বলে গেল। সাহেব সব শুনে হয়তো তাকে রেহাই দেবেন—এই ছিলো তার আশা। শেষ পর্য্যন্ত সাহেবের হাতে তার কি হাল হয়েছিলো সে পরের কথা। এখন তোমরা মাণিকের মুখেই শোনো কয়েকটা বাছা বাছা ডাকাতির গল্প এবং ডাকাতদের হরেক রকম ফন্দী ফিকির ও সংস্কার বা কুসংস্কারের কথা। তবে মনে রেখো একশ বিশ বছর আগে দেশে তেমন ভালো পথ ঘাট ছিল না। জলপথেই লোকজন বেশী যাতায়াত করতো। বেচাকেনার জন্যে মালামাল ও নৌকো করেই আনা নেওয়া করতে হতো। চোর-ডাকাত ধরার জন্যে পুলিশী ব্যবস্থা যা ছিলো তাও একান্তই নড়বড়ে। তাই ডাকাতদের তখন একেবারে পোয়া বারো।

মাণিক। খিদিরপুরে তখন দু'জন নামজাদা ডাকাতের ঘাটি ছিলো। তারা হলো—মনোহর ও কুবের। মনোহর আবার আমায় একজন আত্মীয়ও বটে। একদিন মনোহর ও আমরা ক'জন মিলে নদীতে চান করতে নেমেছি। হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম যেন মনোহর ও কয়েকজনে মিলে নৌকো লুঠ করার ফন্দী আঁটছে। আমি তখন এসব কাজ কারবার কিছু বুঝি টুঝি না। কিন্তু অল্প বয়স তো বটে; ভাবলাম দেখিই না ব্যাপারটা কি। মনোহরকে তাই শুধোলাম—'ভাই, নৌকো লুঠ করবে নাকি?' মনোহর বললো—'কেন? তুমি যাবে একাজে আমাদের সঙ্গে?' আমি বললাম—'আমি তো জানিই না এসব কাজের রকম সকম।' মনোহর তখন সবকিছুই আমাকে আগাগোড়া বুঝিয়ে দিলো। আমিও তাদের দলে নাম লেখাতে রাজী হয়ে গেলাম।

সাহেব। এককথায় একেবারে ডাকাত বনে গেলে? আচ্ছা, বলতে পারো দিন দিন কেন ডাকাতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে?'

মাণিক। তা আর বাড়বে না কেন, হুজুর! গরীব গুর্ব্বো লোকেদের

ডাকাতি করা ছাড়া আর উপায় কি ? বছরের পর বছর অজন্মা চলেছে। চাষীর ভাঁড়ারে যে চাল একেবারে বাড়ন্ত। তাছাড়া সকলেই তো দেখতে পাচ্ছে যে ডাকাতরা বড় একটা ধরা পড়ে না। কালে ভদ্রে যদি বা দু'এক-জন ধরা পড়ে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা আর টেঁকে কটা ?

সাহেব। বুঝলাম ! এবার তোমার ডাকাতির কথা আরম্ভ করো।

মাণিক। মনোহর ও কুবের দু'জনই ছিলো ওস্তাদ লাঠিয়াল। তাদের সঙ্গে থাকলে ভয়টা আবার কি ? তাছাড়া বয়সও তখন আমার সবে কুড়ি পেরিয়েছে, ইয়া বুকের ছাতি, গায়ে অসুরের বল ; শক্ত হাতে লাঠি ধরতে পারি এবং মাছের মতো সাঁতার দিয়ে নদী এপার ওপার করি। তাই ভাবলাম না খেয়ে মরার থেকে দেখিই না একবার দুবার ডাকাতি করে। প্রথম দিকে দু-চারটে নৌকো লুঠ করে আমি হাত পাকাই। নৌকো লুঠ করার ঝুঁকি অনেক কম। নৌকোর ওপর লোকজন থাকে কম এবং গাঁয়ের লোকেরাও দল বেঁধে ডাকাতদের বাধা দিতে পারে না। আর বেগতিক দেখলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালাবার পথ তো খোলাই থাকে। এই সব কারণেই মনোহর একটি নৌকো লুঠ করার কাজে আমাকে সামিল করে নিলো। মনোহরের সঙ্গে তখন আমি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি ; আমাদের খাওয়া বা থাকার কোনো ঠিক ঠিকানাই নেই। মনোহর একদিন বিকেলে নদীর কোল ঘেষে বেড়াচ্ছিলো। চলন্ত নৌকোগুলির মধ্যে মালামাল কি আছে তার খবরাখবর যোগাড় করার মতলব আর কি ! এমন সময় একটী নৌকো দেখে তার মনে সন্দেহ জাগে। ব্যাস, সে অমনি নৌকোর পিছু নিতে শুরু করে। বেশ খানিকটা পথ এসে দ্যাখে যে নৌকোটী বারগোড়া বলে এক জায়গায় নোঙর করেছে। নৌকোটী একটী বামুন ঠাকুরের ; ভেতরে যে মালামাল বেশ কিছু আছে এ ব্যাপারে আর তার সন্দেহ রইলো না। তবে আর কি, এবার কাজে লেগে গেলেই তো হয় ! কিন্তু লোক কোথায় ? সে আর এমন শক্ত কথা কি ! মনোহরের ডাকে সেই রাতেই বেশ কয়েকজন লোক জুটে গ্যালো। গভীর রাতের অন্ধকারে আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। মাঝপথে একটা নৌকো থেকে লগি চুরি করলাম। কয়েকটী লগির মুখ ছুঁচলো করে বাঁশের বর্শা বানিয়ে নিলাম, আর দু'চারটে-কে কেটে ছেঁটে লাঠি হিসেবে সঙ্গে নিলাম। তখন নিশুতি রাত। গাঁয়ের মধ্যে কোনো সাড়া শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু শ্যালের 'হুক্কা হুয়া' ডাক শোনা যাচ্ছে।

আমার তো সেই প্রথম কাজ কি না। তাই গা ছম ছম করতে লাগলো—না জানি কি হয়! যা হোক আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসে মাঝ রাত নাগাদ বারগোড়ায় পৌঁছে গেলাম। একে তো জমাট অন্ধকার, তার ওপরে পাড়ের গাছগাছালির কালো ছায়া পড়েছে নদীর জলে। তাই বামুন ঠাকুরের নৌকেটাকে পেরথম চোটে আমরা দেখতেই পেলাম না। কিন্তু মনোহরের চোখ রাতে যেন বাঘের মতন জ্বলতে থাকে। দু'এক মিনিটের মধ্যেই বামুন ঠাকুরের নৌকোটা তার নজরে পড়ে গ্যালো। তারপরই হামলা শুরু। আমরা আচমকা নৌকোর ওপর চড়াও হয়ে গেলাম। আমাদের দলে গুরুচরণ বলে একজন পাকা লাঠিয়াল ছিলো। মনোহরের হুকুমে তার ওপরে ভার পড়লো বামুন ঠাকুরকে কাবু করার। আর আমি তার সাথী হলাম। মাঝি মাল্লাদের ভার নিলো সর্দার মনোহর
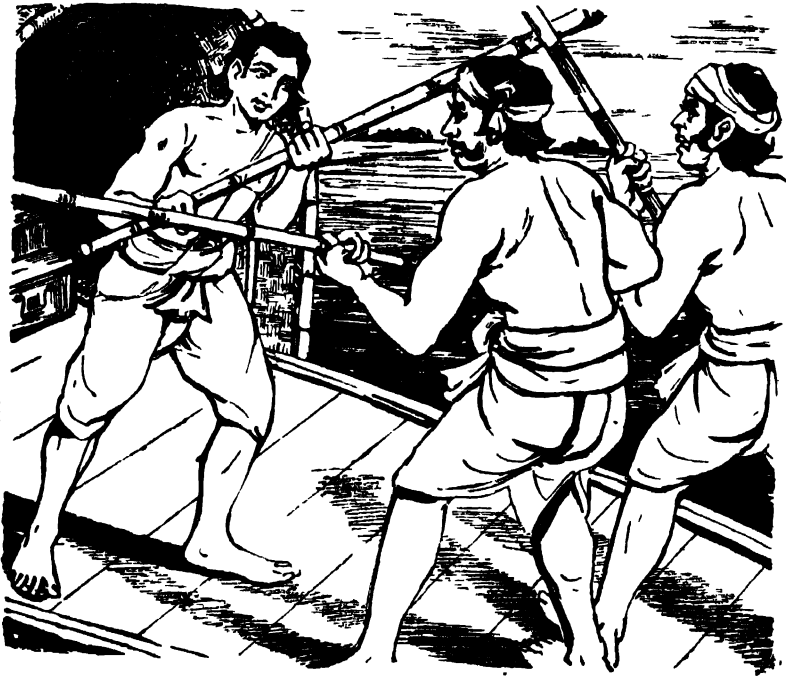
নিজে। সঙ্গে অবিশ্যি তার দলের অন্য লোকজনও ছিলো। আমরা নৌকোর ভেতরে গিয়ে দেখি বামুন ঠাকুর ঘুম ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে; হাতে তার একটা বেশ মজবুৎ লাঠি। আমাদের দেখে ঠাকুর মশায় হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—'দুর হ' তোরা; আমার নৌকোয় ডাকাতি করতে এসেছিস,

তোদের সাহস তো কম নয়।' গুরুচরণ জবাব দিলো—'ঠাকুর! লাঠি ফ্যালো। ঘণ্টা নেড়ে তুমি চুল পাকিয়েছো; তোমার হাতে ঘণ্টাই মানায়। আমার সঙ্গে লাঠালাঠি করা সহজ কাজ নয়। বরং যা আছে দিয়ে দাও, আমরাও তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালাই।' এই না শুনে রাগে বামুনের চোখ জ্বলে উঠলো। তারপর আমি অবাক হয়ে দেখি যে বামুনের হাতের লাঠি যেন উড়ে চলে এলো গুরুচরণের মাথার ওপর। গুরুচরণ কোনোরকমে এদিক ওদিক করে চোটটা এড়িয়ে গ্যালো। শুরু হলো দুজনের লড়াই। গুরু চরণের মুখে রা নেই। বামুন ঠাকুর মাঝে মাঝেই হুঙ্কার ছাড়ছে—'শয়তান, আজ তোকে আমি যমের বাড়ী পাঠাবো, তবে আমার নাম।' তার হাতের লাঠি এত জোরে ঘুরছে যে গুরুচরণ কিছু ঠাহরই করতে পারছে না। আমি ও শুনছি স্রেফ সাঁই সাঁই আওয়াজ। কয়েক মিনিটের মধ্যে গুরুচরণ যেন কেমন কাহিল হয়ে পড়লো। বুঝলাম আর দেরী করলে, গুরুচরণের লাস পড়ে যাবে। তখন আমিও তার সাহায্যে এগিয়ে গেলাম। তাতেও একটুকু দমে না বামুন। বলে কিনা—'আয়, তোকেই আগে সাবাড় করবো'। হয়তো, করতোও তাই! কিন্তু আমাদের ডাক শুনে মনোহর সর্দার তখন এসে গেছে। তিনজনে মিলে বহু কষ্টে অমরা শেষে বামুন ঠাকুরকে বাগে এনে তার হাতের লাঠি ফেলে দিই। বামুন তখনও গজরাচ্ছে— লজ্জা করে না তোদের! যদি বাপের ব্যাটা হোস তবে একে একে লড়ে যা আমার সঙ্গে।' সর্দার বললো, ঠাকুর মশাই, সত্যিই তুমি লাঠি ধরতে শিখেছিলে বটে। কিন্তু এবার ভালোয় ভালোয় যা আছে সব বার করে দাও।' বামুন ঠাকুর তখন নিজের পরণের কাপড়ের গেঁজ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা বার করে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিলো। বললো—'ব্যাটাদের মরণ বাড় বেড়েছে। বামুনের টাকায় হাত! তোরা শীগ্‌গীরই ধরা পড়বি ও জেলে পচে মরবি!' মনোহর হেসে বলে—'ঠাকুর এই কলিকালে আর শাপমণ্যি কিছু ফলে না। তা, দেখি তোমার চালানটা।' চালানটা নিয়ে মনোহর সর্দার গম্ভীরভাবে সেদিকে খানিকটা তাকিয়ে রইলো—যেন কতোই না সে লেখাপড়া জানে! তারপর গোটা নৌকোটা আমরা তছ্‌নছ্‌ করে দেখলাম। কিন্তু টাকাকড়ি আর কিছুই পাওয়া গ্যালো না। চার পাঁচ থলে পেতলের বাসনপত্তর ও কয়েক বস্তা নোতুন কাপড়চোপড় অবিশ্যি আমরা পেলাম। এবং তাই নিয়েই আমরা চম্পট দিলাম।

সাহেব। পুলিশ তোমাদের খোঁজখবর করে নি?

মাণিক। পুলিশ তো সাধ্যি মতো খোঁজ খবর করেই থাকে। কিন্তু আমাদের টিকির নাগাল পেলে তো? আমি একরকম গা ঢাকা দিয়েই বেড়াতে লাগলাম। লুটের মাল বলতেও আমার কাছে কিছুই ছিলো না। আমি আগে ভাগেই সে সব বিক্রিসিক্রি করে চার পাঁচ টাকার মতো পেয়েছিলাম। কিন্তু হুজুর, বামুনের শাপ ফলতে দেরী হয় নি।

সাহেব। কি রকম?

মাণিক। কিছুদিনের মধ্যেই মনোহর ও কুবের একটী মহাজনের নৌকো লুঠ করে। মহাজন থানায় নালিশ করে ও জোর তদন্ত শুরু হয়। দারোগাবাবু লোকমুখে খবর পেয়ে মনোহর ও কুবেরের বাড়ীতে খানাতল্লাসী চালায় ও কিছু কিছু লুঠের গহনাপত্তর উদ্ধার করে। ব্যাস, আর যাবে কোথায়? বিচারে এই দুই সর্দ্দারের পাক্কা নয়-নয়টি বছর করে মেয়াদ হয়ে গ্যালো।

সাহেব। প্রথম ঘর-ডাকাতি কোথায় করলে তুমি?

মাণিক। পেরথম্ ঘর-ডাকাতি? হ্যাঁ, মনে পড়েছে হুজুর। অগ্রোদ্বীপ থানার জগন্নাথ পুরে পদু যোগীর বাড়ীতে যে ডাকাতি হয়েছিলো না, সেটাই হলো আমার জেবনের পেরথম ঘর-ডাকাতি। সে ডাকাতিটাও আমরা করেছিলাম কেমন যেন ঝোঁকের মাথায়—মানে গোড়ায় আমাদেব মতলব ছিলো অন্য রকম।

সাহেব। খুলে বলো, সব কথা।

মাণিক। আমি তখন পোলতায়। তখনও আমার পুলিশের ভয় কাটেনি। দিনের বেলা তাই বড় একটা বার হতাম না। রেতের বেলা একদিন বেরিয়ে পড়লাম, বংশীর খবর নিতে।

সাহেব। বংশী কে?

মাণিক। ওহো! সে কথা যে বলতে ভুলেই গেছি। কয়েকদিন আগে একটা নৌকো লুঠতে গিয়ে বংশী বেচারা রীতিমত জখম হয়েছিলো। তাই বংশীর খবর নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু করতে গেলমে এক, আর হয়ে গ্যালো আর এক। খুজে খুজে হাল্লাক হয়ে গেলাম, কিন্তু কোথায় বংশী? এদিকে তখন রাত বেশ বেড়ে গেছে; গাঁগুলিও নিঝুম হয়ে পড়েছে এবং জনমনিষ্যির টিকিটিও আর দেখা যাচ্ছে না। বনের পথ ভেঙে খরপায়ে চলেছি। হঠাৎ খেয়াল হলে,—আরে, বনের ভেতরে যেন আলো দ্যাখা যায়।

সাতপাঁচ ভেবে বনের ভেতরেই সেঁদিয়ে পড়লাম। খানিকটা তফাৎ থেকেই ঠাহর করে দেখলাম যে একদল লোক গোল হয়ে বসে গুলতানি করছে। বুঝলাম যে ব্যাটারা ডাকাতির ফন্দী আঁটছে।

সাহেব। কি করে বুঝলে সে কথা?

মাণিক। হুজুর, রাত-দুপুরে অজগর বনের মধ্যে বসে কেউ কি শাস্তোবের কথা শোনে? তাছাড়া দলে মিলে ভগবানের নাম ওখানে আর কেই বা করে! সে যাক্ হুজুর, কাছে গিয়ে দেখি যে যা ভেবেছি ঠিক তাই। দলের মধ্যে রয়েছে পবন ঘোষ। শান্তিপুর থানার বৈঁচী গাঁয়ে তার বাড়ী। কিন্তু পোলতায় সে বেশ কিছুদিন ছিল বলে আমি তাকে চিনতাম। সেই পবন ঘোষই দেখলাম যে সর্দ্দার বনে গেছে। ডাকাতির সুড়ুক সন্ধানটা যুগিয়েছে অবিশ্যি বংশী আর লোক জুটিয়েছে পবন। বেলপুকুরের এক বামুনের বাড়ীতে ডাকাতি করার শলা-পরামর্শো চলেছে। আমি আর থাকতে না পেরে বললাম—'দ্যাখ্ ভাই, বেলপুকুরের পাশের গাঁয়েই আমি অনেক দিন থেকে আছি। কাজেই সেখানে গেলে আমাকে নিশ্চয়ই চিনে ফেলবে। তার থেকে চল্ না কেন কাছে পিঠেই আমরা একটা নৌকো লুঠ করি গিয়ে। একটা শাঁসালো নৌকোর খবর আমিই না হয় জোগাড় করে দিচ্ছি।' তারা এক কথায় রাজী হয়ে গ্যালো এবং আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। একটা আম বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখি একটা লোক আম পাহারা দিচ্ছে। সে শুধালো -'কোথা, যাও?' বললাম— 'আমরা সুজনপুরের কলের লাঠিয়াল গো। রেতে আমরা গোরু ধরতে বেরিয়েছি।' কিন্তু ব্যাটার রকম সকম দেখে মনে হলো যেন সে আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেলেছে! এদিকে তখন খিদেতেও আমাদের পেট চুঁই চুঁই করছে। তাই আমরা থেমে, তার কাছ থেকে কয়েকটা আম চেয়ে খেলাম। তারপর আবার সব হাঁটা দিলাম। ভোর রেতে হাজির হলাম গোতপাড়ার ঘাটে। অনেক নৌকোই সেখানে হরহামেশা নোঙর বেঁধে থাকে। দলের দু'একজন লোক ঘাটেই রয়ে গ্যালো—দিন-ভোর তারা নৌকোর সব খবরাখবর নেবে আর কি। সাঁঝবাতি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে কি ঝড় তুফান! ঠিক সেই সময় মুর্শিদাবাদ থেকে একটী মহাজনী নৌকো এসে গোতপাড়ার একটু আগে দাসপুরে নোঙর ফেললো। এদিকে তখন দারুণ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। আমাদের তাতে সুবিধেই হলো। আমরা দু'জন পথ বেয়ে এক দৌড়ে গিয়ে নৌকোর ওপর উঠে পড়লাম।

ডাকাতি করতে নয়, একটু আশ্রয় পাবার ছল করে। গিয়ে দেখি না নৌকোতে রয়েছে সারি সারি সিল্কের কাপড়ের সব গাঁটরী। ভাবলাম ভগবান এবার একটা বেশ ভাল মওকা জুটিয়ে দিয়েছেন। বৃষ্টি থামলে আমরা নৌকো থেকে নেমে পড়লাম—চারদিক তখন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। এদিকে নৌকোটাও দেখি নোঙর তুলে নদীর উল্টো পাড়ে ঝাউডাঙায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাই দেখে আমরা চুপিসাড়ে নদী পার হ'বার কতই না চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতে কিছু হ'লো না। সিল্কের কাপড় লুঠ করার আশা তখন ছাড়তেই হলো। কিন্তু এতটা মেহনত্ করে শেষ-মেশ খালি হাতে তো ঘরে ফেরা যায় না। তাই আমিই শেষে মতলব দিলাম—'চল্, জগন্নাথপুরে একটা ঘর-ডাকাতি করে আসি। ঘরটা আমি চিনি। বেলপুকুরের একটা দোকানীর কাছ থেকে আমি সব খবরা-খবর আগেই যোগাড় করেছিলাম। কিন্তু দরকার মতো লোক জোটাতে পারিনি বলেই এতদিন চুপচাপ আছি। তাই বলছি, চল্ না কেন ঐ ঘরটাতেই ঘা দিয়ে দিই!' সকলে রাজী হয়ে গ্যালো। আমরা জগন্নাথপুর গাঁয়ের লাগোয়া একটি মাঠে এসে হাজির হ'লাম। সেখানেই বানালাম আমাদের সব অস্তর-পাতি। তারপর গুড়গুড়িয়া খালের বরাবর পথ ধরে একেবারে পদ্মযোগীর বাড়ীর পূবদিকে এসে পৌঁছে গেলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বাড়ীর ভেতরে সেঁদিয়ে পড়লাম। তখন খেয়াল হলো যে আমাদের সঙ্গে না আছে তেল, না আছে মশাল। আর কিছু উপায় না দেখে বাড়ীর চালা থেকে এক খাবলা খড় খসিয়ে নিলাম। তাই নিয়ে পাশের এক মিষ্টির দোকানে ঢুকলাম। ভাগ্যি ভালো যে দোকানের চুলো তখনও জ্বলছে। সে চুলো থেকে খড়ে আগুন ধরিয়ে নিয়ে আবার পদ্ম'র বাড়ীতে এসে চড়াও হ'লাম। বাড়ীটা মাটির বটে, কিন্তু দোতালা। দরজা দুটো—আমরা পশ্চিমের দরজা ঘেঁষে একটা গর্ত করে ফেললাম। ঢুকে দেখি যে বারান্দায় দু'জন মেয়েছেলে ঘুমোচ্ছে—তাদের একজনের হাতে রূপোর গয়না। সেগুলি নিয়ে কয়েকজন ওপর তলায় উঠে গ্যালো। সেখানে পাওয়া গ্যালো শুধু একটী ঘড়া। মেয়েরা বললে যে পদ্মযোগী কাপড় খরিদ করতে বাইরে গেছে, ঘরে নেই। পূবের বারান্দায় গিয়ে দেখি যে দু'জন লোক তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের টেনে তুলে ঝাঁকাঝাকি করলাম অনেক। কিন্তু তারা দু ঠোঁট ফাঁকই করলে না। তখন তালা ভেঙে আমরা আর একটী ঘরে ঢুকে পড়লাম। সেখানে

একটী বড় গোছের সিন্দুক ছিলো—সেটাও ভাঙা হ'লো। এত মেহনতের ফল এতক্ষণে ফললো। সিন্দুকের মধ্যে থবে থরে নোতুন কাপড় চোপড় সাজানো। আমবা সে সব হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিলাম। কাজ সাবলাম আমবা নিঃশব্দে বটে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখি যে গাঁ-জুড়ে হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেছে। গাঁয়েব লোকজন ও চৌকিদার আমাদের পিছু নিয়ে'ছ। সব্বোনাশ—ধবা পড়লে যে আব বাঁচবার পথ থাকবে না। তাই প্রাণপণে দৌড়োতে লাগলাম। কিন্তু চৌকিদার ও তার লোকজনও দৌড়োদৌড়িতে কিছু কম যায় না। শেষে ভগবান মুখ

তুলে চাইলেন। একটা খালধারে এসে চৌকিদারের দল থমকে দাঁড়ালো —আমরা সাঁতবে ওপাবে গিয়ে উঠলাম। এতক্ষণে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। কিন্তু আমাদেব কাজ তো তখনও শেষ হয় নি। সাধনপাড়ার বিলের কাছে যখন পৌছোলাম তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। মাল-পত্তর মাথায় করে দিনের আলোয় পথ হাঁটা নেবাপদ নয়। তাই একটা জঙ্গলে গিয়ে আমবা মালামাল সব লুকিয়ে ফেললাম। উমেশ রইলো মালের পাহারায়। আমরা চলে গেলাম খাবারের খোঁজে। সন্ধ্যের ঝোঁকে আবার আমরা সব জমায়েৎ হ'লাম—মালামালও সব ভাগ

বাঁটোয়ারা করা হলো। সেবার আমার ভাগ্যে জুটেছিলো বিশ টাকা দামের মালপত্তর। তদন্ত হয়েছিলো কি না জানি না, তবে ধরা আমরা কেউই পড়িনি।

সাহেব। মাল নিয়েই কি ঘরে ফিরলে ?

মাণিক। না হুজুর; তা কি কখনো করতে আছে। পথে সোমডাঙার গোবিন্দ অধিকারীকে মালপত্তর বেচে বিশটা টাকা গেঁজে পুরে না, তবে অন্য কাজ।

সাহেব। কিন্তু ডাকাতি করার আগে কই তো তোমরা কালী-পূজো করলে না ?

মা। সে আর ফুরসুৎ পেলাম কোথায় হুজুর ?

সাহেব। কিন্তু বামুনের নৌকো ডাকাতি করার আগে ও তোমরা কালীপূজো করো নি ?

মাণিক। নৌকো ডাকাতি করার আগে বড় একটা কালীপূজো আমরা করি না। তবে ঘর-ডাকাতির আগে আমরা কালীপূজো করেই থাকি।

সাহেব। তা, বনে জঙ্গলে পূজোর জিনিষপত্তর সব পাও কোথায় ?

মাণিক। আনাদের পূজোর ধরণধারণ একটু আলাদা। পূজোর ভার থাকে সর্দারদের ওপর। পূজোর জন্যে জঙ্গলেরই মধ্যে বেশ একটা খোলামেলা জায়গা বেঝে নেওয়া হয়। আমাদের এ পূজোয় অবিশ্যি ঘটপট বা পিরতিম বলতে কিছু লাগে না। পূজোর পর আমরা সব সারবন্দী হয়ে বসে পড়ি, আর আমাদের মাঝ বরাবর বসে সেই সর্দার যে পূজো করেছে। দলে বেশী লোকজন থাকলে মুখোমুখি করে দু'সারি জুড়ে সবাই বসে। সামনে এক টুকরো পোষ্কার কাপড় বিছিয়ে রাখতে হয়। কাপড় না জুটলে খানিকটা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে জায়গা হলেও চলে। সেখানে আমাদের অস্তরপাতি, মশালগুলো ও একভাঁড় তেল ইত্যাদি সব কিছুই জড়ো কার। এরপর যা কিছু করার সর্দারেরাই সব করে। সর্দার তখন দলের লোকেদের কাজকম্মের কথা সব গুছিয়ে বুঝিয়ে বলে। তারপর সর্দারই সকলকে কাজ ভাগ করে দিয়ে থাকে— কে মশাল ধরে থাকবে, কেই বা দরজার গোড়ায় পাহারাদারি করবে, এই সব আর কি। আনাড়ি যারা তারাই মশাল ধরে থাকে বা মালপত্তর বয়ে বেড়ায়। পাকাপোক্ত ডাকাতেরা বাক্‌সো-প্যাটরা, সিন্দুক-দেরাজ

ভাণ্ডে ও লুণ্ঠতবাজ করে। সে যাহোক যে যার কাজ বুঝে নিলে সর্দার দলের লোকদের গুণতি করে। ডাকাতি করে বাড়ী ছেড়ে পালাবার আগেও সর্দার আর একবার লোক গুণে নিয়ে থাকে। বলা যায় না তো—হুড়োহুড়ির মাথায় যদি কেউ পেছনে থেকে যায় তাহলে সে বেচারার যে বেঘোরেই প্রাণটা যাবে। কালীপূজোর পর সর্দার তেলের ভাঁড়ে আঙুল ডুবিয়ে প্রতিটি লোকের কপালে একটা করে ফোঁটা কেটে

দিয়ে বলে—'মনে মনে, মা কালীর নাম জপ কর।' দলে আনকোরা নোতুন লোক থাকলে তাকে বলে—'মা কালী না করুন, ধরা পড়লেও দোষ মানবি না বা দলের লোকেদের নাম করবি না।' কপালে ফোঁটাটি পরে যেন আমাদের মনের বল ভরসা ও সাহস বেড়ে যায়। তারপর সবাই তৈরী হলে সর্দার পেরথমে ভাঁড়টি ভেঙে ফেলে। এক আছাড়েই বা এক ঘায়ে যদি ভাঁড়টি ভাঙে তাহলে সেদিন লক্ষণ খুব ভালোবলেই আমরা মনে করি। কিন্তু ভাড় ভাঙতে যদি দু'চার ঘা লাগে, তাহলে ভয়ে আমাদের বুক কেঁপে ওঠে। সেদিন যাহোক একটা কিছু অমঙ্গল ঘটবেই—হয় কাজ কিছুই হবে না, বা কেউ না কেউ ধরা পড়বে বা খারাপ একটা কিছু হবেই।

সাহেব। এরপর তোমরা আবার কবে কোথায় ডাকাতি করেছিলে, বলো

মাণিক। একবার 'জলঙ্গী নদীতে একটা নৌকো লুঠ করতে গিয়ে বেকুব বনে গিয়েছিলেম। আমাদের দলের রামকুমার ঘোষের সঙ্গে আমার তখন ঝগড়া চলছিলো। ঝগড়াটা লাগে অবশ্য তুচ্ছু একটা কথা নিয়ে। রামকুমার আমার বৌ'এর একখানি সাড়ি চুরি করে মেরে ছায়। সেই কথা তাকে বলতেই সে চটে ওঠে ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে যায়। ব্যাপারটা শেষে থানা পুলিশ পর্য্যন্ত গড়িয়েও ছিলো। কিন্তু হাকিমবাবু আমাদের চালান করেন নি। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই সিঁদ কেটে ঘরচুরি করার জন্যেই সে ধরা পড়ে ও মিথ্যে করে আমাদের নাম বলে দেয়। তাতে হয়তো তার গায়ের ঝাল মিটিয়েছিলো, কিন্তু আমাদের কিছু হয় নি। বরং সেই তিন তিনটি বছর জেল খেটেছিলো। জেল থেকে সে বেরোলে তার বাবা একদিন এসে আমাকে বলে—'বাবা মাণিক, আমাদের দিন যে আর চলে না। ঝগড়া বিবাদ ভুলে রামের সঙ্গে দু'চারটা কাজ তোমাকে করতেই হবে। নাহলে আমরা কি না খেয়ে মরবো?' আমি বললাম—'ঠিক আছে রামকুমার আজই একটা ভালো নৌকার খবর যোগাড় করুক। সন্ধ্যেবেলায় হরিণডাঙার মাঠে দেখা হবে।' ঠিক সময়েই আমরা সবাই হরিণডাঙায় এসে জুটলাম। সামনে জল টলটল জলঙ্গী নদী। রামকুমার বললো—'আমি একটা সওয়ারী নৌকো ঠিক করেছি। নৌকাটা নোওয়াপাড়ায় নোঙর বেঁধে আছে। কয়েকজন পশ্চিমা লোক আছে নৌকোতে। তাতেই মনে হয় টাকাকড়িও বেশ কিছু থাকতে পারে।' অবিশ্যি নৌকোর ভেতরে তো সে আর ঢোকে নি, তাই বেশী জোর করে কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। নোওয়াপাড়ায় এসে দেখি নৌকো একটা আছে ঠিকই। 'যা থাকে কপালে'—এই ভেবে আমরা 'জয় মা কালী' বলে নৌকোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। গোলমাল শুনে কয়েকজন বরকন্দাজের ঘুম ভেঙে গ্যালো। একজন তো একেবারে একলাফে উঠে দাঁড়ালো এবং চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রামকুমারের পিঠ লক্ষ্য করে তরোয়াল চালিয়ে দিলো। রামকুমার কাতরে উঠলো—মাণিক, শিরাম; আমাকে জখম করে ফেলেছে। এই বলেই রামকুমার একেবারে দে দৌড়। আমাদের ও আর চম্পট দেওয়া ছাড়া কোনো গতি রইলো না।

সাহেব। কেন?

মাণিক। আমাদের নাম জানা-জানি হয়ে গ্যালো যে হুজুর। রামকুমার পাকা লোক হয়ে কেন যে আমাদের আসল নাম ধরে চীৎকার করে উঠেছিলো তা জানি না।

সাহেব। তোমাদের দু'চারটে করে নাম থাকে নাকি?

মাণিক। দু'চারটে না হোক, এমন একটা নাম আমাদের সকলেরই থাকে যা দলের লোক ছাড়া অপর কেউ জানে না। সেই নাম যদি জানাজানি হয়েও যায়, তাতেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয় থাকে না।

সাহেব। আচ্ছা। তারপর কি হলো বলো?

মাণিক। নৌকো থেকে নেমে যাবার আগে আমরা একজন বরকন্দাজকে বেশ করে গোবেড়ন দিয়ে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলাম। পরে আমরা খবর নিয়ে যা শুনলাম তাতে আমাদের ভয়ে হাড় হিম হয়ে গ্যালো। একেবারে যাকে বলে সেই সব্বোনাশের মাথায় পা। দূরের এক জেলার কয়েকজন কয়েদীকে নিয়ে বরকন্দাজেরা গিয়েছিলো কোলকাতায়। আমরা যখন তাদের নৌকার ওপর চড়াও হই, তখন তারা ফেরার পথে। বরকন্দাজেরা থানায় গিয়ে নালিশ জানালো এবং সঙ্গে সঙ্গে জোর তদন্ত আরম্ভ হলো। দারোগাবাবু তো একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন—'কি! সরকারী বরকন্দাজদের ওপর হামলা'। তারপর দুজন ডাকাতের নাম তার কানে গেছে এবং একজন ডাকাত যে চোট খেয়েছে তাও তিনি শুনেছেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যি ভালো যে আশে পাশের গাঁয়ে 'মাণিক' ও 'শিরাম' নামে বেশ কয়েকজন লোকই ছিলো। দারোগাবাবু গাঁগুলি তোলপাড় করে সব কজন 'মাণিক' ও 'শিরাম' কে বেঁধে নিয়ে গেলেন। কিন্তু পরে যখন দেখলেন যে তাদের কারুর গায়েই জখমেই কোনো চিহ্নই নেই, তখন সকলকেই ছেড়ে দিলেন। পরে পুলিশ জানতে পারে যে জখমীর নাম হোলা রামকুমার। রামকুমার অবিশ্যি তখন গা ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। এবার পুলিশের রাগ গিয়ে পড়লো আমার ওপর—আমিই নাকি রামকুমারকে লুকিয়ে রেখেছি। আর যাবে কোথায়—আমি আবার গেরেফতার হলাম এবং কয়েকদিন পরে ছাড়াও পেলাম। রামকুমার অবশ্যি অনেকদিন বাদে ধরা পড়ে ও মাস ছয়েক জেল খেটে তবে খালাস পায়।

ও সাহেব। মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী গাঁয়ের হীরু শা'র বাড়ীতে তোমরাই তো ডাকাতি করেছিলে। সে সব কথা চেপে যাচ্ছো কেন?

মাণিক। না, কোনো ডাকাতির কথাই আর লুকোবো না হুজুর। তবে মুখ্যুসুখ্যু মানুষ হুজুর, পর পর সব ঠিক হয়তো গুছিয়ে বলতে পারছি না। হীরু শা'র বাড়ীতে আমরা ডাকাতি করি প্রায় সাত আট-বছর আগে। শুধু হীরু শা'রই নয়, সেরাতে অনেকের বাড়ীই আমরা লুঠ করেছিলাম। কিন্তু কার খবরের ওপর ভরসা করে সেবার যে ডাকাতি করেছিলাম তা জানি না। এই ডাকাতিতে সর্দার ছিলো দু'জন—বামুন পুকুরের রামকুমার সর্দার ও জয়পুরের হরিশ গোয়ালা।

সাহেব। সে কেমন কথা! দু'জন সর্দার থাকলে তোমাদের কাজের অসুবিধে হয় না?

মাণিক। না, হুজুর। দু'জন কেন, বড় বড় ডাকাতিতে তিন-চার জন সর্দারও থাকে। সর্দাররা নিজের নিজের লোক নিয়েই আসে এবং তাদেরই ওপর হুকুম হাকিম চালায়। এবার শুনুন, হুজুর, পলাশীর ডাকাতির কথা। একদিন রামকুমার ও হরিশ আমাকে ডেকে বললে—'আমরা পলাশীর হীরু শা'র বাড়ীতে ডাকাতি করার মতলবে আছি। তোকে ও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে বুঝলি? আমাদের খবর একেবারে পাকা। সোনা দানা ও টাকাকড়ির পাহাড়ের ওপর বসে আছে ব্যাটা হীরু শা। আজ সন্ধ্যেতেই তৈরী হয়ে চলে আয় ধুবুলিয়া বাজারে। সেখানেই সব কথাবার্তা হবে।' আমি রাজী হয়ে গেলাম ও ঠিক সময়েই বাজারে গিয়ে হাজির হলাম। সেখান থেকে পলাশী অনেক দূর—প্রায় চোদ্দো কোশ পথ। কাজেই সেই রাতে তা আর পলাশী গিয়ে ডাকাতি করা সম্ভব নয়। হুকুম হলো 'এক সঙ্গে এতলোক মিলে পথ চললে গাঁয়ের লোকেদের শুভাসন্দেহ হতে পারে। তাই ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে হাঁ টা সবাই রাতভোর। কাল আবার আমরা সব জমায়েৎ হবো মীরের হাট ডাকঘরের কাছে।' কিন্তু তখন একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—কোলের মানুষকেই ঠিক ঠাহর করা যায় না। একবার পথ হারিয়ে ফেললে সব কিছুই পণ্ড হবে—কেউ আর কারুর পাত্তাই করতে পারবে না। মুস্কিলের কথা নয় কি? নাথপুরের কানাই ঘোষ তখন হলো আমাদের মুস্কিল আসান। কানাই অবিকল শ্যালের ডাক ডাকতে পারতো। ঠিক হলো যে কানাই মাঝে মাঝে 'হুক্কা হুয়া' ডাক ছাড়বে এবং আমরা সেই আওয়াজ

শুনে কানাই'এর পাশে এসে সব জড়ো হবো। ব্যাস্, আরম্ভ হয়ে গ্যালো পথ-চলা। সোনা-ডাঙার হরিশ ঘোষের ঘরে এসে আমরা উঠলাম। এই হরিশ হলো জয়পুরের হরিশ ঘোষের মিতে। সেখানে তাড়াতাড়ি ডান হাতের ব্যাপার সেরে নিলাম। হরিশও আমাদের সঙ্গে জুটে গ্যালো। আমরা আবার বনের পথ ধরে এগিয়ে চললাম। সে কি চলা রে বাব্বা। ঝোপঝাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে, খাল-নালা পেরিয়ে চলেছি তো চলেছি। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। মাঝে মাঝে 'কানাই'এর 'হুক্কা হুয়া' ডাক' শুনে সবাই জড়ো হয়ে নিজেদের দেখে নিচ্ছি। তারপর আবার সেই চলা। অবশেষে মীরের হাট ডাকঘরের মাঠে এসে সবাই হাজির হলাম। কিন্তু হরিশের (জয়পুরের) তখন ও কোনো পাত্তা নেই। কথা ছিলো যে হরিশ বেশ কিছু অস্ত্রপাতি জোগাড় করে নিয়ে আসবে। হিসেব-নিকেশ করে দেখা গ্যালো যে আমাদের সঙ্গে যা হাতিয়ার আছে, তাই দিয়ে কাজ হাসিল করা যাবেনা। তাই নাচার হয়ে সেদিনের মত কাজ বন্ধ রাখতে হলো। চিনিবাসকে আমরা বললাম—'তুমি, ভাই যেভাবেই পারো, আমাদের দরকার মতো অস্ত্রপাতি যোগাড় করে নিয়ে এসো। কাল রাতের মধ্যেই আনা চাই। আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকবো'। চিনিবাস চলে গ্যালো। পরের দিন রাতে চিনিবাস ও হরিশ এই দুইমূর্তিই এসে হাজির। তাদের কাছে দরকারী সব কিছু অস্ত্রপাতিই আমরা পেয়ে গেলাম। এবার আমরা কোমর বেঁধে তৈরী হতে লেগে গেলাম। খোলা মেলা একটা জায়গায় এসে আমরা পাশের বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে নিলাম। সেই বাঁশ দিয়ে লাঠি ও বর্শা বানানো হলো। মশালও তৈরী হয়ে গ্যালো। এরপর কালীপূজো। কালী পূজো শেষ করে আমরা হীরু শা'র বাড়ী চড়াও হলাম। বাড়ীটা তো দিনের বেলাই আমরা অনেকে দেখে নিয়েছি। মেটে বাড়ী ও তার চারদিকে মেটে পাঁচিল। রামকুমার পাঁচিল টপ্‌কে ভেতরে ঢুকে সদর দরজার খিল খুলে দিলো। কিন্তু লুঠতরাজ আরম্ভ করলেই তো হলো না—পাশেই যে ফাঁড়ি। ফাঁড়ির বরকন্দাজটীকে আগেই বেঁধে ফেলা দরকার। তা নাহলে সে নিশ্চয়ই হাঁকডাক জুড়ে আমাদের কাজ ভুণ্ডুল করে দেবে। রামকুমারই একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে ফাঁড়িতে চলে গ্যালো। বরকন্দাজটী তখন জেগে বসে মৌতাত করে ছিলিম টানছিলো। চোখে হঠাৎ আলো

পড়তে সে লাফিয়ে উঠে হাঁক ছাড়লো—'কে ? কি ব্যাপংর ?' রামকুমার পালটা গর্জে উঠলো—'তুমি কে ?' বরকন্দাজটী তখন ব্যাপার বুঝে হাতিয়ারের খোঁজে ফাঁড়ির ভেতর দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু সে সুযোগ তাকে কে দেবে! আমাদের বনমালী বর্শার এক খোঁচায় তাকে দিলো ফেলে আর তখনই আমাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা সব হুড়মুড় করে এসে তাকে বেঁধে ফেললো। বরকন্দাজ সাহেবের তড়পানি কিন্তু তখনও থামে নি।

কিন্তু সে সব কথায় কান দেবার সময় কোথায় আমাদের ? আমরা ফাঁড়ির ভেতরে ঢুকে অস্তরপাতি যা পেলাম সে সব তো নিলামই। বরকন্দাজের বাক্স ভেঙেও যা পারলাম হাতালাম। শেষে হাত-পা-বাঁধা বরকন্দাজকেও তুলে নিয়ে এসে আমাদের দলের পাহারাদারের জিম্মায় দিয়ে দিলাম। বেচারার তখন একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথের অবস্থা। ফাঁড়িতে আরও দুতিন জন লোক ঘুমিয়ে ছিলো। তাদের আমরা ধরে বেঁধে এনে আমাদের পাহারাদারের কাছে বসিয়ে দিলাম। বরকন্দাজ ও তার সাথীদের ওপর নজর রাখার জন্যে বাড়তি কয়েকজন পাহারাদার ও

মোতায়েন করা হলো। এবার শুরু হলো লুঠতরাজ। মশাল জ্বালিয়ে হৈ হৈ করে আমরা বাড়ীর একেবারে ভেতর মহলে ঢুকে পড়লাম। সেখানে দেখি শুধুই মেয়েছেলের দল। তারা সাফসুফ বলে দিলো—'টাকাকড়ির খবর আমরা কি জানি? বাড়ীর কর্তা তো আছেন বার-বাড়ীতে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়।' তাই শুনে আমরা দুদ্দাড় করে বারবাড়ীতে চলে এলাম। সেখানে এসে দেখি একটা লোক সিন্দুকের পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তাকে বেশ যুতসই করে বাঁধলাম। তার আবার এক চোখ কানা। হীরু শা'ই হবে বোধহয় লোকটা। তাকে কিছু না বলে আমরা তাড়াতাড়ি সিন্দুকটা ভেঙে ফেললাম। ভেতরে যা পেলাম তা কিছু কম নয়—একটা বড় থলে-ভর্তি টাকা, পয়সা-ভরা আর একটী থলে এবং গয়নার একটী পুঁটলি। কিন্তু এতবড় একজন ব্যবসা-দারের ঘরে আরোও তো অনেক কিছু থাকার কথা এবং আছেও নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথায়? হীরুকে ধরে দু'চার বার মশালের ছ্যাঁকাও আমরা দিলাম। কিন্তু তার পেট থেকে একটা কথা বের হ'লো না। মহা মতলববাজ লোক এই হীরু শা। টাকাকড়ি ও গয়না পত্তর সে তার জুড়িদারদের বাড়ীতে ছড়িয়ে রাখেনি তো? আশেপাশেই তো তাদের সব বাড়ী। দু'তিন রাত জেগে অনেক ঝোপঝাড় ঠেঙিয়ে খালবিল ভেঙে চোদ্দো কোশ পথ এসেছি কি স্রেফ দু'চার টাকা হাতে করে ফিরতে? মাথায় আমাদের সকলের যেন আগুন জ্বলে উঠলো—হীরু শা'র সব জুড়িদারদের বাড়ীতেই আজ হানা দেবো। ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে আমরা হৈ হৈ করে ছুটে গেলাম পাশের বাড়ীতে হীরু শা'র এক জুড়িদারের বাড়ী। আমাদের একজন সাথীকে দেওয়াল টপকে বাড়ীর ভেতর ফেলে দিলাম। সে তারপর দরজা খুলে দিলো। আমরা বাড়ীর ভেতরে সেঁদিয়ে দেখি যে সেখানে জনমনিষ্যি নেই—ভয়েতে সব পালিয়েছে। আমরা তখন মনের সুখে লুঠপাঠ আরম্ভ করে দিলাম। তা নেহাৎ মন্দ জোটেনি সেখানে সেদিন—একটা লোটা-ভর্তি টাকা, গয়নার একটা পুঁটুলি এবং পয়সার একটা থলে। এখান থেকে আমরা গেলাম বাজারে—আর একজন জুড়িদারের বাড়ীতে। দোতালা মেটে বাড়ী। আমরা দরজা ভেঙে কেউ উঠলুম ওপরতলায়, কেউবা গেলাম বার বাড়ীতে—কিন্তু কোথাও বিশেষ কিছু পেলাম না। তারপরে আর একটা বাড়ীর দরজা ভাঙতে গিয়ে আটকে গেলাম—দারুণ মজবুত দরজা।

এমন সময় কানে আওয়াজ এলো 'খুঁচি' 'খুঁচি'। বুঝলাম যে আমাদের পাহারাদাররা বিপদে পড়েছে।

সাহেব। কি করে বুঝলে?

মাণিক। গাঁয়ের লোকেদের দল বেঁধে আসতে দেখলে পাহারাদাররা 'খুঁচি' 'খুঁচি' বলে আমাদের হুশিয়ার করে দ্যায়।

সাহেব। বেশ, তারপরে কি হলো বলো।

মাণিক। আমরা যার যার কাজ ছেড়ে পাহারাদারদের সাহায্যে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি বরকন্দাজটা গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে। লুঠের নেশায় আমরা এতই মেতে গিয়েছিলেম যে বরকন্দাজটার কথা কারুর খেয়ালই ছিলো না। কখন যে সে বাঁধন খুলে গাঁয়ের দিকে চলে গেছে, তা আমরা কেউই নজর করিনি। কিন্তু এখন তো আর পালানো ছাড়া উপায় নেই। সামনের এক দোকানের ঝাঁপ ভেঙে কয়েকজোড়া জুতো হাতিয়ে নিয়ে আমরা পড়ি ত মরি করে দৌড় লাগালাম। গাঁয়ের লোকেরা হৈ হল্লা করতে করতে বেশ কিছু দূর আমাদের পেছনে ধাওয়া করেছিলো। তারপর বুঝলো যে দৌড়ে আমাদের ধরে ফেলা তাদের কম্মো নয়। বরকন্দাজ ও তার দলবল রণে ভঙ্গ দিলে আমরা একটা খোলামেলা জায়গায় এসে জড়ো হলাম। সেখানেই লুঠের মাল সব ভাগ বাঁটোয়ারা করা হলো। গয়নাপত্তরও আমরা ভাগ করে নিলাম আর কয়েক আঁজলা করে টাকা পেলাম আমরা জনে জনে। আবার আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু গয়নাগাঁটি লুকিয়ে মেরেও দিয়েছিলাম। তাই নিয়ে সেবার অবিশ্যি আমরা কেউই তেমন মাথা ঘামাইনি—এমনিতেই লুঠের মালের বখরা যা পেয়েছিলাম তাতেই আমরা তখন আনন্দে আটখানা। আমারই ভাগে পড়েছিলো কর করে একশো পঞ্চাশটা টাকা ও টাকা পঞ্চাশেক দামের গয়নাপাতি। এছাড়া আমি অন্যের অজান্তে কয়েকটা নাকছাবি ও একটা চন্দ্রহার নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু চোরাই মাল তো আর নিজের ঘরে রাখতে পারি না। তাই ভাগের গহনাপাতি পত্র পাঠ একজন স্যাকরার কাছে বেচে দিলাম। আর নাকছাবিগুলি ও হারছড়াটা রেখেছিলাম এক স্যাঙাতের কাছে। কিন্তু সে লক্ষ্মীছাড়া যে চোরের ওপর বাটপাড়ি করবে তা আর কে জানতো? এ জীবনে আর সেগুলি ফেরৎ পেলাম না। জোর পুলিশী তদন্ত হয়েছিলো বটে, কিন্তু আমরা কেউ ধরা পড়িনি। শেষে নদীয়া জেলার পুলিশ হরিশের

বাড়ী থেকে চোরাই মাল উদ্ধার করে। কিন্তু রাখে হরি মারে কে? ধরা পড়েও হরিশের গলার জোর একতিলও কমে নি। সে জোর গলায় পুলিশের কাছে জবানবন্দী করলো 'এ সব গয়নাগাঁটি তার।' নদীয়ার পুলিশ পলাশীর (মুর্শিদাবাদ জেলা) ডাকাতির খুঁটি নাটি খবর তো জানে না। তাদের সন্দেহ যে, এ সব জয়পুরের ডাকাতির মালামাল। পুলিশের মুখে খবর পেয়ে জয়পুরের ডাকাতির বাদী হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। বহু আশা নিয়ে গয়নাগাঁটি সব খুঁটিয়ে দেখলো। কিন্তু শেষে হতাশ হয়ে জানালো এ সব গয়নাগাঁটির মালিক সে নয়। ফলে হরিশের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে গ্যালো। অবিশ্যি এর মাঝে বেশ কয়েকদিন হরিশকে জেলের জলভাত খেতে হয়েছিলো।

সাহেব। অচেনা অজানা গাঁয়ের ভেতর ঢুকে ডাকাতি করতে ভয় করে না তোমাদের? গাঁয়ের লোক জেগে উঠলেই তো বিপদ!

মাণিক। সে ভয় তো আছেই, হুজুর। কিন্তু বিপদের ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো আর ডাকাতদের দিন চলে না। তবে গাঁয়ে হল্লা শুরু হয়েছে কিনা, বা গাঁয়ের লোক জড়ো হচ্ছে কি না—এ সব দিকে নজর রাখার জন্যে সর্দার সবার আগেই পাহারাদার মোতায়েন করে। পাহারাদারেরা জায়গামাফিক দাঁড়ালে তবেই না আমরা বাড়ীর ভেতরে ঢুকি। দলের মধ্যে যারা সব থেকে হুঁশিয়ার, সাহসী ও শক্তসমর্থ তারাই পাহারাদারের কাজ পেয়ে থাকে। গাঁয়ের লোকেরা বাধা দিতে এলে প্রথম চোটে আমাদের পাহারাদারেরাই তাদের হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু গাঁয়ের লোক দলে ভারী থাকলে, দু'চারজন পাহারাদারের পক্ষে তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হয় না। তখন তারা চীৎকার করে হাঁক পাড়তে থাকে 'হুঁশিয়ার'। তাই শুনে ভেতরের ডাকাতরা লুঠতরাজ ছেড়ে পাহারাদারকে সাহায্য করতে চলে আসে। তাই তো বলছি, হুজুর, পাহারাদারের কাজে দায়দায়িত্ব অনেক। তেমন বুঝলে সর্দার নিজেই অনেক সময় পাহারায় দাঁড়িয়ে যায়।

সাহেব। সর্দারের ঘাড়ে আর কি কি দায়িত্ব থাকে?

মাণিক। সব কিছুর জন্যেই তো সর্দার দায়ী। কোন বাড়ীতে ডাকাতি করলে বেশ কিছু মালামাল মিলতে পারে—এ সব খবরাখবর সর্দারই যোগাড় করে। কিন্তু উড়ো খবরের ওপর বিশ্বাস করে সর্দারেরা কাজে নামে না। খবরটা তারা তখন নানান ফন্দিফিকির করে যাচাই করে।

যদি বোঝে যে খবরটা খাঁটি—তখন সর্দার পুরোদমে তৈরী হতে থাকে। ছোটো ছোটো সর্দারদের কাছে তখন হুকুম চলে যায় তোমরা দলবল নিয়ে অমুক দিনে রেতে ঐ জায়গায় এসে জড়ো হও। কে কত জন লোক আনবে, কে আনবে কোন অস্তরপাতি ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব কিছুই সর্দার তাদের জানিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় খোরাকির টাকাও সর্দারকে পাঠিয়ে দিতে হয়। মাথা পিছু দু'আনা করে আমরা খোরাকি দিয়ে থাকি। দিনের দিন সকলে একজোট হলে তখন সর্দার খুলে বলে যে কোন গাঁয়ে কোন বাড়ীতে কাজ করতে হবে। তারপর আমরা ঝড়ের বেগে গাঁয়ের দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। কিন্তু যাবার পথে খারাপ লক্ষণ কিছু দেখলে আমরা থেমে পড়ি এবং সর্দারের হুকুমে সেদিনকার মতো কাজ বন্ধ থাকে।

সাহেব। তোমাদের ভালো বা খারাপ লক্ষণগুলো কি?

মাণিক। যদি আমাদের কাছে হঠাৎ একটা ষাঁড় এসে হাজির হয়, টিক্‌টিকি ডেকে ওঠে বা কালীপূজোর সময় কেউ কাশে বা হাঁচে—তাহলে আমরা লক্ষণ খারাপ বলে ধরে নিই। সেদিন আর আমরা কোনো কাজে হাত দিই না। আমাদের বিশ্বাস যে সেদিন কেউ না কেউ ধরা পড়বে, বা জখম হবে অথবা মালামাল কিছুই বিশেষ মিলবে না। আবার যদি একটা শ্যালকে পথের ডান দিক থেকে বাঁদিকে যেতে দেখি—তাহলে বুঝি যে আজ লক্ষণ ভালো।

সাহেব। লক্ষণ খারাপ দেখলে কি তোমরা যে যার বাড়ী চলে যাও?

মাণিক। সে হলো গিয়ে সর্দারের মর্জি। তবে খালি হাতে বাড়ী ফিরে গেলে আমাদের দিন চলবে কি করে? তাই সর্দার সকলের সঙ্গে শলা-পরামর্শো করে দুই, তিন বা চার দিন পরে আবার সকলকে জড়ো হ'বার হুকুম জারী করে। এ কদিনের খাই খরচার ব্যবস্থা সর্দারই করে—রেট সেই হররোজ মাথা পিছু দু'আনা।

সাহেব। সর্দারের দেওয়া এই খোরাকির খরচা ওঠে কোত্থেকে?

মাণিক। লুঠের টাকা থেকে, হুজুর। ওঠে বলে ওঠে, একেবারে দু'গুণ করে উঠে আসে। খোরাকি বাবদ পঞ্চাশ টাকা খরচা হলে, থোক একশো টাকা সর্দারের ভাগে পড়ে।

সাহেব। বেশ। দু'চার দিন পরে ধরো আবার সব জড়ো হ'লে। তারপর?

মাণিক। তারপর সেখান থেকে আমরা রওয়ানা দিই। যে গাঁয়ে

ডাকাতি করতে হবে সেই গাঁয়ের কাছাকাছি গিয়ে থামি। আমরা কেউ বা ঘুরে ফিরে গাঁটা একটু দেখে নেই, কেউ আবার বাঁশ কেটে অস্তরপাতি বানিয়ে নেয়। সর্দার নিজে গিয়ে বাড়ীটা ও তার চারপাশ বেশ করে দেখে আসে। গাঁয়ের লোকেরা ঘুমিয়েছে কি না, জেগে থাকলে কি করছে, চৌকিদারই বা কোথায় আছে—এসব দরকারী খবর সর্দারই যোগাড় করে।

সাহেব। তারপর?

মাণিক। সব কাজ সারা হলে, সর্দার আমাদের গুণতি করে। তারপর কালীপূজো। কালীপূজোর কথা তো আগেই বলেছি, হুজুর। পূজোর পর মার প্রসাদ হিসেবে এক ফোঁটা করে আমরা সকলে মদ মুখে ঠেকাই। সর্দার তখন সকলকে যার যার কাজ বুঝিয়ে দেয়—কে বা কারা পাহারায় থাকবে, কে মশাল ধরবে, কারা বাক্স ভাঙবে, এই সব। ব্যাস্, তারপর আমরা সর্দারের হুকুম পেলেই এক দৌড়ে গিয়ে বাড়ীটাতে হানা দিই।

সাহেব। গাঁয়ের লোকের হাতে তোমরা কি কখনও নাজেহাল হও নি?

মাণিক। তেহট্ট গাঁয়ের মাধব কলুর বাড়ীতে ডাকাতি তো করতেই দিলে না গাঁয়ের লোকেরা। আমরা রীতিমত চোট খেয়ে হঠে গেলাম।

সাহেব। খুলে বলো সে সব কথা।

মাণিক। নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার মধ্যেই আমাদের মীরপুর গ্রাম। গ্রামটা বেশ বড়সড়ো ও সেখানে অনেক ঘর লোকের বাস। মাধব কলু এই গাঁয়েরই একজন বাসিন্দা। ব্যবসা করে লোকটা একেবারে যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তারই একজন চাকর আমাদের এক স্যাঙাতকে বলে—'ব্যাটা একটা টাকার কুমীর। একদিন বেশ যুৎসই করে ঘা দিয়ে দ্যাখো না কেন?' স্যাঙাত আমাদের পরামর্শও দেয়—'কোমর বেঁধে লেগে যাও সব। তবে কাজটা বেশ বড় গোছের। অনেক লোক লাগবে, কিন্তু। এ কাজ হাসিল করতে পারলে তোমরা সারা বছর পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবে।' আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু লোক পাই কোথায়? গেলাম বাঙালচি'র হাটে। সেখানে লোকজন সব যোগাড় করে আমরা কলুর বাড়ীর কাছাকাছি একটা বাগানে গিয়ে জড়ো হ'লাম। মশাল ও অস্তরপাতি সব তৈরী হয়ে গ্যালো। আমি গেলাম কলুর বাড়ীর ও তার আশপাশের খবরের খোঁজে। তখন একেবারে নিশুতি রাত। গাঁয়ের পথে কিন্তু লোকজন চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। ব্যাপার কি? খবর নিয়ে

জানলাম যে পাশের গাঁয়ে একটা খানাপিনা ছিলো। সেখানে নেমতন্ন সেরে এ গাঁয়ের লোকেরা একে একে ঘরে ফিরছে। তার মানে পুরো গাঁটাই এখনো জেগে রয়েছে। এখন কলুর বাড়ীতে হানা দিলে গাঁয়ের লোকেরা আমাদের নিশ্চয়ই ঘিরে ফেলবে। ফিরে এসে দলের লোকজনকে সব কথা বুঝিয়ে বলে হুকুম দিলাম—'আজ রেতে কোনো কাজ হবে না। কাল আবার আমরা সব এখানে জমায়েৎ হবো।' আমাদের অস্তরপাতি জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিলাম আর মশালগুলো রইলো গাছের ফোকরে। তারপর আমরা ছু'চার জন করে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে চলে গেলাম। পরের দিন আবার সব জড়ো হ'লাম। কিন্তু হা ভগবান! —মশালগুলো সব গ্যালো কোথায়? ভাবলাম বোধ হয় শেয়ালেরা মুখে করে নিয়ে গ্যাছে। আবার নোতুন মশাল তৈরী করে নিলাম। এদিকে আবার তেল নেই। দেখা যাক্, কোথায় তেল পাওয়া যায়। আমরা 'জয় মা কালী' বলে বেরিয়ে পড়লাম। কলুর বাড়ীর লাগোয়া একটা দোকনে ঢুকে আমরা মশালগুলো তেলে ডুবিয়ে একসঙ্গে সব কটাকেই জ্বেলে নিলাম। আলোয় আলো হয়ে উঠলো চারদিক। কিন্তু কলুর বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে সে আর এক বিপদ। দিব্যি দোতালা পাকা বাড়ী। দরজা না ভেঙে ঢোকার কোনো উপায় নেই। কিন্তু দরজার কাছে ঘেঁষে কার সাধ্যি? ছাতের ওপর থেকে বিষ্টির ধারার মতো ইটপাটকেল ছুটে আসতে লাগলো। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সব্বোনাশ! ছাতভর্তি একদল মারমুখী লোক। সাহসে বুক বেঁধে আমরা বার ছু'য়েক ছাত থেকে লোক হঠাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শেষমেশ হেরে গেলাম। উল্টে বরং আমাদের কয়েকজন সাথী জখম হয়ে গ্যালো। তখন আর উপায় কি? আমরা খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দৌড়ে চলে এলাম খোলা মাঠের দিকে। আহাম্মুকি আমাদেরই।

সাহেব। কেন?

মাণিক। আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে মশালগুলি সরিয়েছে গাঁয়ের লোকই। শ্যালে কেন ঝুট মুট মশালগুলো নিয়ে টানাটানি করবে? গাঁয়ের লোক মশাল দেখে ঠিকই আন্দাজ করেছিলো যে কলুর বাড়ীতে হানা দেবার জন্যে ডাকাতেরা আশে পাশে ঘোরাফেরা করছে। তাই তারা সকলে মিলে কলুর বাড়ীর ছাতে ইট পাটকেল নিয়ে তৈরী হয়েই ছিলো। আর আমরা বেকুবের মতো গিয়ে তাদের হাতে উত্তম মধ্যম খেয়ে পালিয়ে

বাঁচলাম। তবে, হুজুর, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যিই তো বটে।

সাহেব। কি রকম?

মাণিক। আমরা সব মুখ কালো করে মাঠে বসে আছি। এমন সময় আমাদের এক স্যাঙাত বলে উঠলো—'সকালের দিকে নোটো বাজারে একটা নৌকো দেখে রেখেছি। নৌকোটা বেশ শাঁসালো বলেই মনে হয়' আমরা তখুনি গিয়ে নৌকোটার ওপর চড়াও হ'লাম। এবার ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। নৌকোটা লুঠে কতটাকা পেয়েছিলাম, জানেন হুজুর?

সাহেব। কত টাকা?

মাণিক। বাক্সোপ্যাঁটরা ভেঙে নগদে পেয়েছিলাম তিন চার হাজার টাকা আর গয়নাগাঁটি যা হাতিয়েছিলাম তার দামও হাজার টাকার কম হবে না। দামী শাড়িও বেশ কয়েকখানা লুঠেছিলাম। আমার ভাগেই
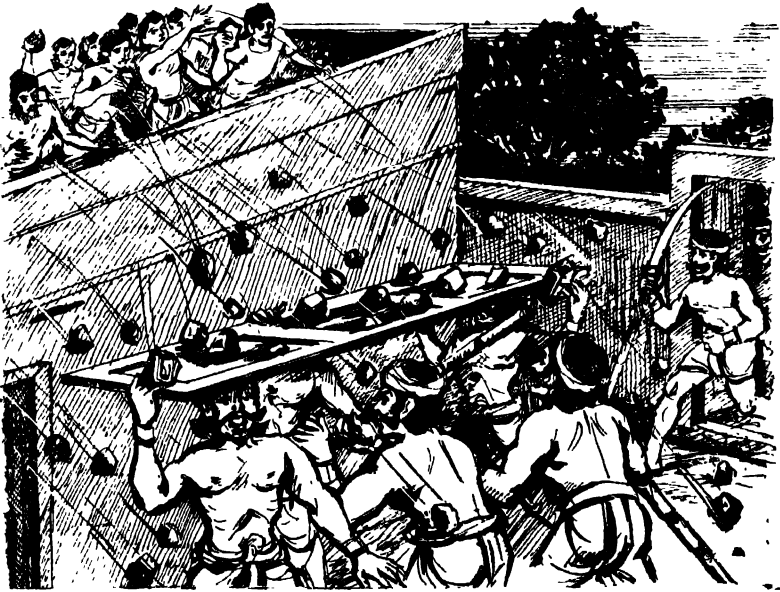
তো পড়েছিল একখানা 'বালুচরী' শাড়ি। সে যাক, যুগপুর গাঁয়ের জমিদার একবার আমাদের বোকা বানিয়ে ছেড়েছিলো। গতর ও মাথা খাটিয়েও সেবার আমরা কাজ হাসিল করতে পারিনি।

সাহেব। ঘটনাটা একটু খুলে বলো।

মাণিক। 'যুগপুরে এক বেনের বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়েই

আমরা জমিদারের হাতে নাকাল হয়েছিলাম। আমরা জানতাম না যে বাড়ীর মালিক আসলে এক জমিদার। আবার ভাগ্যি দেখুন! খোদ জমিদার বাবু সেদিন পাশের কাছারি বাড়ীতেই হাজির। হৈ হল্লা শুনে তিনি ও তাঁর চাকর বাকরেরা একেবারে তড়বড় করে ছাতের ওপর উঠে গেলেন। তারপর ছাত থেকে বড়ো বড়ো ইঁটের টুকরো দুমদাম করে পড়তে লাগলো আমাদের মাথায়। আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারি না, তা আর ডাকাতি করবো কি? হঠাৎ একজনের মাথায় এক মতলব খেলে গ্যালো। সামনের দরজার একটা পাল্লা একেবারে সরাসরি খুলে ফেললাম। তারপর কয়েকজনে মিলে সেটাকে আমাদের মাথার ওপর তুলে ধরলো। আমরা ভাবলাম—এবার আর ঠ্যাকায় কে? পাল্লার নীচে মাথা বাঁচিয়ে কাজ সেরে ফেলবো। মাথা আমাদের বাঁচলো ঠিকই, কিন্তু পাল্লাটা যারা ধরে রেখেছিলো তাদের হাতের আঙ্গুলগুলো সব ইট পাটকেলের ঘায়ে কেটে কুটে একেবারে একশেষ। তাই নাচার হয়ে পাল্লা ফেলে পালানো ছাড়া আর কোনো পথই ছিলো না।

সাহেব। বেলপুকুরে ডাকাতির কথা কিছু বললে না তো?

মাণিক। সবই বলবো, হুজুর। একবার যখন বলতে আরম্ভ করেছি, তখন কিছুই আর বাদ দেবো না। শান্ত শিষ্ট চাষীর মত আমি সে সময়ে ক্ষেতের কাজ কম্মো নিয়েই আছি। অবিশ্যি বজ্জাতি করার উপায়ও কিছু ছিলো না। আমার ওপর তখন পুলিশ ও হাকিম বাবুদের কড়া নজর। তেনাদের হুকুম না নিয়ে গাঁ ছেড়ে এক পা নড়ারও কি আমার যো ছিল। সেবার পুজোর সময়, মানে ভাদ্দর আশ্বিন মাস নাগাদ মায়াকুল যাবার জন্যে পুলিশ ও হাকিমবাবুদের কাছে দরবার করলাম। বললাম—'হুজুর মায়াকুলে না গেলে, ফসল কেটে ঘরে তুলবো কেমন করে? আমার সোমবছরের খাওয়া পরাই বা চলবে কোত্থেকে'? সব শুনে তাঁরা আমার আর্জ্জি মঞ্জুর করলেন। আমি গেলাম মায়াকুলে। আমার কপালও চললো আমার সঙ্গে। যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কুবের ও কেষ্টো আমাকে ধরে বসলো 'আরে, রাখ্ তোর চাষ আবাদ। চল্, এই বেলপুকুরের কাজটা তো আগে সেরে ফেলি।' ব্যাস, কোথায় পড়ে রইলো তখন খেতভরা ফসল। চোখের সামনে ভেসে উঠলো থলি ভর্তি টাকা ও সোনা দানা। আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু মায়াকুলের ফাঁড়িদারকে নিয়ে বাঁধলো ঝঞ্ঝাট। তাকে হাত না করতে পারলে ত চলে না। কুবের, কেষ্টো এরা

সব মার্কামারা ডাকাত। ফাঁড়িদারের খাতায় এদের নাম উঠেছে। ফাঁড়িদার রেতে এদের গরহাজির পেলে আর রক্ষে রাখবে না। দারোগা ও হাকিম-বাবু জেনে যাবে এবং হাতে দড়ি পড়বে। তাই বহু সাধ্যি সাধনা করে ফাঁড়িদারকে রাজী করানো গ্যালো। ঠিক হলো যে জনা পিছু চার টাকা করে তাকে দিতে হবে। দিনের দিন আমরা অস্তরপাতি নিয়ে মায়াকুলের পশ্চিমে ধাপাড়ি বলে এক জায়গায় জড়ো হলাম। সেখান থেকে তৈরী হয়ে আমরা একেবারে বেলপুকুর চলে গেলাম। পথে একজন ভিনগাঁয়ের চৌকিদারের সঙ্গে দেখা। সে মুখে আমাদের কিছু না বলে সোজা বাজারের ভেতরে গিয়ে হাঁকা হাঁকি জুড়ে দিলো। বিপদ বুঝে আমরা জঙ্গলের পথ ধরলাম। পথে পড়লো একজন বেশ ভদ্দর লোকের বাড়ী। ভেতর থেকে হাঁক এলো—'কারা যায়?' আমরা জবাব দিলাম—'নিকাশীপাড়ার লাঠিয়াল, গো'। তারপর জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলামেলা জায়গায় এসে আমরা সব বসলাম। রাত তখন অনেক। দেখতে দেখতে গাঁ বেশ নিঝুম হয়ে এলো। মাঝে মাঝে শুধু শোনা যাচ্ছে প্যাঁচার ডাক—কিচ্ কিচ্, ঠিক্ ঠিক্। আমরা তখন পূজো-আর্চা সেরে যথারীতি তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর রামনারায়ণের বাড়ীতে গিয়ে হানা দিলাম। দিব্যি দোতালা পাকা বাড়ী ও বাড়ীটা ঘিরে রয়েছে ইটের ছ্যাল। হাতার মধ্যে অবিশ্যি দু'একটা মেটে ঘরও রয়েছে। উত্তর দিকে জঙ্গল এবং খিড়কির দোর। আমরা সেদিকেই এগিয়ে গেলাম। একজন ছ্যাল টপকে ভেতরে গিয়ে দরজা দিলো খুলে। আমি বাইরে পাহারার কাজে রয়ে গেলাম, আর দলবল বাড়ীর ভেতরে ঢুকলো। সদর দোরটা একেবারে গাঁয়ের পথের ওপর। কাজেই সেটা খোলা হলো না। বাড়ীটা তখন মশালের আলোয় আলো হয়ে উঠেছে আর আমাদের দলবল ওপরে নীচে মনের আনন্দে লুঠ তরাজ করছে ও বাক্সো-প্যাঁটরা সিন্দুক যা দেখছে তাই ভাঙছে। হঠাৎ দেখি দরজায় গোড়ায় দুজন মেয়েছেলে। আমি তাদের থামিয়ে বললাম—'গয়নাগাটি যা তোমাদের আছে, আমার কাছে রেখে, ঘরের ভেতরে ফিরে যাও। নইলে ডাকাতেরা সব কেড়েকুড়ে নেবে'। তাড়াতাড়ি তারা গা থেকে গয়নাগাটি সব খুলে আমাকে দিয়ে দিলো। পরেই তাদের খেয়াল হলো যে দারুণ ভুল করেছে তারা—আমি তাদের গাঁয়ের লোক নই, ডাকাতদেরই একজন। তখন তারা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। আমার দাবাড়ি খেয়ে তারা বাড়ীর মধ্যে ফিরে গ্যালো। কিন্তু আমার দলবল এতোটা সময় ধরে বাড়ীর

ভেতরে কি যে করছে বুঝতে পারছি না। এদিকে তখন গাঁয়ের লোক জেগে উঠেছে ও দারুণ হল্লা করতে করতে এগিয়ে আসছে। আমি তখন হাঁক পাড়লাম 'হুঁশিয়ার'। ভেতর থেকে সকলে বেরিয়ে এলো ও আমরা বাড়ী ছেড়ে চম্পট দিলাম। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে আমরা হাঁপ ছাড়ছি, এমন সময় চারপাশের জঙ্গল থেকে অনেক মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে এলো। দলের বিষ্টু ঘোষ ব্যাপারটা বুঝে আসতে গ্যালো। দু'চার মিনিট পরেই দেখি বিষ্টু পড়ি তো মরি করে দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে। পেছনে তার তিনু ঘোষ, ফাঁড়িদার ও গাঁয়ের একগাদা লোকজন। তিনু ঘোষ তো আমাদেব দলের লোক, সে ফাঁড়িদারের সঙ্গে জুটলো কি করে? কিন্তু তখন আর সে সব ভাবার সময় নেই। আমরা তখন প্রাণপণে দৌড়োতে আরম্ভ করে দিলাম। কি দৌড়, কি দৌড়! কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে? ফাঁড়িদার ও তিনু সঙ্গে থাকাতে গাঁয়ের লোকদের সাহস গেছে বেড়ে; কিছুতেই তারা পিছু ছাড়ে না। একবার তো আমাদের পাঁচ সাতজনের সঙ্গে গাঁয়ের লোকদের মুখোমুখি লড়াই বেঁধে গ্যালো। আমরা সবাই মিলে তাদের হটিয়ে দিলাম। কিছু পরে দেখি গাঁয়ের লোক দলে ভারী হয়ে আবার আমাদের ওপর হামলা করতে এগিয়ে আসছে। বুঝলাম যে আমরা শক্ত পাল্লায় পড়েছি। এবার আর সামনা-সামনি লাঠি চালিয়ে গাঁয়ের লোকেদের কাবু করা যাবে না। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

সাহেব। কেন? তোমাদের মতো পাকা পাকা সব লাঠিয়ালদের হাতে লাঠি থাকতে আবার ভয় কি?

মাণিক। গাঁয়ের লোকরাও, হুজুর, লাঠি চালাতে জানে। ডাকাতির ভয়ে এখন গাঁয়ের ছেলে বুড়ো এমন কি অনেক মেয়েরাও লাঠি ধরতে শিখেছে। তার ওপর তাদের সঙ্গে রয়েছে ফাঁড়িদার ও তিনু। তিনু তো একাই আমাদের দু'তিন জনের মওড়া নেবার ক্ষ্যামতা রাখে।

সাহেব। তা কি করলে তখন?

মাণিক। কি আর করবো হুজুর? যে যেদিকে পারি ভোঁ দৌড় দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৌড়ে-নারাণই বিপদে পড়ে গ্যালো।

সাহেব। দৌড়ে—নারাণ?

মাণিক। হ্যাঁ হুজুর! নারাণ বাগ্দী শ্যালের মত দৌড়োতে পারতো বলে আমরা তার নাম দিয়েছিলাম—'দৌড়ে-নারাণ'।

সাহেব। কি হলো তার ?

মাণিক। মাঠ ভেঙে দৌড়োতে দৌড়োতে সে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গ্যালো। আর যাবে কোথায়। যমদূতের মতো ফাঁড়িদার এসে তাকে একেবার জাপটে ধরে বেঁধে ফেললো। আমরা অবিশ্যি কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচেছিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষে হলো না।

সাহেব। কেন ?

মাণিক। মারের চোটে নারাণ আমাদের সকলের নাম ফাঁস করে দিয়েছিলো। তারপর পুলিশ একে একে আমাদের সবাইকে ধরে চালান করে ত্যায়। আমি অবিশ্যি হাকিমের হুকুমেই ছাড়া পেয়ে যাই। নারাণ ছাড়া আর সকলেও আখেরে জজ সাহেবের বিচারে খালাস পায়। আর নারাণের হয় ন' বছরের জেল। দলবলকে ফাঁসিয়েও তাকে ন'টী বছর ঘানি টানতে হয়েছিলো।

সাহেব। কিন্তু তিনু তো তোমাদের দলের লোক। সে গিয়ে ফাঁড়ি-দারের সঙ্গে হাত মেলালো কেন ?

মাণিক। গণ্ডগোল তো সেখানেই, হুজুর। তিনুর চালে আমরা সকলেই একেবারে বাজীমাৎ হয়ে গিয়েছিলাম। ডাকাতির খবরটা যুগিয়েছিলো তিনুই। তিনু আমাদের দলে মিলে অনেক ডাকাতি করেছে। তাই তার কথা শুনেই আমরা কাজে নেমে পড়ি। কিন্তু তিনু ব্যাটা যে আমাদের ধরার জন্যেই ফাঁদ পেতেছে, তা কে জানতো ?

সাহেব। কিন্তু তাতে তিনুর লাভ কি ?

মাণিক। লাভ আছে বৈ কি হুজুর। তিনু একজন দাগী ডাকাত। রাতে তাকে ফাঁড়িতেই ঘুমোতে হতো। ফাঁড়িতে ঘুমোনোর যে জ্বালা অনেক তা তো হুজুর বুঝতেই পারছেন। তাই তিনু একদল ডাকাতকে ধরিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গ্যালো।

সাহেব। কেন ? ফাঁড়িদারকে খুসী করার জন্যে ?

মাণিক। ঠিক্ তাই, হুজুর। ডাকাতদের জ্বালায় পুলিশ তখন চোখে কানে টের পাচ্ছে না—এমনি অবস্থা। কাজেই একদল ডাকতেকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে, সে তো, হুজুর, পুলিশের নেক্-নজরে পড়বেই। তিনু তাই আমাদেরই ধরতে ফাঁদ পাতলো। আমরা না বুঝে সুঝে একেবারে বোকার মতো তার ফাঁদে পা দিলাম। ফলে তিনুর বরাতে জুটলো চৌকিদারি আর আমাদের হাতে পড়লো দড়ি।

সাহেব। কাশ্যাডাঙ্গার জলডাকাতিটা কারা করেছিলো? তোমরা, না?

মাণিক। হ্যাঁ, হুজুর। সে কাজটাও আমরাই করেছিলাম। কিন্তু গোড়াতে নৌকো লুঠ করার কোনো মতলবই আমাদের ছিলো না। পুলিশ তখন আদা জল খেয়ে আমাকে ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই ভাবলাম কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকি। কিন্তু যাই কোথায়? নদে জেলায় আমার আস্তানার অবিশ্যি অভাব নেই। কিন্তু পুলিশ নিশ্চয়ই সে সব জায়গায় গিয়ে হানা দেবে। শেষে ঠিক করলাম যে যাই চলে বর্দ্ধমানে। সেখানে দুর্গ্যো চাষা ও লোকনাথ সদ্‌গোপ বলে আমার দু'জন দোস্ত আছে। কিছু না হোক দু'দিন তো সোয়াস্তিতে থাকতে পারবো। গেলাম চলে দোস্তদের কাছে। গিয়ে দেখি যে তারা একটা ঘর ডাকাতি করার মতলব আঁটছে। আমাকে পেয়ে তারা তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা। আমি একে তাদের দোস্ত, তার ওপর একজন পাকাপোক্ত ডাকাত। ভাবলাম ভাগ্যিটা আমার ভালই দেখছি—আসতে না আসতেই একটা কাজ জুটে গ্যালো। খুসী মনেই দোস্তদের দলে ভিড়ে গেলাম। দিনের দিন এক জায়গায় গিয়ে সকলে জড়ো হলাম। সেখানে ছিরামের মুখে শুনলাম যে কাশ্যাডাঙ্গার কাছাকাছি একটা সরকারী নৌকো নোঙর বেঁধে আছে। ছিরামের বিশ্বাস নৌকোটার মধ্যে বেশ কিছু মালামাল আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর ডাকাতির মতলব বাতিল করে আমরা ছুটলাম ঐ নৌকোটার খোঁজে। নৌকোটা তখন নদীর মাঝ বরাবর একটা চড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চড়ায় গিয়ে আমরা উঠি কি করে? সাঁতরে অবিশ্যি আমরা যেতে পারতাম। কিন্তু এতগুলো লোক সাঁতরে গেলে, বেশ জোর আওয়াজই উঠবে। তাতে লোকজন যদি জেগে যায় তাহলে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সাহেব। কেন? সাঁতরে আবার ডাঙায় উঠে চম্পট দেবে।

মাণিক। তা হয় না, হুজুর। নদীতে তখন নৌকো গিজ গিজ করছে। মাঝি মাল্লারা সব জেগে উঠলে, আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তারপর লগি হাঁকড়ে আমাদের মাথাগুলো সব ফুটি-ফাটা করে ছাড়বে।

সাহেব। তা, তোমরা কি বুদ্ধি করলে?

মাণিক। বুদ্ধি একটা করলাম, বৈ কি? কেশোববাবুর একটা

ডিঙি দেখলাম ঘাটে বাঁধা রয়েছে। সেটাতে চেপে আমরা তার কাছি দিলাম খুলে। ভাসতে ভাসতে সওয়ারী নৌকোটার কাছে চলে গেলাম। তারপর টপাটপ ডিঙি থেকে লাফ দিয়ে সওয়ারী নৌকোটার ওপর গিয়ে পড়লাম। হাতের কাছে লগি যা পেলাম, তাই দিয়েই হাতিয়ার বানিয়ে নিলাম। এবার কাছি খুলে দিয়ে, নৌকোটাকে নিয়ে গিয়ে ভেড়ালাম উল্টো পারে—বর্দ্ধমানের দিকে। নৌকোর ভেতরের লোকজন তখন জেগে উঠেছে। হঠাৎ বাজখাঁই গলায় আওয়াজ হলো—'খবরদার'। এ কি রে বাবা! যেখানে বাঘের ভয়, সেখেনেই যে দেখি সন্ধ্যে হয়। ভেতরে কি চৌকিদার বা বরকন্দাজ কেউ আছে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে দাঁড়ালো একজন দশাসই ভদ্দরলোক। তিনি গর্জে উঠলেন—'তোদের সাহস তো কম নয়। আমি ছিলাম গিয়ে মুর্শিদাবাদের দারোগা। আমার দাপটে তখন বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেতো। আর তোরা কি না আমার নৌকোতেই ডাকাতি করতে উঠেছিস।' শুনে একেবারে দমে গেলাম। কিন্তু লোকনাথ অতো সহজে ঘাবড়াবার লোক নয়। মাথাও তার বেশ সাফ। সে আমার কানে কানে বললো—'আরে দারোগাই যদি হবে, তাহলে হাতে অস্তরপাতি কিছু নেই কেন? চৌকিদার, বরকন্দাজেরাই বা কোথায়?' শুনে ভাবলাম—তাইতো বটে। মনে সাহসও ফিরে এলো। হাত কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞাসা করে বসলাম—'তা, হুজুর এখন কোন থানাতে আছেন?' হুজুর তখন আচমকা বলে ফেল্লেন—'আমি কয়েক মাস হলো রিটায়ার করেছি। এখন আর চাকরী করি না।' এবার আমাদের ধড়ে প্রাণ এলো। যতই ফেনা তুলে হাঁক পাড়ুন না কেন, দারোগা বাবু এখন যে একটী ঢোড়া সাপ এটা মনে হতেই কেমন যেন হাসি পেলো।

সাহেব। ঢোড়া সাপ মানে কি?

মাণিক। এক ধরণের সাপ হুজুর। দেখতে বেশ বড় সড়ো, গায়ে চক্করও আছে, কিন্তু বিষ নেই। মানুষকে কামড়ালে কিছু হয় না। আমাদের দারোগা বাবু এখন সেই পেকারের সাপ নয় কি?

সাহেব। তা ভালই বলেছো বটে। তারপর?

মাণিক। ভুগগো চাষা আবার বেশ রগুড়ে লোক। দাপটের দারোগাকে বেকায়দায় পেয়ে একটু মজা করার লোভ সে ছাড়তে পারলো না। হাতজোড় করে সে বললো—'তা হুজুরের হাতে একদিন আইনের জোর

ছিলো ঠিকই, অনেক চৌকিদার বরকন্দাজও আপনার হাইতে হাত পাততো। তখন তো আপনি ডাকাতদের সব্বোনাশ করতে কসুর করেন নি। কিন্তু এখন? আপনার হাতে আইনের জোর বলতে কিছু নেই, আমাদের গায়ের ও লাঠির জোর দুইই আছে। না, না, ঘাবড়াবেন না হুজুর। ডাকাত হলেও আমাদের মায়া দয়া আছে। এখন ভালো ছেলের মতো গয়না গাঁটি, টাকা পয়সা যা আছে দিয়ে দিন। ব্রেথা

দারোগাগিরি ফলালে কিন্তু ভালো হবে না।' ডাকাতদের মন মেজাজের খবর দারোগাবাবু ভালই জানতেন। তাই আর রাটি না কোড়ে রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে গয়নাগাঁটি, কাপড় চোপড়, শাল, শাড়ী, নগদ টাকা যা ছিলো সবই আমাদের হাতে তুলে দিলেন। দাঁওটা সেদিন মন্দ হয় নি—নগদ ও মালে, প্রায় হাজার বারোশো টাকা তো হবেই। আমারই ভাগে যা পড়েছিলো তা বেচে আমি একশো পঁচাত্তর টাকার মতো পেয়েছিলাম। দারোগাবাবু নালিশ করেছিলেন, জোর তদন্ত ও হয়েছিলো, কিন্তু আমরা কেউউ ধরা পড়িনি।

সাহেব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলে কি? জীবনভোর ডাকাতি করেছো, বহুলোককে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছো। তাদের অভিশাপের ফল এতদিনে ফলেছে। তুমি ধরা পড়েছো। এখন তোমাকে বাঁচাবে কে?

মাণিক। হুজুর ধম্মাবতার। হুজুর ইচ্ছে করলে মারতে ও পারেন, বাঁচাতেও পারেন।

সাহেব। বাঁচাবার মালিক ভগবান। প্রার্থনাটা বরং তাঁর কাছেই জানাও।

বিষ্টু গোয়ালার (বিষ্ণু ঘোষের) আত্মকথা

এবার শোনো নদীয়ার আর এক দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত বিষ্টু গোয়ালার (বিষ্ণু ঘোষের) কথা।

নদীয়া জেলার কোতোয়ালী থানার মায়াকুল গাঁয়ের মানুষ সে। মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই সে ডাকাত-ধরা সাহেবের হাতে ধরা পড়ে। তার আগেই সে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক ডাকাতি করে ফেলেছে। ধরা পড়ে সে গড় গড় করে নিজের জীবনের কাহিনী, ডাকাতির কথা, ইত্যাদি সব কিছুই সাহেবের কাছে খুলে বলেছিলো। কেন? এই 'কেন'র উত্তর বিষ্টুর মুখেই শুনতে পাবে। এ সব ঘটনা কিন্তু আজকের নয়! সাহেবের কাছে হাজির হয়ে বিষ্ণু নিজের ও দলের সব কথা ফাঁস করে দিয়েছিলো ১৮৫৫ সালের ১৪ই জুন—অর্থাৎ আজ থেকে একশো বাইশ বছর আগে।

সাহেব। তুমি জানো যে তোমাকে ডাকাতি করার অপরাধে গ্রেফ্তার করা হয়েছে। তুমি কি নিজের অপরাধ স্বীকার করো? না, কিছু বলতে চাও?

বিষ্টু। আমি নিজের সব দোষই মেনে নিচ্ছি, হুজুর। আমি স্বীকার করছি যে আমি ডাকাত এবং অনেক ডাকাতি করেছি।

সাহেব। কিন্তু তুমি দোষ স্বীকার করছো কেন?

বিষ্টু। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে গত দু'বছর যে কি-ভাবে কাটিয়েছি তা শুনলেও হুজুরের পেত্যয় হবে না। বছর দুই আগে আমার কয়েকজন স্যাঙাতের সাজা হলো। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম এবার আমার পালা। তাই তখন থেকেই আমি গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছি। বাড়ীমুখো হবার তো কোনো যো নেই। সেখানে আমাকে সবাই চেনে—গেলেই চৌকিদার খবর পাবে ও আমার হাতে দড়ি পড়বে। দিনে বেরুতে পারি না। কে জানে কোথায় কোন গোয়েন্দা ওৎ পেতে আছে। আমরা শুনেছি কি না যে হুজুরে চর গাঁয়ে গাঁয়ে ফাঁদ পেতেছে আমাদের ধরার জন্যে। শুধু রেতের বেলায় এগাঁ থেকে ওগাঁয়ে, এপাড়া থেকে ওপাড়ায় যাতায়াত করি। তাও কি হুজুর নিশ্চিন্তি হয়ে পথ চলতে পারি? হঠাৎ একটা আওয়াজ হলে থমকে দাঁড়াই, ঘুরে ফিরে চারদিকটা

একবার দেখে নিই—চৌকিদার, বরকন্দাজ বা গোয়িন্দা নয় তো? এক খানে যে দু'চার দিন বসে জিরোবো, তার ও উপায় নেই। যদি কেউ খবর পেয়ে যায়? এ রকম করে আর কতোদিন চলা যায়, হুজুর! তাই হুজুরের হাতে ধরা পড়ে আমি যেন বেঁচে গেছি। আমার জেল, বা কালাপানি যা হয় হোক—আমি আর বাড়ি-খাওয়া শ্যালের মতো রেতেবিরেতে বনে জঙ্গলে ঘুরে মরতে পারবো না। আমি যা করেছি, সব কথাই হুজুরের কাছে খুলে বলতে এসেছি। এখন হুজুরের দয়া হলে সব কিছুই হতে পারে। হুজুর আমাকে কালাপানি থেকে রেহাই দিয়ে যদি গোয়িন্দা করে নেন—তাহলে চেরকাল হুজুরের গোলাম হয়ে থাকবো।

সাহেব। হুঁ, ভালো কথা। এখন তোমার নিজের কথা বলো। ছেলেবেলায় কি করতে, কেমন করেই বা ডাকাত হলে?

বিষ্টু। আমরা তিন ভাই। আমি মেজো। আমরা তিনজনেই পোলতা গাঁয়ে বাপের কাছে থাকতাম। জাতিতে আমরা গোয়ালা। লেখাপড়া বলতে আমরা কেউ কিছু শিখিনি। বাবার একপাল গোরু ছিলো। আমরা তিন ভাই মিলে গোরুগুলোর দেখাশোনা করতাম। দেখতে দেখতে আমরা বড়ো হয়ে গেলাম। তিন ভায়ের মধ্যে আমিই বেশ শক্ত সমত্থ, আর আমার গড়ন-পেটনও বেশ মজবুত। তাই তখন গোরুগুলো দেখাশোনার ভার একলা আমার ঘাড়েই পড়লো।

সাহেব। ঠিক বুঝতে পারলাম না। গোরুর তদারকি করতে শক্তি সামর্থের কি দরকার?

বিষ্টু। গোরুর তদারকির কাজ তাগদ ছাড়া হয় না, হুজুর। একপাল গোরুকে সামলানোই কি চাড্ডিখানি কথা? তারপর গোরু-চরানো নিয়ে খিটিমিটি তো লেগেই থাকে, মাঝে মাঝে লাঠালাঠিও বেঁধে যায়।

সাহেব। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলো।

বিষ্টু। গোরুর ঘাসজল তো চাইই, চরে বেড়াবার মতো মাঠ ও না হলে চলে না। কিন্তু এতো ঘাসই বা কোথায় পাই, মাঠই বা কি করে মেলে? তাই মাঠ ও ঘাসজল নিয়ে গোয়ালাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বেঁধে যায়। আর এই ধরণের ঝগড়াঝাঁটি অনেক সময় লাঠির জোরেই আমরা ফয়সাল্লা করে নিই। ভিনগাঁয়েও যেতে হয় গোরুর পাল নিয়ে। সেখানে জোরজবরদস্তি ছাড়া তো কোনো কাজই হবে না। কে আর নিজের জমিতে অপরের গোরুকে চরতে দেবে? তাই রাখালি করতে

করতেই আমি লাঠিয়াল বনে গেলাম। আর আমার সাহসও গ্যালো বেড়ে। কিন্তু হরহামেসাই তো আমাকে ভিনগাঁয়ে লাঠিবাজি করে বেড়াতে হতো না। বর্ষা এলে আর ঘাসজলের অভাব থাকতো না। রাখালি করার ঝামেলাও তখন কমে যেতো এবং আমরা নিজেদের গাঁয়েই থাকতাম। হাতে সময় থাকলেই যত না ঝুট ঝঞ্ঝাট জোটে। চুপচাপ করে বসে থেকে গাঁয়ে সময় কাটানো যায় না। তাই মাঝে মাঝে ইয়ার বক্সীদের বাড়ী গিয়ে নেশাভাঙ খেতাম ও আড্ডা দিতাম। সেই হলো কাল। আমাদের পাড়ার মাণিক গোয়ালাকে সবাই আমরা ডাকাত বলে জানতাম। কিন্তু তবুও তার বাড়ী গিয়ে নেশা করতাম। একদিন মাণিকের সঙ্গে বেশ মৌজ করে মদ টানছি, এমন সময় ডাকাতির কথা উঠলো। সেখানে তখন অনেক লোক। নেশা করে আমি বেশ বুঁদ হয়ে গেছি। কি যে কথাবার্তা হলো সব মনেও পড়ে না। এটুকু শুধু মনে আছে যে মাণিক বলেছিলো যে সামান্য একটু গতর খাটালে ডাকাতির কল্যাণে অনেক টাকা মেলে।

কথাটা মনে ধরলো ও সঙ্গে সঙ্গে মাণিকের দলে নাম লেখালাম। ব্যাস্, একেবারে চেরকালের মতো ফেঁসে গেলাম। এর কিছুদিন বাদে মাণিকের

দলের সঙ্গে একটা সওয়ারী নৌকোর ওপর হানা দিলাম। সেই পেরথম বার তো! ভয়ে হাঁটু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, বুক ঢিপ ঢিপ করছে—না জানি কি একটা হয়। ফলে নৌকোর ওপর আমি চড়তেই পারলাম না। তীরে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু সব দেখেই গেলাম। মাণিক ও তার দলবল যা পারলো লুঠে নিলো। কিন্তু সে যাত্রায় বিশেষ কিছু কারো বরাতে জোটে নি। আমার ভাগে পড়েছিলো মাত্র একজোড়া কাপড়। এই নাকি ডাকাতির নমুনা! একজোড়া কাপড়ের কি-ইবা এমন দাম। অথচ ধরা পড়লে যে কম করে অন্তত দু'দুটী বছর ঘানি টানতে হবে। এই সব সাত পাঁচ ভেবে ঠিক করলাম—আর নয়, যা হবার তা হয়েছে। এ কাজে ঝক্কি অনেক, কিন্তু রোজগার পাতি তেমন নেই। তাই মাণিককে এড়িয়ে চলতে থাকলাম। কিন্তু মাণিক আমাকে ছাড়বে কেন? সে তখন সর্দার গোছের লোক। তার তাঁবে বেশ কিছু লোক না থাকলে চলে না। কাজেই সে আবার গায়ে পড়ে আমাকে ডেকে পাঠালো। আমি তাকে সাফ বলে দিলাম—'দু খানা কাপড়ের জন্যে দু'বছর জেল খাটা আমার পোষাবে না।' মাণিক বললো—'আরে, সব সময়ই তো টাকাকড়ি বরাতে মেলে না। তবে প্রায়ই আমরা মোটা টাকার দাঁও মেরে থাকি। এবার আমি নিজেই খেয়াল রাখবো, যাতে তোর বেশ দু'পয়সা জোটে।' ঐ যা বলে না, লোভে পাপ ও পাপে মিত্যু। মন টলে গ্যালো, আবার মাণিকের সঙ্গে গেলাম ডাকাতি করতে। এবার কিন্তু মাণিক তার কথা রেখেছিলো। একফাঁকে সে দল ছেড়ে ভেগে গিয়েছিলো—সঙ্গে তার করকরে তিনশো টাকা। তার থেকে আমি পেলাম পুরোপুরি একশো টাকা। জীবনে আমি একসঙ্গে অতো টাকা চোখে দেখিনি। আমার মন গলে গ্যালো এবং আমি পাকাপোক্তভাবে মাণিকের দলে ভিড়ে গেলাম। গোরু চরাণোর কাজ কি আর তখন আমার ভাল লাগে? আমি যে সবে কাঁচা টাকার সোয়াদ পেয়েছি। আমার ছোট দু'ভাই মিলে গোরুগুলোর দেখা শোনা করতে লাগলো। আর আমি মদে ও বদ্‌খেয়ালে গা ভাসিয়ে দিলাম। সেই থেকে কতো যে ডাকাতি করেছি তার কোনো লেখাজোখা নেই।

সাহেব। কিন্তু তুমি পোলতা ছেড়ে মায়াকুলে গিয়ে জুটলে কেন?

বিষ্টু। জমিদারের জ্বালায়, হুজুর। আমি তখন মাণিক ঘোষের সঙ্গে ডাকাতি করে বেড়াই। হঠাৎ একদিন দারোগাবাবু আমাদের গাঁয়ে এসে

হাজির হলেন। জানালেন যে মাণিক সর্দারের খোঁজে তিনি এসেছেন এবং তাকে তাঁর চাইই। কিন্তু কোথায় মাণিক? বেকুবের মতো ধরা পড়ার পাত্তর মাণিক সর্দার নয়। সে হাওয়ার আগে খবর পেয়ে একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেছে। এ সব শুনে দারোগা মোটেই খুসী হলেন না। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে মাণিককে ধরতে দারোগাবাবু একেবারে কোমর বেঁধে লেগে গেছেন। কাজেই অল্পে ব্যাপারটা মিটবে না। যা ভেবেছি ঠিক তাই হলো। দারোগাবাবু সোজা গাঁয়ের জমিদারবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। বললেন—'মাণিককে আমার চাই-ই। আপনারই এলাকায় সে দিনের পর দিন দিব্যি বাহাল তবিয়তে থেকে একটার পর একটা ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। আর আপনি তার চলা ফেরার কোনো হিসেব রাখেন না বললে তো চলবে না। যেখান থেকে পারেন আপনি তাকে হাজির করে দিন।' কিন্তু মাণিক তো আর জমিদারবাবুকে তার ঠিকানা জানিয়ে পালায় নি। তাই তাকে কি করে হাজির করবেন তিনি? এতো কৈফিয়ৎ শোনার মতো মেজাজ তখন দারোগাবাবুর নেই। তিনি জমিদারবাবুর ওপর পুরোপুরি দু'শো টাকা জরিমানার হুকুম জারি করে চলে গেলেন। জমিদারবাবুই বা নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করবেন কেন? তিনি আমাদের দলের নবাই গোয়ালাকে পাকড়াও করলেন। নবাই ঘাট মেনে বলে ফেললো যে মাণিকের দলে ভিড়ে সেও ডাকাতি করে থাকে। জমিদারবাবু চাপাচাপি করতে আমাদের কিত্তির কথা ও আর সে চেপে রাখতে পারলো না। এরপরই জমিদারবাবু আমার ওপরে চড়াও হলেন। তাঁর হুকুম পেয়ে আমি মাল কাছারীতে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি জমিদারবাবু রাগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। আমি কত করে বললাম যে আমি মাণিকের দলের লোক নই, ডাকাতির বিন্দু বিসর্গও জানি না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? তিনি সোজা হুকুম শুনিয়ে দিলেন—'ও সব ছেঁদো কথা রাখ, ব্যাটা। ওনারা ডাকাত্তি করে মজা লুটবেন, আর আমি জরিমানার টাকা গুণবো। তোর পুরো পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করলাম। কাল সূর্য্য অস্তে যাবার আগেই জরিমানার টাকাটা আমার চাই। যদি তা না পাই, তাহলে তোদের যা কিছু সব আটক করে বেচে দেব। আমি জানি কি করে জরিমানার টাকা উশুল করতে হয়।' বাড়ী ফিরে এসে বাবাকে সব কথাই খুলে বললাম। আমি যে এখন ডাকাতের দলে আছি তাও বললাম।

কিন্তু সব শুনেও জরিমানার টাকাটা দিতে বাবা রাজী হলো না। এখন উপায়? রাত পোহালে জমিদারের কাছারিতে টাকা জমা দেবার কি হবে? জমিদারকে আমরা তো হাড়ে হাড়ে চিনি। কান্নাকাটি শুনে তাঁর মন ভিজবে না। তিনি মুখে যা বলেছেন, কাজেও ঠিক তাই করবেন। কিছু না পেলে আমাদের গোরুগুলো বেচে দিয়ে জরিমানার টাকা তুলে তবে ছাড়বেন। এই সব সাত পাঁচ ভেবে সেই রাতেই আমরা ভিটে মাটি ছেড়ে মায়াকুলে এসে আস্তানা গেড়ে বসলাম। বাবা সেই থেকে মায়াকুলেই পাকাপাকি ভাবে রয়ে গ্যালো। আমি মায়াকুলে ছিলাম মাত্তর দু বছর। এই দু' বছরে সুযোগ পেলেই ডাকাতি করেছি। একদিন 'গলাকাটা' আমার কাছে এসে বলে—

সাহেব।—'গলাকাটা' অবার কে?

বিষ্টু। ও হরি, সে কথাই তো বলা হয় নি। আমাদের দলের হরিশ একবার ডাকাতি করতে গিয়ে গলায় একটা দায়ের কোপ খেয়েছিলো। সেই থেকে আমরা তাকে গলাকাটা বলে ডাকি।

সাহেব। বুঝেছি। তারপর, বলে যাও।

বিষ্টু। গলাকাটা বললো—'শুনলাম, ঈশেনবাবু নাকি লাঠিয়াল খুঁজছেন। তেমন মজবুত লোক পেলে তিনি মাসে সাত থেকে আট টাকা মাহিনে দিতেও রাজী। দরকার হলে মারদাঙ্গা করতে হবে কিন্তু—তা হলেই হবে। চল্ না গিয়ে কাজটা আমরা বাগাই।' আমি রাজী হয়ে গেলাম। বিকেলের দিকে আমরা দু'জনে রওয়ানা দিলাম। বেশ লম্বা পথ, ঈশেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে যখন হাজির হলাম, তখন রাত হয়ে গেছে। কিন্তু গরজ বড়ো বালাই। বাবু তখনই আমাদের ডেকে পাঠালেন। শুধু তাই নয়, নগদ দুটাকা করে আমাদের দু'জনকে দিলেন।

সাহেব। দু'টাকা কি আগাম মাহিনা হিসেবে পেলে তোমরা?

বিষ্টু। আজ্ঞে, হুজুর তা ঠিক নয়। রাত পেরভাত হলেই যে দাঙ্গা বাধবে। হাতে কিছু না পেলে আমরা লাঠি ধরবো কোন দুঃখে?

সাহেব। বেশ তারপর?

বিষ্টু। একটা ইঁটের পাঁজা নিয়েই এতো সাজো সাজো রব। একদিকে আমাদের ঈশেনবাবু, অপর দিকে কেশোববাবু। কেশোববাবু গোঁ ধরেছেন যে তিনি পাঁজাটি উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। আমাদের বাবুরও ধনুক-ভাঙা পণ—যে ভাবেই হোক কেশোবকে রুখতে হবে। ভোর না হতেই

আমরা গিয়ে পাঁজাটিকে ঘিরে দাঁড়ালাম। কেশোববাবুর দলবল যেই না এসেছে, অমনি আমরা রৈ রৈ করে তেড়ে গেলাম। ব্যাস্, লাঠালাঠি আরম্ভ হয়ে গ্যালো। সে যে কি দাঙ্গা, হুজুর, তা কি বলবো! কখনও মনে হয়, এই বুঝি আমরা হটে গেলাম। কিন্তু ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যাওয়া আমাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি। সাহসে ভর করে আবার শক্ত হাতে লাঠি ধরি। বেলা যখন প্রায় গড়িয়ে এসেছে তখন কেশোববাবুর দল রণে ভঙ্গ দিলো। ইঁটের পাঁজার দখলদারি আমাদের হাতেই থেকে গ্যালো। তবে হুজুর, কেশোববাবুর দলের সর্দারের লাঠি খেলা আজও আমার চোখে ভাসে। বাপের ব্যাটা বটে—যেমন তার সাহস, তেমনি তার শিক্ষে। তবে তার জুড়িদাররা ছিলো কমজোর। তাই না আমাদের সেদিন জান মান রক্ষে হলো।

সাহেব। সেই লাঠিয়ালটি কি?

বিষ্টু। বিদেশী লোক হুজুর।

সাহেব। কিন্তু ইঁটের পাঁজাটার কি হলো?

বিষ্টু। সব ইঁট আমরা কুলির মাথায় করে, আর গোরুর গাড়ীতে চাপিয়ে ঈশেনবাবুর বাড়ীর হাতায় পৌঁছে দিলাম। বাবুর তখন খুসী আর ধরে না।

সাহেব। তোমরা কি তারপর ঈশানবাবুর কাছে থেকে গেলে?

বিষ্টু। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। ঈশেনবাবু বললেন—'তোদের কাজ কাম দেখে আমি ভারী খুশী হয়েছি। তোরা আমার কাছেই থেকে যা—মাস মাস সাত টাকা করে মাইনে পাবি আর বাইরে কাজ-কাজিয়ায় গেলে ছ'পয়সা করে খোরাকিও মিলবে।' আমরা তাই থেকে গেলাম। কিন্তু সে আর, কদিন?

সাহেব। কেন? ডাকাতি না করলে কি ভাত হজম হচ্ছিল না?

বিষ্টু। আজ্ঞে তা নয়, হুজুর। গাঁ থেকে খবর এলো যে চৌকিদার আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভয়ের কথা। আমি তাড়াতাড়ি একটাকা বাবাকে পাঠিয়ে দিলাম। আমার মনে হয় যে টাকাটা পাবার পর চৌকিদার আর মুখ খোলে নি। কিন্তু হরিশদারোগার কাছে ছাড়ান-ছিটেন নেই। তিনি সরাসরি হাকিমকে জানিয়ে দিলেন যে বিষ্টু ডাকাত বেপাত্তা। আর যাবে কোথায়? হাকিমের হুকুম জারী হয়ে গ্যালো—বিষ্টু ডাকাতকে খুঁজে বার করো। এ সব কথা আমার কানে আসতে আমি বেশ দমে গেলাম। শেষে বাবুকে গিয়ে ধরে বসলাম। বাবু রাজী হলেন। তিনি একটা চিরকুটে লিখে পাঠিয়ে দিলেন যে আমরা তাঁর কাছে চাকরী

করছি। কিন্তু হাকিম এসব কথা কানেও তুললেন না। বাবুর ওপর হুকুম জারী করে দিলেন—'বিষ্টু ও হরিশের মতো ঝানু ডাকাতদের চাকরীতে রাখা চলবে না। এখুনি তাদের বরখাস্ত করো। তারপর তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এ হুকুম গরমান্যি করলে দারোগা পাঠিয়ে এদের বেঁধে আনা হবে।' এরপর আমি বাবুর কাছে থাকতে আর সাহস পেলাম না। মায়াকুলে ফিরে এলাম। কিন্তু বুকের পাটা বটে হরিশের—সে রয়েই গ্যালো। শেষে একদিন এক বরকন্দাজ গিয়ে হাজির। হরিশকে নিয়ে সে মায়াকুলে পৌঁছে দেবে। কিন্তু বাবু রেগে মেগে হুকুম দিলেন—'ব্যাটাকে মেরে, ঘাড় ধরে বার করে দাও'। বাবুর হুকুম তামিল হয়েছিলো শুনেছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হরিশের আর কোনো পাত্তাই পেলাম না। সে কথা যাক, বাড়ী ফিরে আমি আবার ডাকাতি করতে আরম্ভ করে দিলাম। এইভাবে প্রায় বছর খানেক কেটে গ্যালো। শেষে একদিন কুবের গোয়ালার সঙ্গে দেখা। কুবের একজন পাকা ডাকাত তা তো হুজুর জানেনই। সেই কুবের তখন সবে ন বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে। সে আমার কানে মন্তর দিলো—'চল্, আমরা গিয়ে কেশোববাবুর লাঠিয়ালের চাকরীতে ভর্তি হয়ে যাই।' আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম।

সাহেব। সে কি? তোমরা না কিছুদিন আগে কেশববাবুর বিরুদ্ধেই লাঠি ধরেছিলে!

বিষ্টু। তাতে কিছু এসে যায় না, হুজুর। আমরা যখন যার নেমক খাই, তার হয়েই লাঠি ধরি।

সাহেব। বেশ, তারপর কি হলো?

বিষ্টু। বাবু তো আমাদের দেখে খুব খুসী। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভর্তি করে নিলেন। কিন্তু সদরে আমাদের রাখলেন না। আমরা চলে গেলাম ভিনগাঁয়ের এক কাছারি বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে আরও কয়েকজন লাঠিয়ালের সঙ্গে দেখা হলো। তারা আবার আমাদেরই জ্ঞাতগোত্তোর। তাদের দলে ভিড়ে আমি আবার ডাকাতি করতে আরম্ভ করে দিলাম। বছর দু'তিন আমি তাদের সঙ্গেই কাজ করেছি। তারপর আমি কয়েকদিন ছুটী নিলাম। অনেকদিন দেশ গাঁয়ের মুখ দেখিনি, প্রাণটা কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠেছিলো। ছুটী নিয়ে চলে গেলাম সোজা মায়াকুল। সেই যাওয়াই হলো আমার কাল।

সাহেব। কেন?

বিষ্টু। যাওয়া মাত্তর কেমন করে জানিনা খবর রটে গ্যালো—বিষ্টু ডাকাত হাজির সঙ্গে সঙ্গে যমদূতের মতো একজন জমাদার এসে আমাকে পিছেমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গ্যালো। অপরাধ—আমি বহুদিন ধরে গাঁয়ে গরহাজির। হাকিম সাহেব আমাদের মানে গোয়ালা ডাকাতদের ওপর নজর রাখার জন্যেই জমাদারকে গাঁয়ে মোতায়েন করেছিলেন। আমি অনেক দিন গাঁ-ছাড়া। জমাদারের সন্দেহ তো হবেই। গাঁয়ের লোকেরাও

জানে না যে এতদিন আমি কোথায় ছিলাম। জানবেই বা কি করে? লোকজনকে জানান দিয়ে কবে আর কে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে? জমাদার সাহেব গোঁপ চুমরে বললেন—'হুঁম্, সমঝ লিয়া।' আমি চালান হয়ে গেলাম। হাকিমের দাবাড়ি খেয়ে স্রেফ মিথ্যে কথা বলে বসলাম—'কোলকাতায় এক মহাজনের গদীতে ছিলাম, সাহেব। ত্থ'পয়সা রোজগারও হচ্ছিলো। আত্মীয় স্বজনকে দু'দিনের জন্যে দেখতে এসেই এই বিপদ।'

সাহেব। মিথ্যে কথা বলতে গেলে কেন?

বিষ্টু। এই হাকিম সাহেবকে আমরা যে হাড়ে হাড়ে চিনি, হুজুর। কেশোববাবু বা ঈশেনবাবুর নাম শুনলে তিনি খাপ্পা হয়ে যাবেন। হয়তো রাগের মাথায় কেশোববাবুকে শ' দুই টাকা জরিমানাই করে দেবেন।

সাহেব। তাতে তোমার কি এলো গ্যালো? জরিমানার টাকা তো কেশববাবুই গুনবেন!

বিষ্টু। সাজার ভয়ে মুনিবদের নাম ফাঁস করে দিলে, পরে আর কেউ কি আমাদের লাঠিয়ালের চাকরী দেবে? তাছাড়া, হুজুর, জেনে শুনে মুনিবের ক্ষেতি করলে অধম্মো তো হয় বটে।

সাহেব। ধর্মজ্ঞান তো এদিকে বেশ টনটনে দেখছি।

বিষ্টু। তা ধম্মের ভয়, হুজুর, আমাদেরও আছে বৈ কি? এই দেখুন না হুজুর, সোনাদানার লোভেই তো আমরা ডাকাতি করি। তবুও সহজে আমরা মেয়েদের গায়ে হাত দিই না।

সাহেব। হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলো তো?

বিষ্টু। মেয়েদের যে হুজুর মা কালীর অংশে জম্মো! তেনাদের গায়ে হাত তুললে কি আর রক্ষে থাকবে। বললে না পেত্যয় যাবেন, হুজুর, দু'চার জন যারা মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছে, তারা হয় ধড়ফড়িয়ে মরেছে, না হয় জেলে পড়ে পচ্ছে। এ যে কালী মায়ের বিচার!

সাহেব। আচ্ছা, বুঝলাম। কিন্তু হাকিম সাহেব কি তোমার কথা মেনে নিলেন?

বিষ্টু। না, হুজুর। সে বান্দাই তিনি নন। হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—'ব্যাটা, একটা মিথ্যের জাহাজ! বদ্‌মাইসি করার আর জায়গা পায় নি। যাও, মায়াকুলে তোমার থাকা চলবে না।' আমি কেঁদে কেটে বলি—'দেশভুঁই ছেড়ে কোথা যাবো, সাহেব?' আমার চোখের জলে সাহেবের মন ভিজলো বটে কিন্তু গললো না। তিনি বললেন—'বেশ, তাহলে থাকো তুমি। কোনোরকম বজ্জাতি করলে কিন্তু, তোমায় পুরো একশটী টাকা জরিমানা দিতে হবে। জরিমানার টাকা না দিতে পারলে, একটী বছর পচবে জেলে। কি রাজী?' আমি আর ট্যাঁ ফোঁ না করে তাতেই রাজী হ'লাম। সাহেবের কথা মতো দিলাম একটী মুচ্‌লেকা কিন্তু বাড়ীতে টেঁকা দায় হলো, হুজুর!

সাহেব। কেন?

বিষ্টু। মুচলেকা তো দিয়েই এলাম যে বজ্জাতি করলে শাস্তি আমি মাথা পেতেই নেবো। কাজেই আমি ভেবেছিলাম যে রাত-বিরেতে কেউ আর উৎপাত করবে না। কিন্তু এ যে দেখি রেতে চোখের দু'পাতা এক করতে পারি না। চৌকিদার এই ডেকে তুলে দেখে গ্যালো যে আমি

হাজির। কিন্তু সে যেতে না যেতেই আসে বরকন্দাজ, ফাঁড়িদার। শুয়ে শুয়ে আওয়াজ দিলে হবে না। ঘুম চোখে উঠে এসে বারবার পেরমান দিতে হয় যে আমি ফেরার হইনি। আমি একেবারে হাল্লাক হয়ে গেলাম, হুজুর। শেষে নিজেই হাজির হলাম হাকিমের কাছে। বললাম—'সাহেব, আমাকে বাইরে যেতে দিতে আজ্ঞা হয়। আমি কিচ্ছু বদ্‌মাইসি করবো না। শুদ্ধ একটি চাকরী নিয়ে চুপ চাপ থেকে যাবো।' তিনি জানালেন 'কিন্তু কেশোব, ঈশেন বা অন্য কোনো জমিদারের লাঠিয়ালির চাকরি নিয়েছো কি মরেছো। পুরো একটা বছর তাহলে তোমাকে ঘানি টানিয়ে ছাড়বো।' আমি পিতিজ্ঞে করলাম যে আমি কোলকাতার সেই পুরোনো মহাজনের কাছেই ফিবে যাবো। সাহেব কি বুঝলেন জানি না—আমি ছাড়া পেলাম। তারপর আর কে কার ধার ধারে ?' একেবারে সোজা চলে গেলাম কোলকাতায় নয়, সেই মফঃস্বলের কাছারি বাড়ীতে। সেখানে আমার পুরোনো দলবল তো ছিলই। তাদের সঙ্গে জুটে একটা বছর ডাকাতি করে কাটালাম। কিন্তু বেশীদিন সেখানে থাকা পোষালো না। চলে গেলাম ভিন গাঁয়ে মধু ঠাকুরের কাছে। তাঁর কাছে লাঠিয়ালের চাকরীতে ভর্তি হ'লাম। মাইনে তিনি ভালই দিলেন—আট আনা করে রোজ আর ছ' পয়সা করে খোরাকি।

সাহেব। এ যে বেশ মোটা মাইনের চাকরী দেখছি !

বিষ্টু। তা হবে না কেনো, হুজুর ? কথায় বলে না যে গরজ বড়ো বলাই। মধু ঠাকুরের তখন সেই গোছের অবস্থা। দাঙ্গা হাঙ্গামা তখন তাঁর লেগেই আছে। আর সে সব খুব জবরদস্ত দাঙ্গা। মোটা মাইনে না দিলে কে রোজ তাঁর মাথা বাঁচাতে নিজের মাথাটা এগিয়ে দেবে ? কিন্তু সেখানে ও পুলিশের জ্বালায় অতিষ্ঠো হয়ে উঠলাম।

সাহেব। কেন ?

বিষ্টু। হঠাৎ একদিন ধুমকেতুর মত গাঁয়ের জমাদার এসে হাজির। বলে—'বিষ্টু, ডাকাত কোথায় ?' আমি আগেই খবর পেয়েছিলাম যে মাণিক সর্দার ধরা পড়ে দোষ কবুল করেছে ও আমাদের সকলের নাম ফাঁস করে দিয়েছে। আমাদের সকলের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা ও বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ভাগ্যি ভালো যে জমাদার আমাকে চিনতে পারে নি। আমি নিজেকে সেদিন 'কেষ্টো ঘোষ' বলে চালিয়ে দিলাম। জমাদার চলে গ্যালো। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই চুকলো না। কয়েকদিন পরে

আবার সে এসে সরাসরি আমাকে ধমকে উঠলো—'তুমিই বিষ্টু ঘোষ, চলো আমার সঙ্গে।' কিন্তু লাঠিয়ালেব দল থেকে আমাকে গায়ের জোরে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া চাড্ডিখানি কথা নয়। আমার সঙ্গী সাথীরা মেজাজ দেখিয়ে রুখে দাঁড়ালো 'হিম্মতে কুলোয় তো নিয়ে যাও।' এবার জমাদার ঘাবড়ে গ্যালো। মানে মানে সে সরে পড়লো। কিন্তু আমি বুঝলাম যে আমার এখানকার ভাতজল উঠলো।

সাহেব। তোমরা তো দিব্যি জমাদারকে চোখ রাঙিয়ে ফিরিয়ে দিলে। তবে আবাব ভয়টা কিসেব?

বিষ্টু। এক মাঘে শীত পালায় না, হুজুর। জমাদার আমাকে চিনে ফেলেছে। সদবে খবর যাবে। দারোগাবাবু দলবল নিয়ে হাজির হলে, তখন আমাব স্যাঙাতরা সব যে কর্পূবের মতো উবে যাবে। তাই আমি আবার বেপাত্তা হয়ে গেলাম। জুটলাম গিয়ে মেহেরপুরের জমিদার, বিশ্বেশ্বর রায়েব কাছে। তাঁব কাছে পেলাম একটা তুচ্ছ চাকরের কাজ—মাহিনে মাত্তব চার টাকা। এতে আমাদেব চলবে কি করে। কয়েকদিন পরে তাঁকে জানালাম—'আমরা তো সাত আট টাকা করে মাইনে পেয়ে থাকি।' সব শুনে তিনি আমাকে বর্দ্ধমান জেলায় এক তালুকে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক হলো যে মাহিনে ছাড়া আমি রোজ দু' আনা করে খোরাকি পাবো। দু'চাব দিনের মধ্যে সেখানকার ডাকাতদের সঙ্গে বেশ জমে গেলাম।

সাহেব। তারা কোথাকার লোক সব?

বিষ্টু। তারাও হুজুর ঐ একই জমিদারের চাকুরে। তাদের দলে ভিড়ে পর পর দুটো ডাকাতি করলাম। কিন্তু শেষে ধরা পড়ে গেলাম।

সাহেব। তোমরা তো জমিদারের কাছে ভালোই মাহিনে পেতে। তা সত্ত্বেও ডাকাতি করতে কেন?

বিষ্টু। যা মাইনে পাই তাতে আমাদের খাই-খরচাই কুলোয় না।

সাহেব। সে কি?

বিষ্টু। ভাত আমাদের রোচে না হুজুর। আমরা দুধরুটিই বেশী পছন্দ করি। মাসে আটটাকা তো এতেই খরচা হয়ে যায়। তার ওপর আমাদের ঘর সংসার আছে, আবার নেশাটা আসটাও আছে। তাই যে ভাবেই হোক বাড়তি টাকা আমাদের চাই-ই। তাছাড়া পুলিশের

হাতে কবে আর কটা ডাকাত ধরা পড়ে? ফলে বুক আমাদের বেড়ে গেছে, টাকার খাঁকতি না থাকলেও অনেক সময় আমরা ডাকাতি করি।

সাহেব। জমিদারেরা কি জানেন যে তাঁদের লাঠিয়ালরা ডাকাতি করে বেড়ায়?

বিষ্টু। তা জানেন বৈ কি! চোখের সামনেই তো তাঁরা দেখতে পান যে রোজগারের থেকে আমাদের খরচা বেশী। সব দেখে শুনে ও তাঁরা চুপচাপ থাকেন। যদি বলি সাত আট টাকা মাইনেতে আমাদের চলে না, তাঁরা সাফ বলে দ্যান—'এর বেশী মিলবে না। বাড়তি টাকাটা যেখান থেকে পারো রোজগার করো।' জমিদারের আমলারাও ঘুঘু লোক। তারাও সব কিছু জানে। নানা ফন্দি ফিকির করে তারা আমাদের কাছ থেকে টাকা খায়। বলে—'তোমাদের আর ভাবনা কি? দু'একটা গাঁ বা নৌকো লুঠ করলেই তো ভাঁড়ার ভরে উঠবে।'

সাহেব। তা জমিদাররা তোমাদের ডাকাতি করতে মানা করেন না?

বিষ্টু। কি যে বলেন, হুজুর। আমাদের কাজে বাগড়া দিলে আমরা চাকরীই ছেড়ে দেব। কিন্তু জমিদারের যে আমাদের না হলে চলবে না। দুবেলা তাঁদের হয়ে লাঠি ধরবে কে?

সাহেব। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব? অনেক লাঠিয়ালই জুটে যাবে।

বিষ্টু। কাক ঠিকই জুটবে, হুজুর। তবে আমাদের মতো লাঠিয়াল জুটবে না। জমিদাররা নিজেরা লাঠি ধরতে জানেন। তাঁরা তাই—লাঠিয়ালের কদরও বোঝেন।

সাহেব। বুঝেছি। তোমরা এক একটি পাকা শয়তান। তা তোমাদের সর্দার কে?

বিষ্টু। আমি মাণিকের কাছেই গোড়াতে কাজকম্মো শুরু করি; পরে আমি অনেকের দলেই কাজ করেছি। তবে বেশীর ভাগ জল ডাকাতিতেই আমাদের দলের সর্দার ছিলো কেষ্টচন্দর গোয়ালা (ঘোষ)।

সাহেব। সর্দাররাই তো খবরাখবর যোগাড় করে?

বিষ্টু। হ্যাঁ, হুজুর।

সাহেব। কেষ্টোচন্দর খবর পেতো কি করে?

বিষ্টু। কেষ্টো সর্দারের মাথা খুব সাফ, হুজুর।' বাহাদুরপুরের শিবু

চক্কোত্তি হলো তার চর। গোয়াড়ী ঘাটে সরকারী ট্যাক্সো আদায় করা হতো। শিবু সেখান থেকেই সব খবর জেনে নিতো।

সাহেব। কি করে?

বিষ্টু। নৌকো গেলেই টাকসো পিওন হাঁক পাড়তো—'কি যায় গো?' মাঝিমাল্লারাও উঁচু গলায় জবাব দিতো—'কাপড় গো, কাপড়।' শিবু চোখ কান-খোলা লোক। সে এভাবেই জেনে নিতো যে কোন নৌকোয় কি মাল যাচ্ছে। গোয়াড়ীতে কাঠ বেচে ফিরতি পথে থলে ভর্ত্তি টাকা কে কোন নৌকো করে নিয়ে যাচ্ছে তাও সে খবর রাখতো। আর এ সব খবর চলে আসতো সর্দারের কাছে। অবিশ্যি শিবু চক্কোত্তি খবর বেচতো খুব চড়া দরে—লুঠের মালের দুনো ভাগ তাকেই দিতে হতো।

সাহেব। হুঁ, কেষ্টো সর্দার লোক তো বেশ পাকাই দেখছি। ডাকাতির আগে তোমরাও কি কালীপূজো করতে?

বিষ্টু। মা কালীর পূজো না সেরে কোনো ডাকাতই গাঁ লুঠতে বেরোয় না। আমরা যে মা কালীর ছিচরণের দাস, তাঁর ক্রেপাতেই তো করে খাচ্ছি!

সাহেব। বটে। তোমাদের কালীপূজোর কায়দা কানুন আমি সব শুনেছি। নিজেদের মধ্যে কথা বলার ভাষা নাকি তোমরা নিজেরাই তৈরী করে নিয়েছো—

বিষ্টু। সেটা তেমন কিছু নয়, হুজুর। দুচারটে জিনিষের জন্নে আমরা আমাদের মনোমত কয়েকটা কথা ঠিক করে নিয়েছি। যেমন ধরুন হুজুর—তেলকে আমরা বলি 'রস', বন্দুককে বলি 'ভীল', কোদালকে 'কোপা', মশালকে 'ফুল্', লাঠিকে 'কোদা' ও ডাকাতকে 'রঙের মানুষ' এই রকম আর কি?

সাহেব! ঠিক্ আছে। এবার উদয়চন্দ্রপুরের ডাকাতির ঘটনাটা খুলে বলো তো।

বিষ্টু। সে হলো গিয়ে পেরায় দু'তিন বছর আগেকার কথা। আমি তখন কেশোববাবুর কাছারিতে লাঠিয়ালের কাজ করি। ভীম ঘোষ, গণেশ ঘোষ, মিনু ঘোষ—এরা সবাই সেই গাঁয়ের লোক। তারাও কাছারিতেই কাজ করতো। আমি, কুবের ঘোষ, তিনু বৈরাগী ও ভগবান একসঙ্গেই গিয়ে কেশোববাবুর কাছারিতে লাঠিয়ালের কাজে ভর্তি হই। একদিন গণেশ ঘোষ আমাদের ডেকে বলে—'লাঠিয়ালের কাজ করে

জীবনটা বরবাদ হয়ে গ্যালো। চল্ না বরং আমরা গিয়ে উদোচাঁদপুরের সদ্গোপের বাড়ীটা লুট করি।' আমরা রাজী হয়ে গেলাম।

সাহেব। সে বললো. আর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা রাজী! তোমাদের খাতির জমলো কি করে?

বিষ্টু। গণেশ, হুজুর, জানতো যে আমরা ডাকাতি করি আর দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত বলে গণেশের নাম আমাদের কারুরই অজানা ছিলো না। আর ডাকাতে ডাকাতে মিতালি হতে তো বেশী সময় লাগে না, হুজুর।

সাহেব। বেশ, তারপর।

বিষ্টু। সদ্গোপের বাড়ীর খবরটা গণেশ কি করে যোগাড় করেছিল তা আমরা জানি না। দলবল জোটাবার ভার অবিশ্যি ছিলো গণেশের ওপর। একদিন আমরা সবাই গাঁয়েরই কিনারে গণেশের বাড়ীতে গিয়ে জমায়েৎ হ'লাম। সেখানে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গ্যালো। আমি কাছারীতে ফিরে এলাম। সন্ধ্যে নাগাদ আবার দলবল নিয়ে গণেশের বাড়ীতে গেলাম। সেখান থেকে চলে গেলাম একেবারে উদোচাঁদপুরের কাছাকাছি। মাঝে অবিশ্যি রাস্তার এক দোকান থেকে দশপয়সার তেল কিনে নিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় আমরা সব বসলাম। গণেশ আর আমি চলে গেলাম বাড়ীটা বেশ ভালো করে দেখে শুনে আসতে। দোতালা মেটে বাড়ীটা, চারিদিকের ছ্যাল কিন্তু পাকা। এ বাড়ীতে তেমন কিছু মিলবে বলে আমার মনে হলো না। গণেশকে বললামও সে কথা। কিন্তু গণেশ বলে—'না, না, আমার খবর একদম পাকা। জবর কিছু পাওয়া যাবেই যাবে।' আমি ও ভাবলাম যে এতো দূর এসেছি যখন, তখন দেখাই যাক্ না কেন। খেয়াল করে দেখি যে দরজাগুলো সবই খোলা। তখন আমি চুপিসাড়ে ওপরে উঠে গেলাম। খিড়কির দরজাটা বন্ধো করে, ছেকল তুলে দিলাম।

সাহেব। এ বুদ্ধিটা করার কি দরকার ছিলো?

বিষ্টু। ডাকাতি করার সময় ঘরের মানুষ যাতে ছুটে পালিয়ে যেতে না পারে. তাই আর কি?

সাহেব। তারপর।

বিষ্টু। তারপর আমরা দলের লোকদের কাছে ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে কালীপূজো সেরে, তবে আবার সদলবলে এসে বাড়ীটাতে হানা দিই। দরজা তো খোলাই ছিলো। আমরা সব বেমালুম ঘরের ভেতরে ঢুকে

পড়লাম। ঢুকে দেখি বাড়ীতে আছে মাত্র একজন পুরুষ ও এক দঙ্গল মেয়েছেলে। বাদবাকী সকলে নাকি দল বেঁধে পাশের গাঁয়ে বিয়ের নেমন্তন খেতে গেছে। ব্যাস তখন আর আমাদের পায় কে? পুরুষ লোকটাকে ফস্ করে বেঁধে ফেলতে আর কত্তোক্ষণ? তারপর চললো লুঠতরাজ। বাধা দেবার তো কেউ নেই। তাই মনের আনন্দে দেরাজ সিন্দুক ভেঙে তছনছ করে যা পেলাম সব কিছুই হাতিয়ে নিলাম। তা দাঁও সেদিন মন্দ মেলে নি। কিন্তু ইতিমধ্যে গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছে দেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। ভেবেছিলাম যে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে একটু হাতাহাতি হবে। কিন্তু আমাদের ঝড়ের বেগে বেরুতে দেখে গাঁয়ের লোক ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। আমরা মাইলটাক দৌড়ে এসে একটা ফাঁকা মাঠে আবার জড়ো হলাম। সেখান আর এক গোলমাল। আমাদের দলের রাধানাথ বেশ কিছু গয়না ও টাকা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে। গণেশ তো রেগে কাঁই। বলে নেমকহারামটাকে যদি আর কোনোদিন দলে নিই তাহ'লে—।' তাহলে যে সে কি করবে সে সব কথা হুজুরের সামনে আমি মুখেও আনতে পারবো না।

সাহেব। হুঁ, ভক্তির মাত্রাটা একটু বেশী বলেই মনে হচ্ছে। তা সেদিন তোমার বরাতে কি জুটেছিলো?

বিষ্টু। নেহাৎ মন্দ জোটেনি হুজুর—একটা বাঁকি মল, একটা তাবিজ ও বালা, গোটা আঠার টাকা ও কয়েকখানা কাপড়।

সাহেব। আচ্ছা, গাঁয়ের লোক তো দেখছি ভীষণ ভয়তরাসে! তোমাদের মোটে বাধাই দিলো না।

বিষ্টু। হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান হয় না হুজুর। গাঁয়ে ভরপোক লোকও যেমন আছে, তেমনি মারকুটে বেপরোয়া লোকেরও কিছু কমতি নেই। কাঁচুয়ার ডাকাতি করতে গিয়ে আমরা তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

সাহেব। ঘটনাটা সব আগাগোড়া বলো দেখি।

বিষ্টু। ডাকাতিটা করি আমরা কাঁচুয়ার এক সোনার বেনের বাড়ীতে। খবরটা দিয়েছিল চৌকিদার, অক্ষয় ডোম। সোনার বেনের বাড়ীটা চৌকিদারের মহল্লার একেবারে কিনারে। তাই চৌকিদারই খবর পাঠালো সাধনপাড়ার অক্ষয় ঘোষকে—'সোনার বেনের বাড়ীতে হানা দিলে কাঁড়ি কাঁড়ি সোনাদানা ও টাকা মিলবে'। অক্ষয় ঘোষের কাছে শুনে আমি

গলাকাটা হরিশ ও গণেশকে বললাম—'তাড়াতাড়ি দলবল জুটিয়ে ফ্যালো'। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা বেলগাঁয়ের এক ফাঁকা মাঠে এসে হাজির হলাম। অস্তরপাতি সব বানিয়ে নিলাম। একটা মইও তাড়াতাড়ি তৈরী করেছিলাম।

সাহেব। মই আবার কিসের জন্যে?

বিষ্টু। সোনার বেনের যে পাকা দালান কোঠা। বাড়ীর লোকজন করে কি সোজা ছাতে ওঠে ডাকাতদের ওপর ইঁটপাটকেল ফ্যালে। তাই আগে ভাগে আমাদের কিছু লোক মই বেয়ে উঠে ছাতটা দখল করে বসে থাকে।

সাহেব। মন্দ বুদ্ধি নয়। তারপর কি হলো বলো।

বিষ্টু। বেলগাঁও থেকে আমরা চলে গেলাম একেবারে গাঁয়ের কিনারে। সেখানে কালীপূজো সেরে বেনের বাড়ীতে গিয়ে হানা দিলাম। সদর দরজা খোলাই ছিল। আমরা ঝট করে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলাম। তখন একেবারে নিশুতি রাত। বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে একেবারে কাদা। চীৎকার মীৎকারে ঘুম ভেঙে গ্যাখে যে চারদিক একেবারে আলোয় আলো। আর সামনে দাঁড়িয়ে লাঠিগাতে ডাকাতের দল। এসব দেখে শুনে তাদের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দাখিল। আমরাও তখুনি তাদের সাপটে ধরে বেঁধে ফেললাম। কিন্তু টাকার সন্ধান কেউই দিতে পারে না। আমি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারাদারি করছি। সেখান থেকে শুনতে পেলাম যে একজনকে বেধড়ক মারধোর করা হচ্ছে। আর সে বেচারা পেরাণের দায়ে কাতরাচ্ছে। বলছে 'আমাকে বিশ্বাস করো। বাড়ীতে টাকা পয়সা বলতে কিছু নেই। দালান কোঠা তুলতেই আমার যথা সব্বসো খরচা হয়ে গ্যাছে। গয়নাগাঁটি যা আছে, তা সব তোমরা নাও। আমাকে ছেড়ে দাও।' ছেড়েই দিতে হলো তাকে। এদিকে তখন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। কাতারে কাতারে গাঁয়ের লোকজন জড়ো হয়েছে। পালাবার কোনো পথই নেই। আমার চীৎকারে দলবলও নেমে এসেছে। আমি হুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে গেলাম একদিকে। গণেশ গ্যালো আর একদিকে। আমরা, হুজুর সব নাম করা লাঠিয়াল। জমিদারের হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা তো কম করিনি। তাই ভরসা ছিলো আমাদের হাতে লাঠি থাকতে কেউ কিছু করতে পারবে না। কিন্তু গাঁয়ের লোক একেবারে যেন মরিয়া হয়ে লাঠি ধরেছে। তাদের সামনে

তখন দাঁড়ায় কার সাধ্যি ? তিন চারজন সাঙ্যাৎ এব মধ্যে জখম ও হয়ে গ্যাছে। একজন তো মশালহাতে চিৎপাত হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার গা-গতর গ্যালো ঝলসে। এখন উপায় ? গোটা দলই বুঝি ধরা পড়ে যায়। গাঁয়ের লোক তাহলে আমাদের যে পিটিয়েই মেরে ফেলবে ! তখন গণেশ কবলো এক ফন্দী। আমবা সবাই এককাট্টা হয়ে 'জয় মা কালী' বলে ঝাপিয়ে পড়লাম। গাঁযেব লোক একটু হটে যেতেই সেই ফাঁকে আমরা সব মরি কি বাঁচি কবে কোনোরকমে জান নিয়ে পালিয়ে গেলাম। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে আমরা সব থামলাম। তখনই আমরা দেখলাম যে আমাদের দলের তিনজন বেশ ভারী গোছের চোট খেয়েছে। তারা গণেশের লোক। আমি গণেশকে

ডেকে নিয়ে বল্লাম—'জখমীদের একেবারেই খতম করতে হবে। তা না হলে দারোগা খুঁজে খুঁজে ঠিক এদের টেনে বার করবে। ধরা পড়ে মারের চোটে এরা সকলেরই নাম-ফাঁস করে দেবে। আমরা সবাই তখন জেলে পচে মরবো। তার চেয়ে এদের মাথাগুলো নাবিয়ে দিলেই ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।' কিন্তু গণেশ তাতে সায় দিলো না। সে জখমীদের ডেকে অবিশ্যি বললো—'ছাখ্, আমার সাফ কথা। তোরা মা কালীর নামে দিব্যি গেলে বল যে ধরা পড়লেও আমাদের নাম বলে দিবি না। না হলে

আমরা তোদের এখানে নিকেশ করে দেবো। একথা তারা তো শুনে একেবারে গণেশের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিলো। পেরাণের ভয় বড় ভয়। বলে—'সর্দ্দার, পুলিস যদি পিটিয়ে মেরেও ফ্যালে তবুও আমাদের মুখে কারুর নাম বের করতে পারবে না। আমরা মা কালীর নামে দিব্যি করে কথা দিচ্ছি, সর্দ্দার। আমাদের মিত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দাও, সর্দ্দার।' গণেশের দয়ায় তারা সে যাত্রায় বেঁচে গ্যালো।

সাহেব। তোমরা তো সাংঘাতিক লোক দেখছি। নিজেদের দলের লোককেও খুন করতে তোমাদের হাত একটু কাঁপে না।

বিষ্টু। খুন করি কি সাধে হুজুর। ঐ যে কথায় বলে না—আপনি বাঁচলে বাপের নাম! জখমীকে জ্যান্তো রেখে কে আর নিজের বিপদ ডেকে আনবে, হুজুর?

সাহেব। বুঝেছি। তারপর?

বিষ্টু। গয়নাগাঁটি যা পেয়েছিলাম, তা আমরা সবাই ভাগাভাগি করে নিলাম। কিন্তু জখমীরা কিছুই পেলো না। তারা পুলিশের খপ্পরে তো পড়বেই। কাজেই চোরাই মাল তাদের ঘরে থাকলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

সাহেব। কিন্তু তা বলে তারা গায়ে জখম নিয়ে খালি হাতে ঘরে ফিরে যাবে?

বিষ্টু। উপায় কি, হুজুর? অবিশ্যি গয়না বেচা কিছু টাকা আমরা তাদের পরে দেব বলেছিলাম। আমরা যা ভয় করেছিলাম পরে তাই হলো, হুজুর। একজন জখমী ও আরও দুজন ধরা পড়ে। তাদের নয়টী বছর ধরে ঘানি টানতে হয়েছিল। সে যাক, বড়ো আঁদুলের ডাকাতিতেও আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো। সেখানেও গাঁয়ের লোকেরা কোমর বেঁধে লড়েছিলো।

সাহেব। ঘটনাটা গোড়া থেকে বলো।

বিষ্টু। সেবারেও আমরা একটা সোনার বেনের বাড়ীতে হানা দিয়েছিলাম। সাহেবনগরে খুদী, নয়ান'রাই এই ডাকাতির খবর আনে। তারা এসে বলে—'চল আজ রাতেই কাজ হাসিল করে ফেলি। সন্ধ্যের ঝোঁকে চলে আয় সব ভোলা ডাঙার মাঠে!' আমি বলি—'অস্তর পাতি ও জিনিষপত্তর কে আনবে?' তারা জানায়—'সে সব আমাদের ওপর ছেড়ে দে। তোরা শুধু লোকজন যোগাড় করে চলে আয়।' আমি রাজী হয়ে

গেলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে গণেশ ঘোষের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। গণেশও রাজী হলো। তার তো দু'চারদিন অন্তর অন্তর ডাকাতি না করলে ঘুমই হয় না। সন্ধ্যে নাগাদ আমরা দলবল নিয়ে ভোলা ডাঙার মাঠে জমায়েৎ হলাম। নয়ান-খুদীর দলও হাজির। সত্যিই দেখি যে যা কিছু দরকার সবই তারা বেশ গুছিয়ে এনেছে। তবে আর দেরী কিসের? নদী পার হতে হবে, যেতে হবে অনেক দূর! কিন্তু নদী পার হতে গিয়েই এক ঝামেলা হলো! কি করে জানি না আমাদের তেলের ভাড়টী টুপ করে জলে পড়ে গ্যালো। ব্যাস্ ডাকাতি করার আশাতেই ছাই পড়লো!

সাহেব। কেন?

বিষ্টু। আঁধারের মধ্যে পথভাঙা আমাদের অভ্যেস আছে ঠিকই। কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছুই যে নজরে আসে না। কাজেই মশাল না হলে আমরা একেবারে রাত কাণা।

সাহেব। তাহলে কি করলে? ফিরে গেলে?

বিষ্টু। সেই তো হলো সমিস্যে। আমরা সব মুখ হাঁড়ি করে একটা গাছতলায় বসলাম। কি করা যায়? কেউ বললে যে পথে ঘাটে একটা কলুর দোকান ঘর ভেঙে তেল নিয়ে নিলেই তো হয়। কিন্তু সেটা কোনো কাজের কথা নয়। তাতে করে গোলমাল হবে এবং আশেপাশের লোকজনও জেগে উঠতে পারে। তখন আমি বললাম—'ঘাটে তো অনেক নৌকো বাঁধা রয়েছে। দেখি না গিয়ে কিছু তেল মেলে কি না?' নয়ান আমি ও আরও দু'একজন গিয়ে একটা নৌকোর ওপর উঠলাম। সেটা দেখি কাপড়ের গাঁটরিতে একেবারে বোঝাই। খোঁজাখুঁজি করে তেলও খানিকটা পেয়ে গেলাম। একটু কষ্ট করলেই, হুজুর কেষ্টো মেলে।

সাহেব। বটেই তো। তবে এখন কেষ্টোর কথা থাক, বিষ্টুর কথাই শুনি। শুধু তেল নিয়েই কি তোমরা নেমে এলে?

বিষ্টু। তা কি হয় হুজুর। হাতের কাছে পরের দ্রব্যো পেয়ে ছেড়ে দিলে যে আমাদের অকল্যেণ হবে! তিনচার গাঁটরি কাপড়ও তুলে আনলাম।

বিষ্টু। সেগুলির কি গতি করলে?

সাহেব। নদীর ধারে আর অসুবিধে কি, হুজুর। গত্তো খুঁড়ে সেগুলোকে কবর দিলাম।

সাহেব। সেটা বোধ হয় দলের লোকের অজান্তে? তারপর?

বিষ্টু। হুজুর, ঠিকই ধরেছেন। তেল পাওয়া গেছে শুনে দলের লোকজন খুব খুসী। আমরা তখন ভালোমানুষ সেজে বললাম—'বেরিয়েই একটা বাধা পেলাম। তাই আজ আর কাজ-টাজে হাত না দেওয়াই ভালো।' আমাদের কাজে অনিচ্ছা তো হবেই।

সাহেব। কেন?

বিষ্টু। তিন-চার গাঁটরি কাপড় তো আমরা আগেভাগেই হাতিয়েছি। তার দাম তো কম হবে না, হুজুর। ভরা পেটে কে আর কষ্ট করে খেতে চায়?

সাহেব। বুঝলাম। সেদিন কি তাহলে কাজ বন্ধ রইলো?

বিষ্টু। না, হুজুর। দলের আর সবাই অমন রুকো-শুকো ঘরে ফিরবে কেন? বলে এই নিয়ে চারবার নাকি তারা এই বাড়িটা লুট করার জন্যে বেরিয়েছে। কিন্তু আখেরে সব পণ্ড হয়েছে। এবারে হয় ওস্‌পার না হয় এস্‌পার করে তবে তারা ছাড়বে। বুঝলাম এদের পিতিজ্ঞে টলবে না। তাই হাসিমুখেই আমরা মত দিলাম। বেশী কথা কাটাকাটি করা তো ভালো নয়।

সাহেব। কেন?

বিষ্টু। ডাকাতের মন তো, হুজুর। 'কু' ভাব জাগতে আর কতোক্ষণ? ব্যাটারা ঠিক আন্দাজ করে নেবে যে আমরা নৌকাতে উঠে একটা মোটা গোছের দাঁও মেরেছি।

সাহেব। ঠিক! তারপর।

বিষ্টু। তারপর আমরা কালীপুজোয় বসে গেলাম। পূজো সেরে রৈ রৈ করে আমরা বাড়ীটার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। মেটে বাড়ী, চারদিকে মাটির দ্যাল। সদরের দিকের দ্যালে দেখি একটা বেশ বড় গোছের গত্তো। একজন গত্তের ভেতর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর দিলো সদর দরজা খুলে। আমি দু' চারজনকে নিয়ে বাইরে পাহারাদারির কাজে রইলাম। বাড়ীর কত্তা এক ফাঁকে কখন যে সুড়ুৎ করে বেড়িয়ে গেছে, তা কেউউ আমরা খেয়াল করিনি। ভয়ের কথা? তাড়াতাড়ি কাজ ফতে করে বেরিয়ে পড়তে হবে। বাড়ীর কত্তা নির্ঘাৎ পাড়ার লোকজনকে ডেকে তুলে ঝামেলা বাঁধাবে। অবিশ্যি একজন মেয়েছেলে বাড়ীতে ছিলো। ভেতর থেকে দলবল তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমাদের কাজে এসে হাজির। আমি বল্লাম—'খবরদার। মেয়েছেলের

গায়ে হাত তুলবি না। উচ্ছন্নে যাবি সব তাহলে। তোরা জানিস যে জাত ডাকাত কখনও মেয়েদের মারধোর করে না।' মেয়েছেলেটিরও, হুজুর, সাহস আছে বলতে হয়। চোখ দিয়ে তখন যেন তার আগুন ছুটছে।

আর দাপট কি? বলে কি না—'কে গায়ে হাত দেবে, এগিয়ে আসুক না দেখি কতবড়ো বুকের পাটা।' শেষে বাক্সো-প্যাটরা সব কিছু ভেঙে তছনছ করে পাওয়া গ্যালো সব্বোসাকুল্লে তিনশো টাকা ও একশো আশি টাকার মতো দামের গয়নাগাটি। এদিকে তখন গাঁয়েব লোকেরা সব জড়ো হয়ে উৎপাত শুরু করেছে। আমার হাঁকে সাড়া দিয়ে দলের সকলেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গাঁয়ের লোকেরা খানিকটা চেষ্টা করলো আমাদের রোখবার। কিন্তু শুধু গায়ের জোরে পাকাপোক্ত লাঠিয়ালদের ঠেকানো যায় না। আমরা সহজেই পথ করে নিয়ে ভোঁ দৌড় দিলাম। একেবারে বীরপুর গিয়ে সব থামলাম। সবাই এসেছে, কিন্তু দু' জনের কোনো পাত্তা নেই। কানাঘুষা আগেই শুনেছি যে এ দু'জন টাকা পয়সা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এখন বোঝা গ্যালো যে কথাটা ঠিকই। আমরা তো রেগে মেগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। লোক দুটি নয়ান সর্দারের। চোখ লাল করে বললাম—'সর্দার, এ সব কি? জানো, এককোপে তোমার মাথাটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিতে পারি।' এদিকে গণেশ সর্দার তার দলবল নিয়ে

এসেছে আমারই কথাব ওপর ভরসা করে। সেই বা নিজের ও তার দলের পাওনা গণ্ডা ছাড়বে কেন? বলুন তো হুজুব, এ রকম আতান্তরে পড়লে কার বা মাথার ঠিক থাকে? দল জোটাও বে, তেল চুবি করো রে, পাহারা দাও বে—এত্তো সব, ঝুট-ঝামেলা করাব পব কপালে কি না ফক্কা! অবিশ্যি মালামাল কিছু আমাদেব সঙ্গেই ছিলো। নয়ান সর্দারকে আবার দাবড়ি দিলাম—'মালামাল যা কিছু আছে সব আমাদের। নেমকহারাম ডাকাতদেব সর্দাব তুমি। মালেব ভাগ তোমায় ছাডতে হবে। যদি রাজি না থাকো, তবে জানেব মাযা ছাডো।' বলেই অস্তব বাগিয়ে ধবলাম।

নয়ান বলে—'আরে করবো কি? বেমক্কা মাথা গরম করছো কেন, দোস্ত? মালামাল যা আছে নিয়ে ঠাণ্ডা হও।'

সাহেব। নয়ান সর্দার রাজী না হলে সত্যিই তাকে খুন করতে নাকি?

বিষ্টু। তা বলা যায় ন হুজুর! লোকে বলে—রাগ চাণ্ডাল। রাগের মাথায় হয়তো অস্তর চালিয়েই দিতাম।

সাহেব। একটী ঘোর শয়তান তুমি। তা জিনিসপত্তর কোথায় বেচলে?

বিষ্টু। মালামাল মকিম রায়ের কাছে বেচে পেলাম একশো দশ টাকা। নয়ান পরের দিন আমার বাড়ী এলো। দলবল নিয়ে কবর খুঁড়ে কাপড়ের সেই গাঁটরীগুলো তুলে ফেললাম। আবার গেলাম মকিম রায়ের কাছে। কাপড় বেচে পেয়েছিলাম একশো তেরো টাকা। এর ভাগ নয়ান সর্দারকে অবিশ্যি দিয়েছিলাম।

সাহেব। তোমার দেখছি দয়ার শরীর। হাতরা থানায় চিনিবাস বিশ্বাসের বাড়ীতে ডাকাতিটা তোমরাই করেছিলে না। খুলে বলো তো, ঘটনাটা।

বিষ্টু। 'জয় হোক মা ঠাকরোন'।

সাহেব। এখানে আবার মা ঠাকরোন কোথায় পেলে?

বিষ্টু। কালীচরণ, হুজুরতো জানেনই, আগে আমাদের সঙ্গে কাজ-কাম করতো। বেশ জাত-ডাকাত ছিলো সে। তারপর একদিন হঠাৎ ডাকাতি করা ছেড়ে দিলো। ব্যাপার কি? বলে—'ওসব চাষাড়ে কাজে আর আমি নেই। এখন আমি সুক্ষ্ম কাজ ধরেছি। খবরের বেচা-কেনার কারবার খুলেছি। এতে যা পাই তাতেই আমার বেশ চলে যায়।' কালীচরণ, 'জয় হোক মা ঠাকরোণ' বলেই লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষে-সিক্ষে করতো। গাঁয়ে বাজারে লোকে জানতো যে কালীচরণের এখন ধম্মে মতি হয়েছে। চিনিবাসের বাড়ীর মেয়েরা কালীকে আসতে দেখে বলে—'এসো বাবা কালী। খবর সব ভালো তো।' কালী জবাব ছায়—'আপনাদের ছিচরণের আশীব্বাদে একরকম করে চলে যাচ্ছে। আপনারা ভালো আছেন, মা ঠাকরোন? এবারে ধান কেমন হলো?' মেয়েরা বলে—'ভগবানের ক্রেপায় সব ভালোই। ভালোয় ভালোয় ধানও গোলায় উঠেছে।' কালী এক নজরে দেখে নিলো যে গোরুর গাড়ী ভর্তি করে ব্যাপারীরা ধান গোলা থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। তার আর বুঝতে বাকী রইলো না যে চিনিবাস গোলা খালি করে বাক্সো ভর্তি করছে। এই খবরটাই সে টুক করে আমাকে পাচার করে দিলো। আমিও কথা দিলাম যে কাজটা করে ফেলবো। কিন্তু কেন জানি না, কাজটা করে উঠতে পারলাম না। দু'চার দিন পরে আবার বেলপুকুরের মহেশ ডাকাত কালীর কাছ থেকে খবর নিয়ে এলো—'টাকা কি মানুষের ঘরে বেশীদিন থাকে! তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফ্যালো।' তাই শুনে আমি মহেশকে বল্লাম—'যা থাকে কপালে, আজই আমরা বেরোবো। গাঁটা এমন কিছু বড় নয়। বেশী লোকজনের তাই

প্রয়োজন নেই। দরকারী জিনিষপত্তর সব যোগাড়-যন্তর করে তুই আজ রাতে বেলপুকুরের মাঠে এসে যাবি। সেখানেই দেখা হবে।' ঠিক সময়েই আমরা মাঠে এসে জড়ো হ'লাম। মহেশের সঙ্গে তিন-চারজন লোকও ছিলো। কালীচরণও এসে হাজির। বলে কিনা ধান-বেচা শতিনেক টাকা তো পাওয়া যাবেই। একফাঁকে কালীচরণ আমাকে বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গ্যালো। আমি ফিরে এলাম। তারপর কালীপুজো করে আমরা একদৌড়ে গিয়ে বাড়ীটাতে হানা দিলাম। বাড়ীটার শুধু একদিকে দ্বাল। কায়দা-মাফিক পাহারা মোতায়েন করা হলো, মশাল জ্বলে উঠলো, দরজাও ভাঙা হলো। কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি—সব ভোঁ ভাঁ, জনমনিষ্যি নেই। ডাকাতের গন্ধ পেয়ে যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে। ঘরদোর, বাক্সো-প্যাঁটরা আমরা সব তছনচ্ করে ফেল্লাম। কিন্তু নগদ টাকার কোনো হদিস নেই। দু'চারটে খুচরো দব্বো যা পেলাম, তাই নিয়েই ফিরে গেলাম।

সাহেব। জলডাকাতির ঘটনা কিন্তু একটাও বললে না। উদয়চন্দ্রপুরের জলডাকাতিটা তো তোমরাই করেছিলে।

বিষ্টু। আজ্ঞে, হুজুর। সেটা আমাদেরই কিত্তি। আমি তখন গাঁয়ের এক কাছারিতে লাঠিয়ালের কাজ করি। একদিন কি কাজে যেন নাকাসী পাড়ায় সদর কাছারিতে গিয়েছিলাম। ফিরে মায়াকুল যাচ্ছিলাম। পথে সোনাই সর্দারের সঙ্গে দেখা। বলে—'আরে সর্দার, অতো হন্তোদন্ত হয়ে চলেছো কোথা? একটা কাজের খবর আছে।' থামতে হলো। সোনাই সর্দারের সঙ্গে গেলাম মনোহরের বাড়ী। সেখানে গিয়ে দেখি যে তারা সব ব্যবস্থাই সেরে রেখেছে। কালই তারা বেরোবে একটা ঘর ডাকাতি করতে। হাতে যা খবর আছে তা শুনে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। সেখানেই থেকে গেলাম। পরের দিন সকালে খুব ভোরে ভোরে আমরা হাঁটা দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে উদোচাঁদপুরের আড়পারের বাজারে এসে থামলাম। পেটে তখন রাবণের চিতে জ্বলছে। সেখানেই খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় একটা নৌকো এসে ঘাটে বাঁধলো। নৌকোটা কাপড়ের গাঁটরিতে ভর্তি। ব্যাস্, আমাদের মতলবটা গ্যালো উল্টে। ঘর-ডাকাতি পরে হবে। কিন্তু হাতের কাছে এমন দাঁও তো আর হট্ বলতে মিলবে না। ঠিক হলো যে নৌকোটাই আমরা রেতে লুঠ করবো। তাহলে তো নৌকোটার ওপর নজর রাখতে হয়। নৌকোটা আবার ঘাট ছেড়ে এগিয়ে চলেছে।

আমাদেরই একজন সাথীর ওপর হুকুম হলো—'এটার পিছে লেগে থাকো।' কিছু পরে সে এসে জানালো যে নৌকোটা পেরায় আধ মাইল পুবে একটা খালের মুখে নোঙর ফেলেছে। দিনে আমরা বাজারেই রয়ে গেলাম। কিন্তু রেতের বেলায় একটা গোটা দলকে বাজারে দেখলে লোকে সন্দেহ করতে পারে। তাই আমরা নদীর ধারে চলে গেলাম। সেখানে বসেই আমরা সুখ দুঃখ্খুর গপ্পো করে সময় কাটিয়ে দিলাম। তারপর গভীর রেতে আমরা নৌকোটার ওপর চড়াও হলাম।

সাহেব। কিন্তু তোমর অস্তর-পাতি কোথায় পেলে?

বিষ্টু। মাপ করবেন, হুজুর। সে কথা বলতে ভুলেই গেছি। আমরা যে মাঠে জমায়েত হয়েছিলাম, তার পাশেই দেখি একটা বাংলো তৈরী হচ্ছে। সেই বাংলোর ছাত থেকে আমরা বাঁশ নামিয়ে আনি ও অস্তর-পাতি বানিয়ে নিই।

সাহেব। বেশ, তারপর!

বিষ্টু। নৌকোর ওপর চড়াও হবার মুখে মাঝি মাল্লারা আমাদের বাধা অবিশ্যি দিয়েছিলো। সে নেহাত মামুলি ব্যাপার। আমাদের বেপরোয়া লাঠির ঘায়ে তারা নাজেহাল হয়ে শেষে জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। আমরা তখন মনের সুখে লুটপাট আরম্ভ করে দিই। কিন্তু মাঝি মাল্লারা এই ফাঁকে বাজারে গিয়ে লোকজনকে ডেকে তোলে। তাকিয়ে দেখি যে ঘাটে তখন লোকজন গিজ্‌গিজ্‌ করছে। লুঠের মালামাল নিয়ে এখন নাবি কোথায়? ঘাট তো বাজারের লোকদের দখলে। নিরুপায় হয়ে আমরা নৌকোর কাছি খুলে দিলাম। নৌকো তখন চললো উল্টো পারের দিকে। কিন্তু সেখানে গিয়েই বা আমরা করবো কি? অচেনা অজানা জায়গায় কার ঘরেই বা আমরা মালামাল নিয়ে উঠবো? তাই খানিকটা গিয়ে আবার এপারের দিকে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। এদিকে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, অন্ধকারও ফিকে হয়ে এসেছে। দিনের আলোয় বিপদ ঘটতে পারে। রাতভোর হালদাঁড় টেনে আমরাও হাক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই কাছে পিঠে একটা জায়গায় এসে আমরা নৌকা ভেড়ালাম। সেখানে প্রায় এক কোমর জল। কিন্তু আর তো লুঠের নৌকো নিয়ে এগোনো যায় না। মালামাল মাথায় করে আমরা নেবে পড়লাম। মালও তো কম নয়, হুজুর। কাপড়ের গাঁটরি ছাড়াও আমরা দুশো কি তিনশো ছাতাও হাতিয়েছিলাম। আবার দিনের বেলায়

মাথায় মোট নিয়ে হাঁটতে দেখলে গাঁয়ের লোকেরাও আমাদের অমনি ছেড়ে দেবে না। তা ভাগ্যি ভালো বলতে হবে। সেই গাঁয়ে মনোহরের এক দোস্তের বাড়ী। সেখানেই আমাদের মালামাল জমা করে দিয়ে বাঁচলাম।

সাহেব। সে লোকটা লুঠের মাল রাখতে রাজী হলো?

বিষ্টু। সেও তো এই কারবারই করে। সাধুসন্তদের সঙ্গে তো আর ডাকাতদের দোস্তি হয় না, হুজুর।

সাহেব। হুঁ। পরে মালামাল বেচে বেশ মোটা টাকা পেয়েছিলে তো?

বিষ্টু। পরের দিন আমরা দিনু নোলুয়ার কাছে মালামাল নিয়ে যাই। দীনু সব দেখে শুনে দু'শো টাকা দিতে রাজীও হয়েছিলো। কিন্তু যদ্দুর জানি, আমরা কুল্লে একশো টাকাই পেয়েছিলাম।

সাহেব। সে কি! গাঁট গাঁট কাপড় ও দুশো-তিনশো ছাতার বদলে মাত্র একশো টাকা।

বিষ্টু। কি আর করা যাবে, হুজুর! চোরাই মালের কারবারীরা একেবারে রক্তচোষার জাত। আমরা খেটে খুটে রক্ত জল করে, কতো ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, মালামাল ঘরে আনি। আর ওরা ঘরে বসে জলের দরে সে সব কেনে। কিন্তু ওদের বাদ দিয়ে আমাদেরও যে কাজ কারবার চলে না। লুঠের মাল মাথায় করে হাটে গেলে আমাদের কি আর রক্ষে থাকবে?—

সাহেব। বুঝলাম। এবার এদরাকপুরের ঘটনাটা বলো। তোমরাই তো ওডাকাতিটা করেছিলে?

বিষ্টু। আজ্ঞে, হ্যাঁ, হুজুর। সে আজ পেরায় পাঁচ-ছ বছর আগেকার কথা। আমি তখন মায়াকুলে, আর মানিক থাকে মাহুতপুরে। একদিন মানিক বলে পাঠালো—'অমুক দিন ত্রিশগঞ্জের বাজারে চলে আয়।' গেলাম চলে বাজারে। দুপুরবেলা বেশ করে পেট ঠুকে খেয়েও নিলাম। বিকেলের দিকে আমরা নদীর পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। ভালোগোছের একটা নৌকোর খবর চাই তো! মায়াকুল থেকে এতোটা পথ ভেঙে ত্রিশগঞ্জে এসেছি কি স্রেফ পেটপুরে খাবার জন্যে! তাই খবরের ধান্দায় চলে গেলাম একেবারে মির্জেপুর খালের ধারে। কিন্তু তেমন কিছুই নজরে পড়লো না। মনটা একটু দমে গ্যালো ঠিকই। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে আমাদের দিন চলবে কি করে? তাই আমরা গঙ্গার ওপারে গিয়ে হাজির

হ'লাম—দেখি ওদিকে কিছু মেলে কি না। দলবেঁধে ঘুরে বেড়ালে লোক-জন সন্দেহ করতে পারে। কাজেই দু'-তিনজনের ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে নদীর কিনার ধরে এগিয়ে চল্লাম। চলছি তো চলছি, কিছুই ছাই নজরে পড়ে না। এমন সময় ভগবান বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। একটি নৌকো দেখে মনে হলো যে ভেতরে মালামাল বেশী কিছু আছে। অমনি আমরা নৌকোটার ওপর চড়াও হ'লাম। কিন্তু ও হরি, এর ভেতরে যে কেবল চামড়া আর চামড়া।

সাহেব। তাতে কি হলো? চামড়ার তো বেশ দাম আছে।

বিষ্টু। তা আছে, হুজুর। তবে গাঁ-ঘরে চামড়া কিনবে কে? আর চামড়া ঘরে নিয়ে বসে থাকলে যে নিজের চামড়াই বাঁচানো যাবে না।

সাহেব। বেশ, বুঝলাম। তাহলে ভগবান তোমাদের অবস্থা দেখে খুব একচোট হেসে নিলেন—তাই নয়?

বিষ্টু। তা বটে, হুজুর। কিন্তু আমাদেরও তখন জেদ চেপে গেছে। এ কি অনাছিষ্টি কাণ্ড! একটা ভালামতো নৌকোও কি আজ বরাতে জুটবে না। দেখাই যাক্। চলে গেলাম একেবারে সেই নবদ্বীপের কাছ

বরাবর। সেখানে দেখে শুনে একটা সওয়ারী নৌকোতে হানা দিলাম। মাঝি মাল্লারা যে যেদিকে পারলো চোঁ চাঁ দৌড় দিলো। কিন্তু এবারেও

বরাতে ঢু ঢু। গোটা নৌকো হাতড়ে দু'চারটে খুচরো জিনিস ছাড়া কিছুই পেলাম না। মনের দুঃখে নৌকো ছেড়ে নেমে এলাম। আবার সেই পথচলা। হঠাৎ যেন চারদিক আলোয় ঝলসে উঠলো। ফিরে দেখি যে নৌকোটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সাহেব। সে কি? তোমরা কি রাগে দুঃখে নৌকোটায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলে নাকি?

বিষ্টু। না, হুজুর। ওসব অপোকম্ম আমরা করি না।

সাহেব। না, তোমরা একেবারে সাধু-সন্ত প্রকৃতির লোক। সে যাক্, তারপর?

বিষ্টু। আমরা একটু দমেই গেলাম। অনেকেই বললো—'যেতে দাও সর্দার। আজ দিনটাই খারাপ। বরং ফিরেই চলি সব।' কিন্তু এত মেহন্নত করে শেষে খালি হাতে ফিরে যাবো? না। দেখিই না আর একবার চেষ্টা করে। কথায় বলে না—বার বার, তিনবার। এদ্‌রাকপুরে একটা নৌকো দেখে আমাদের মন আহ্লাদে নেচে উঠলো। এবার জবর কিছু মিলবেই। 'জয় মা কালী' বলে আমরা সবাই নৌকোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিন্তু হঠাৎ এক হুঙ্কার শুনে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে এক পশ্চিমা বরকন্দাজ নৌকোর লোকজন নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। তা বরকন্দাজ সাহেবের হিম্মৎ আছে বলতে হবে। একেবারে যাকে বলে সেই জান কবুল করে লড়ে গ্যালো। কিন্তু একা আর কতক্ষণ আমাদের ঠেকিয়ে রাখবে?

সাহেব। একা কেন? নৌকোর লোকজনও তো ছিল।

বিষ্টু। তা গোড়াতে তারা অবিশ্যি ছিলো, হুজুর। কিন্তু দু'একটা লাঠির বাড়ি খেয়ে যে যার পেরাণ নিয়ে পালিয়ে গ্যালো। শেষে বরকন্দাজসাহেবও বুঝলেন যে খামাকা লড়ে আর লাভ নেই। তখন তিনিও রণে ভঙ্গ দিলেন। ব্যস্, তখন আমরা মনের সুখে লুঠ-তরাজ আরম্ভ করে দিলাম। অনেক রকমের দব্বো-সামিগ্রি আমরা সেদিন পেয়েছিলাম। এক দাড়ি কামাবার খুরই পেয়েছিলাম তিন-চার প্যাটরা। কিন্তু এদিকে তখন বেশী দেরী হয়ে গ্যাছে—ভোরের আলো ফুটলো বলে। বাক্সো-প্যাটরা নিয়ে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে গেলে ঝামেলা হতে পারে। তাই মানিক সর্দার ও আমি এক ফন্দী করলাম। দলের একটা লোককে কুলি সাজালাম। সে বেচারা আমাদের ভাগের মাল মাথায় নিয়ে চললো। আর আমরা

বাবুর মতো তার পিছু নিলাম। এই ধাপ্পায় গাঁয়ের লোকজন ভুললো বটে। কিন্তু চেরো ঘোষকে বোকা বানাবো কি করে? সাপের হাঁচি বেদে তো বুঝবেই।

সাহেব। চেরো ঘোষও তো একজন মার্কা-মারা ডাকাত। তার বাড়ী বামুনপুকুরে নয়?

বিষ্টু। তবে আর বলছি, কি হুজুর! আমরা যখন বামুনপুকুরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, তখন চেরো ব্যাটা দূর থেকে আমাদের নিশ্চয়ই দেখেছে।

সাহেব। তাতে হলো টা কি? চেরো তো তোমাদের দলেরই লোক।

বিষ্টু। কিন্তু ওই অঞ্চলটাই যে চেরোর এলাকা। ওরই এলাকার মধ্যে আমরা ডাকাতি করে, ওরই গাঁয়ের ওপর দিয়ে মালামাল নিয়ে পগার পার হবো—এতটা অপমান কে সহ্য করবে, বলুন, হুজুর?

সাহেব। বটেই তো! এলাকা দেখছি এখন তোমাদেরই দখলে। তা, তোমরা কি অন্যের এলাকায় হানা দাও না?

বিষ্টু। দিই হুজুর। কিন্তু সে এলাকার সর্দারকে তখন আমরা দলে সামিল করে নিই। এবার তা করবার আর ফুরসুত পেলাম কই? তাছাড়া আমরা এদরাকপুরে জলডাকাতি করবো বলে তো আর পিতিজ্ঞে করে বেরুই নি।

সাহেব। তা চেরো ঘোষ কি অপমানটা হজম করে গ্যালো?

বিষ্টু। চেরো ব্যাটা সে পাত্তরই নয়। আমাদের একেবারে সব্বোনাশ করে ছাড়লে। তার মুখে খবর পেয়ে গাঁয়ের লোক দলে দলে দৌড়ে এসে আমাদের ঘিরে ফ্যালে আর কি?

সাহেব। তোমরা তো দুজনই পাকা লাঠিয়াল। তোমাদের আর ভয় কি?

বিষ্টু। কি যে বলেন, হুজুর? আমরা পাকা লাঠিয়াল ঠিকই। কোমর বেঁধে মাণিকসর্দার ও আমি লাঠি ধরলে দশবিশজনের মওড়া তো নিতেই পারি। কিন্তু একটা গোটা গাঁয়ের লোককে ঠেকাবো কি করে? তাছাড়া গাঁয়ের সব লোকজনও কিছু অকম্মা নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ পাকা হাতে লাঠি ধরতে পারে।

সাহেব। শেষ পর্যন্ত কি করলে তোমরা?

বিষ্টু। প্রথম চোটে একটু আধটু চেষ্টা যে করিনি তা নয়। সাহবে

ভর করে মানিকসর্দার ও আমি লাঠি হাতে তেড়ে গেলাম। কিন্তু গাঁয়ের লোক তাতে বিশেষ ঘাবড়ালো না মনে হলো চেরো ব্যাটা পেছন থেকে তাদের সাহস যোগাচ্ছে। কাজেই ভাবলাম যে দেরী করলে আর মাথা বাঁচানো যাবে না। তাই মালামাল সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলাম।

সাহেব। কেন? মালামাল নিয়ে পালাতে পারলে না বুঝি?

বিষ্টু। আর মালামাল! তখন বাপ-পিতেমোহের পেরাণটা নিয়ে পালানোই এক সমিস্তে। তা গাঁয়ের লোকজন আমাদের পালাতেই বা দেবে ক্যানো? তারা আমাদের তখন তো একেবারে ঘিরেই ফেলেছে। হাতে পেলে আমাদের একদম হাড় গুঁড়ো করে ফেলবে না। তাই দিলাম মালামাল সব ছড়িয়ে। যা আন্দাজ করেছিলুম তাই হলো। গাঁয়ের লোকজন সব মাল দেখ্‌তে মেতে গ্যালো—এ রকম সব পদাথ্থ অনেকে বোধ হয় চোকেই দেখে নি। সে ফাঁকে আমরা দে দৌড়, দে দৌড়।

সাহেব। গাঁয়ের লোকজন নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিয়েছিলো।

বিষ্টু। তা কি হ্যায়, হুজুর! চোরাই মালও ঘরে তুলবে, আবার পুলিশে খবর দেবে? চেরো ব্যাটাই এ সব বুদ্ধি তাদের যুগিয়েছিলো।

সাহেব বেশ। সব শুনলাম্। এখন তুমি হাজতে যাও। পরে তোমার কথা ভেবে দেখ্‌বো।

বিষ্টু। মানিকসর্দারের মত আমাকেও গোয়েন্দা করে রাখুন, হুজুর। আমি হুজুরের কেনা গোলাম হয়ে থাক্‌বো।

সাহেব। বুঝেছি এখন যাও। ওসব কথা পরে হবে।

সনাতন সর্দার

এবার রংপুর জেলার পচাগড় থানার একজন নাম-করা ডাকাতের গল্প শোনো। রংপুর এখন বাংলাদেশের একটি জেলা। কিন্তু আমি অনেক কাল আগেকার কথা বলছি। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে সনাতন রায় নামে একজন ডাকাতের দাপটে—রংপুর জেলার পচাগড় থানার লক্ষ্মীমন্ত লোকেরা ভয়ে রাতে ঘুমোতে পারতো না। সনাতনের কথা পরে। আগে আমরা একশ বছর আগেকার রংপুর জেলার সঙ্গে মোটামুটি একটু পরিচয় করে নিই। জলপাইগুড়ি জেলা ও কুচবিহার রাজ্যের (এখন জেলার) কোলেই হলো রংপুর। কিন্তু জেলাটির নাম রংপুর হলো কেন! সেখানকার লোকজনেরা কি বিশেষ ভাবে রঙ্গপ্রিয়? রঙ-তামাসার জন্যে রংপুরের তেমন কোনো খ্যাতি আছে বলে তো শুনিনি। তখনকার দিনে রংপুরের পাটের ব্যবসায়ীরা পাটে রঙ চড়াতেও জানতো। এই রঙের কারবারের বাড়বাড়ন্ত যখন হলো, তখন গোটা জেলাটার নামই হয়ে গেল রংপুর। তাহলে কি রংপুরের রঙ পাটের রঙ, মনের রঙ (রঙ্গ) নয়? কে জানে। রংপুরের জমিতে অবশ্যি তখন পাট ফলতো প্রচুর। এক পাটের দৌলতেই অনেকের ভাগ্য ফিরে গেছে। ধান ও সরষের ফলনও ছিল ভালো। আর তামাকের চাষ হতো জেলার অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তখনকার দিনের বিশাল বাংলাদেশে যতটা জমিতে তামাকের চাষ হতো, তার অর্দ্ধেক জমিই হলো রংপুর জেলার। বহুবছর ধরে তামাকের চাষ করেই রংপুরের লোকেরা খেয়ে পরে দিন কাটিয়েছে। সব রকম তামাকের চাষের জন্যেই রংপুরের নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছিলো দেশে ও বিদেশে। 'হাভানা চুরুটের নাম, তোমরা বোধহয় অনেকেই শুনেছো। রংপুরের একজন জমিদার নাকি ভালো জাতের 'হাভানা তামাক' পাতা 'প্যারিসের এক প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে একটি 'মেডেল জিতে এনেছিলেন। সে হলো ঠিক একশো দশ বছর আগেকার কথা।

নদী নালার দেশ রংপুর। তার মধ্যে 'করতোয়া নদীর নাম তোমরা হয়তো শুনেছো। এক আধটা নদী মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে দেশ ভাসিয়ে দিতো। কিন্তু তাতে করে হরহামেশাই দেশ জুড়ে হাহাকার

উঠতো না। তাছাড়া জেলার মধ্যে ডাঙ্গা জমি ও নাবাল জমি দুইই ছিলো। নাবাল জমি যেবার জলে ডুবে যেতো, ডাঙ্গা জমিতে সেবার সোনা ফলতো। পাকা রাস্তা বলতে বড় একটা কিছু ছিলো না। বর্ষাকালে তাই পথ চলা ভার হতো। জলপথের ওপরেই লোকজনের ভরসা ছিলো বেশী। ব্যবসার মালামালও জলপথেই আসতো ও যেতো। বসতিও তেমন কিছু ঘন ছিলো না। লোকালয়গুলিকে ঘিরে থাকতো গভীর বনজঙ্গল। তাছাড়া নারকেলগাছ ও বাঁশের ঝাড় যে কতো ছিল সে দেশে তার কোনো লেখা-জোখা নেই। সে কথা যাক। রংপুরের বনে জঙ্গলে বুনো মোষ তো ছিলোই। বরাতে থাকলে বাঘ এমনকি বুনো হাতীরও দেখা মিলতো। এমনি এক ঘোর জঙ্গলেই ছিল সনাতনের ঘাঁটি। জঙ্গলের নাম 'ভেতরগড়'। নামটার মধ্যে সেকালের রাজা-রাজড়ার একটু গন্ধ পাচ্ছো তোমরা, নয় কি? আর 'ভেতরগড়' এর যখন খোঁজ মিলেছে তখন 'বাহিরগড়' বলেও কিছু ছিলো, ঠিকই। কিন্তু সে সব খুঁটি-নাটি খবর আমার হাতে নেই। কবে কোন রাজার আমলে 'ভেতরগড়' ও 'বাহিরগড়' গড়ে উঠেছিলো তা ঠিক জানিনা। তারপর কেমন করে একদিন তার রাজ্যপাট চলে গেল, 'ভেতরগড়' বনে জঙ্গলে ভরে উঠলো—এ সব কথাও আমার জানা নেই। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে গড় কবেই ভেঙেচুরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। শুধু 'ভেতরগড়' ও 'বাহির গড়' নাম দুটোই এখনও বেঁচে আছে।

সনাতনের পদবী ছিলো 'রায়'। কিন্তু আসলে সে জাতে কি ছিলো—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, না কায়স্থ? এ কথার সঠিক জবাব দেবার মতো কাউকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা সে না যাক, তাতে আমাদের বড় একটা কিছু ক্ষতি নেই। আজকাল জাতগোত্তর নিয়ে কে আর মাথা ঘামাচ্ছে! আর ডাকাতের জাতের কথা জেনে আমাদের হবেই বা কি? সনাতনের আবার কিছুটা জোতজমাও ছিলো। নিজের হাতেই সে চাষ আবাদ করতো। বিয়ে-থা করে সে ঘর-সংসার পেতেছিলো—এমন কথা কেউ বলে না। সে ছিলো একলা মানুষ—দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় বলতেও কেউ তার ছিলো না। ডাকাতের সঙ্গে এক সংসারে থেকে কে আর বিপদ ডেকে আনতে চায়! কিন্তু তখনকার সস্তাগণ্ডার দিনে একটা পেট চালাতে তো বিশেষ বেগ পাবার কথা নয়। তাই মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন খোঁচাতে থাকে—ডাকাতির টাকাকড়ি ও

গয়নাপত্তর এবং চাষ আবাদের ফসলপাতি নিয়ে সনাতন করতো কি ?

তা সে যাই করুক, ডাকাতি সে করতো ঠিকই। সে বুঝে শুঝেই 'ভেতরগড়ের' গহন বনের মধ্যে আস্তানা গেড়েছিলো। বনের কিনারের দিকে একটা ভাঙা দালানকে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে সে নিজের বাসাবাড়ী বানিয়ে নিয়েছিলো। বিপদ বুঝলে সে বনের মধ্যে ঢুকে তার দলবলের সঙ্গে মিশে গা ঢাকা দিয়ে কয়েকদিন থাকতো। আর সেই বন হাতড়ে তাকে ও তার দলবলকে খুঁজে বার করা তো আর মুখের কথা নয়। অবিশ্যি গোটা ভেতরগড়ের জঙ্গলকে ঘিরে ফেলে তল্লাসী চালালে হয়তো কিছু ফল ফলতো। কিন্তু সে এলাহি ব্যবস্থা করে কে ? দেশে তখন শান্তিরক্ষার জন্যে পুলিশের পাঁচ আইন সবে মাত্র চালু হয়েছে। এখানে সেখানে পুলিশের থানা ও চৌকী বসানো শুরু হয়েছে। তবে পুলিশী ব্যবস্থা তখনও তেমন কিছু জোরদার হয়ে ওঠে নি। থানা-পুলিশের কাজের তদারকির ব্যবস্থাও ততো মজবুত ছিলো না। ফলে থানার দারোগাবাই ছিলেন যাকে বলে সেই একেবারে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

॥ ২ ॥

হেমন্তকাল। সন্ধ্যের ঝোঁকে বেশ একটু শীতের আমেজ নেমেছে। রতনপুরের অরুণ চৌধুরীর বৈঠকখানা বাড়ীর আড্ডা সেদিন একেবারে জমজমাট। অরুণ চৌধুরীর বাপ-ঠাকুর্দ্দারা জমিদার ছিলেন। একে ব্রাহ্মণ, তাতে জমিদার। তাই তাঁরা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপেই জমিদারী চালিয়ে গেছেন। অরুণ চৌধুরী যখন তখন সে কথা নিজেই সগর্বে ঘোষণা করে থাকেন—'জানেন মশাই, আমার ঠাকুর্দ্দার আমলে এই পচাগড় থানার বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে।' কিন্তু বাবা মারা যাবার পর অরুণবাবু দেখলেন যে জমিদারির শুধু ঠাট-বাটই আছে। ভেতরে যাকে বলে সেই ভাঁড়ে মা ভবানী। তিনি বুঝলেন যে জমিদারি চাল ছেড়ে কিছু রোজগারের চেষ্টা করতে হবে। কোমর বেঁধে তাই তিনি পাটের ব্যবসায় নেমে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাঁর দিন ফিরে গ্যালো। লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিতে তার সিন্দুক টাকায় গয়নায় ভরে উঠলো। সন্ধ্যে বেলায় তাঁর বৈঠকখানায় স্থানীয় গণ্য মান্য লোকেরা প্রায়ই সব এসে বসতেন। নানান সুখ দুঃখের কথা হতো।

তামাকের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠতো। চা-সিগারেটের ততো রেওয়াজ তখন ছিল না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের একটানা একঘেয়ে জীবন। গল্পের খোরাক তার মধ্যে বড় একটা কিছু মেলে না। তাই প্রায়ই পরনিন্দা ও পরচর্চা করেই তাঁরা গল্প করার সাধ মেটাতেন। সেদিন কিন্তু ছিলো এক জবর খবর। আগের দিন রাতে রামচন্দ্রপুরের এক তামাক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে একটা দারুণ ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা সব মিলিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। বাড়ীর লোকজনকে অবিশ্যি তেমন কিছু মারধোর করে নি। ডাকাতি নিয়েই কথাবার্তা চলছে। রামচন্দ্র পুর গ্রাম প্রায় পনেরো মাইল দূরে। কিন্তু ডাকাতির অনেক খবর হওয়ায় ভাসতে ভাসতে পৌছে গেছে পচাগড়ে। ত্রিভুবন ভশ্চাযি স্থানীয় পাঠ-শালায় পণ্ডিতি করেন—নিপাট ভালোমানুষ, কিন্তু একটু ভয়কাতুরে। গাঁয়ের লোক তাঁকে ত্রিভুবনপণ্ডিত বলেই জানে। তিনি মৌজ করে হুঁকোতে এক টান দিয়ে বললেন—কি সব দিনকাল এলো, বলো তো ন্যায়রত্ন ভায়া? অমন মজবুত সিন্দুকে টাকা রেখেও শান্তি নেই। ডাকাতেরা বেবাক সিন্দুক ভেঙে টাকা নিয়ে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গ্যালো?

সুশীল ন্যায়রত্ন এক টিপ নস্যি নাকে ঠুসে গলা ঝেড়ে শুরু করলেন—

—তা তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি? আমাদের তো সেই যাকে বলে ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। তবে অরুণবাবাজীর ভয়ের কারণ আছে বৈ কি?

অরুণ চৌধুরী খবর শুনে বেশ কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন? কিন্তু পাঁচ-জনের সামনে কে আর কবে গলা ছেড়ে বলে থাকে—'আমি ভীষণ ভয়ে ভয়ে আছি।' তাই মনে যাই থাক, মুখে তিনি বেশ টনকোই আছেন। ঠোঁট উল্টে তিনি বলছেন -

—আরে, আমি ওসব ফেতো ডাকাত-টাকাতদের ডরাই না কি? আমার লোক-লস্কর আছে। বাবার আমলের বন্দুকটাও এখনো অকেজো হয় নি।

—তাতো জানি ভায়া। কিন্তু ডাকাতের যা সব চেহারা, আর যে বিক্রম—তা দেখলেই তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবার যোগাড় হবে। তখন যে হাতের বন্দুক হাতেই জমে যাবে—গুলি কি আর ফুটবে?

—না পণ্ডিতমশায়, আপনাকে নিয়ে আর পারা গ্যালো না। হাতে বন্দুক থাকতে অরুণ চৌধুরী যমকেও ভয় পায় না। বুঝলেন?

—বুঝেছি বৈ কি ? তবে সময় মতো বন্দুকটা আপনার হাতে তুলে দিচ্ছে কে ? রামচন্দ্রপুরের ভদ্রলোকটীরও তো কিছু লাঠিয়াল দারোয়ানের অভাব ছিলো না। কিন্তু ডাকাতির পর ত্যাখা গেলো যে তারা সকলেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। তাই, না ন্যায়রত্ন ভায়া ?

—তাই তো শুনছি। তার লাঠিয়াল ও দারোয়ানদেরই বা দোষ কি ? নতুন চাকরটাকে নাকি ডাকাতরা আগে ভাগে হাত করেছিলো। সেই এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে দিলে ডাকাতরা হুড়হুড় করে ঢুকে তাদের সব বেঁধে ফেলে। শাস্ত্র বাক্যি না মানলে পস্তাতে তো হবেই। বুঝলে বাবাজী—'অজ্ঞাত কুলশীলস্য—'

—তা জানি। কথাটা অবিশ্যি বলেছেন ভালোই। কিন্তু আমার বাড়ীতে যারা কাজ করে তারা অনেক কালকার লোক। কিন্তু দারোয়ানেরা চীৎকার তো করতে পারতো ? কি বলেন ন্যায়রত্নমশাই ?

—আর চীৎকার করতে দিচ্ছে কে ? শুনলাম নাকি দু'জন ডাকাত গায় তাদের সামনে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বলে কি না চীৎকার করেছো কি, মাথা একেবারে ফুটি-ফাটা করে দেবো। কাজ একেবারে পাকা, বুঝলে না বাবাজী !

—হুঁ, চাকর ব্যাটাকে তাহলে নিশ্চয়ই পুলিশে ধরেছে। পুলিশের কাছে উত্তমমধ্যম খেয়ে এতক্ষণে সে বাপ-বাপ বলে ডাকাতদের নামধাম সব কিছুই বলে দিয়েছে। এবার মজাটা টের পাবেন সব বাপধনেরা। সদানন্দ চক্কোত্তি বড় সোজা লোক নয়।

—তামাকের ধোঁয়া গিলে গিলে তোমার ও পণ্ডিতমশায়ের বুদ্ধিটা একেবারে গুলিয়ে গেছে। চাকরটা কি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার জন্যে মা-পিত্যেশ করে বসেছিলো ? সে ডাকাতদের সঙ্গেই কেটে পড়েছে।

—দ্যাখো, ন্যায়রত্নভায়া, তুমি যখন তখন হুঁকো তামাকের নিন্দে করবে না। জানো না যে হুঁকোর নিন্দে করলে পরজন্মে শ্যাল হয়ে 'হুক্কা' হুক্কা' করে মরতে হবে ?

—তা জানি ত্রিভুবনপণ্ডিত, তা জানি। কিন্তু বাবাজী, সদানন্দ চক্কোত্তিকে তো চিনতে পারলাম না।

—সে আর আপনি কি করে চিনবেন ? পুঁথির পাতা ঘেঁটেই আপনার দিন কাবার। লোকজনের খবর রাখবার আর সময় কই আপনার ? আমাদের পচাগড় থানার নতুন দারোগা—সদানন্দ চক্কোত্তি। একেবারে

ছুঁদে দারোগা, মশাই। দিন নেই, রাত নেই ঘোড়ার পিঠে চেপে এলাকাটা একেবারে চষে বেড়াচ্ছে। তার পাল্লায় পড়লে আর কোনো ব্যাটার রক্ষে নেই। সে নিজের বাপকেও খাতির করে চলে না। চোর-ডাকাত সব পচাগড় থানার এলাকা ছেড়ে ফেরার হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। রামচন্দ্রপুরের ডাকাতির কিনারা সে করে তবে ছাড়বে।

—সনাতনকে ধরা তোমাদের দারোগার কম্মো নয়, বাবাজী।

—ডাকাতকে দারোগা ধরবে না তো কে ধরবে? আর তা ছাড়া, সনাতনের দলই যে রামচন্দ্রপুরের ডাকাতিটা করেছে এ কথা কে বললে আপনাকে,—ন্যায়রত্নমশায়?

—আহা, বলবে আবার কে? তবে কাল ভরা আমাবস্যে ছিলো না, পণ্ডিত?

—হ্যাঁ, তাই ছিলো বটে। তার সঙ্গে ডাকাতির কি সম্পকো?

—তাইতো বলছি যে, দু এক টিপ নস্যি টানলে মাথাটা তোমাদের সাফ হয়ে যেতো। পচাগড় থানার ছেলে বুড়ো সবাই জানে যে সনাতন মাসে একটাই ডাকাতি করে, এবং সেটা করে আমাবস্যের রাতেই।

—এ কথাটা অবিশ্যি আমাদের মাথায় আসেনি। চোর-ডাকাতের ব্যাপারে আপনার মাথাটা তো দেখছি বেশ খোলে, ন্যায়রত্নমশাই। আপনি রাজী থাকেন তো সরকারকে ধরে করে আপনার জন্যে একটা দারোগাগিরি জুটিয়ে দিতে পারি।

—ব্যাপারটা হাসি-তামাসার নয়, বাবাজী। সনাতন দারুণ কালী-ভক্ত। আমাবস্যের রাতে সে ভক্তিভরে কালীপুজো করে ডাকাতি করতে বেরোলে তাকে রোখা যে শিবের অসাধ্যি। স্বয়ং মা কালীই যে তাকে রক্ষা করেন।

—বুঝুন পণ্ডিতমশায়! সব ডাকাতেই কালী পুজো করে, আবার ধরা পড়ে ঘানিও টানে। একটা ডাকাতকে রক্ষে করার জন্যে মা কালীর আর ঘুম হচ্ছে না, নয়?

—'কালী, করালবদনী মা। বাবাজীর অপরাধ নিও না।' দুটো পয়সার মুখ দেখেছো বলে ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে হাসি-মস্করা করো না বাবাজী। সনাতনের সংসার বলতে কিছু নেই—একলা মানুষ। তার জোতজমাও আছে। নিজে হাতে চাষ আবাদ করে সে যা পায়, তাতেই

তার একটা পেট ভালভাবেই চলে যায়। ডাকাতির টাকা পয়সা সে ছোঁয় না—গোরক্তের সামিল মনে করে।

—এত কথা আপনি জানলেন কি করে, ন্যায়রত্নমশাই ?

—এ আর কে না জানে ? বাবাজী, পাটের দালালের পেছনে ঘুরতে ঘুরতেই তোমার দিন চলে যায়। আর হাকিম-দারোগা ছাড়া কারুর খবরই তো তুমি রাখো না। রাখলে তুমিও জানতে যে সনাতন ভুলেও মেয়েছেলেদের গায়ে হাত তোলে না। গরীবগুর্বো লোকেদের কাছে সে একেবারে মা-বাপ। কাজেই ডাকাতির সময় গাঁয়ের লোকজন যে লাঠি ধরে সনাতনের দলবলকে রুখে দাঁড়াবে সে আশাও বৃথা। সনাতনের নাম শুনলে তারা কপালে হাত ঠেকিয়ে সোজা বাড়ী ফিরে যাবে।

—এ গাঁয়ের লোকের অন্যায়, ঘোরতর অন্যায় ! প্রতিবেশীর প্রতি একটা কর্তব্যবোধও কি তাদের নেই ?

—নিশ্চয়ই আছে বাবাজী, নিশ্চয়ই আছে। তবে বুঝলে কি না খালিপেটে আর কাঁহাতক কর্তব্য করা যায় ? তোমরা যারা টাকার ওপরে বসে আছো, তারা কি ভুলেও কখনো গরীবদের কথা ভাবো আজকাল ? কিন্তু তোমার বাপঠাকুর্দ্দারা ন্যায়-অন্যায় যাই করে থাকুন, গরীবদের জন্যেও মাঝে মাঝে দু'চারটে ভালো কাজ করেছেন বৈ কি ?

—আর আজকাল বোধহয় করছেন আপনার সনাতন ও তার দলের ডাকাতরা ? আপনি যে কি বলেন, ন্যায়রত্নমশায়।

—ঠিকই বলছি বাবাজী। কোথায় কবে অজন্মা হলো, কে পয়সার অভাবে মেয়েকে পার করতে পারছে না—এসব খবর সনাতনের একেবারে নখোদর্পনে। অভাবের জ্বালা যে বড়ো জ্বালা ! তাই সনাতনের দলবল লুঠের টাকা যখন গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দেয়, তখন তারা দু'হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ জানায়। বুঝলে, বাবাজী ?

—ছিঃ ছিঃ, ডাকাতদের হাত থেকে টাকা নিতে তাদের বাধে না ?

—তা জানি না, বাবাজী। তবে আসল কথা হলো এই যে সনাতনের নাম আজকাল পচাগড় থানার গরীব-দুঃখীদের মুখে মুখে ফেরে। তাই বলছি সনাতনকে হুট্ বলতে ধরে ফেলা তোমার সদানন্দ দারোগারও হিম্মতে কুলোবে না !

—তাহলে কি করবো বলতে পারেন ? সনাতন ডাকাতকে কিছু ঘুষ-ঘাষ দিয়ে হাতে রাখবো ?

—আহা, চটো কেন বাবাজী ? আমরা কি তাই বলছি ? কি বলো পণ্ডিত ? আমি বলি কি যে তুমি একটু মুখ তুলে গরীবদের দিকে তাকাও, মাঝে মিশেলে দানধ্যান করো, পুকুর খোঁড়াও, পাঠশালা বসাও। আরও কতো কিই তো তুমি করতে পারো। ভগবান যখন তোমাকে ঢেলে দিয়েছেন, তখন ভোগদখল যা করবার তা করো। কিন্তু গাঁয়ের লোক-জনেও যাতে তুবেলা তুমুঠো খেয়ে বাঁচতে পারে সে দিকেও যে তোমার খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে দেখবে সনাতনের দৃষ্টি আর তোমার ওপর পড়বে না।

—নাঃ, ন্যায়ের পুঁথি পত্তর ঘেঁটে ঘেঁটে আপনার দেখছি ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানই লোপ পেতে বসেছে। অন্যের টাকাটা সবাই বেশী দেখে। সনাতনকে খুশী করতে রক্ত জল করা টাকা দিয়ে আমায় কিনা দানছত্তর খুলতে হবে ? দেখি আপনার সনাতন কত বড়ো ডাকাত ? আমি কাল সকালেই যাচ্ছি সদানন্দ দারোগার কাছে। বুঝলেন ন্যায়রত্নমশাই, এখন ইংরেজের রাজত্ব কায়েম হয়েছে, ওসব সনাতন-ফনাতনের চোরফুট্টি আর বেশী দিন চলবে না।

—বেশ, তাই যাও বাবাজী। কিন্তু বাবাজী, তুমি তোমার নিজের বুদ্ধিটাই বেশী মনে করলে। তা যা ভালো বোঝো, তাই করো—নিজের বুদ্ধিতে ফকীর হওয়াও ভালো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

এই বলে ন্যায়রত্ন মশায় কপালে হাত ঠেকিয়ে উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমশায়ও গা ঝাড়া দিলেন। তাঁর অবিশ্যি আর এক ছিলিম তামাক খাবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু রাত বেশ খানিকটা এগিয়ে গ্যাছে—পাড়াগাঁয়ের পথে ঘাটে জনমনিষ্যির আর টিকিটাও এখন দেখা যাবে না। কাজেই এর পরে একলা কি করে বাড়ী ফিরবেন তিনি ? পথে ঘাটে যদি তাঁকে চোর ডাকাতে ধরে। তাই তিনি ন্যায়রত্ন ভায়ার সঙ্গেই বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলেন। সেদিনের মতো আড্ডাও ভাঙলো।

॥ ৩ ॥

মুখে যাই বলুন না কেন চৌধুরীমশায়, মনে তাঁর শান্তি নেই। বহু কষ্টের পাট বেচা টাকা তাঁর। ন্যায়রত্নমশায় বলেন কি না—কিছু দানধ্যান করো। এই সব ভাবছেন তিনি রাতে শুয়ে শুয়ে। ঘুম আর

তাঁর আসে না। তাহলে কি ন্যায়রত্নমশায় মনে করেন যে সনাতন তাঁর বাড়ীতেও হানা দিতে পারে? ভাবলে ভয়ে তাঁর হাড় হিম হয়ে যায়! এতদিনের এত কষ্টের রোজগার করা টাকা কয়েক মিনিটের মধ্যে লুঠ হয়ে যাবে? এ যে ভাবাই যায় না। আচ্ছা, সদরে কোনো মহাজনের গদীতে টাকাটা জমা রেখে এলে কেমন হয়? ভালোই হয়, কিন্তু তাহলে ব্যবসাপাতি চলবে কি করে? আর লোকেই বা ভাববে কি? দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জমিদারের ছেলে কি না ডাকাতের ভয়ে টাকাকড়ি সব সরিয়ে দিচ্ছে, কাল নিজেই না দেশ ছেড়ে সরে পড়ে। না, না, তা হয় না। আর আগে ভাগে এত সব দুশ্চিন্তা করার তো কারণ ঘটে নি। তিনি এমন কিছু অসহায়ও নন। হাতের কাছে বন্দুক আছে, নীচে সদর দরজার কাছে দু'চারজন লাঠিয়ালও থাকে। লোকে বলে যে সনাতন ডাকাত থাকে সেই ভেতরগড়ের জঙ্গলে। সেখান থেকে রতনপুর কম করে পনেরো মাইল পথ। এতটা পথ ভেঙে ডাকাতি করে আবার অন্ধকার থাকতে থাকতে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব? এখনই রাত বেশ বড়ো হয়ে এসেছে। একমাস পরে আরো বড়ো হয়ে যাবে, শীতও পড়বে জাঁকিয়ে ধুত্তোর, তবে আমাবস্যে আসতে এক মাস দেরী আছে। এর মধ্যে ভেবে চিন্তে যা হোক একটা কিছু করা যাবে। কাল সকালেই অবিশ্যি সদানন্দ দারোগার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। দেখাই যাক না, তিনি কোনো বুদ্ধি দিতে পারেন কি না। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে পেলেন মুক্তি।

কিন্তু পচাগড় থানার দারোগা সদানন্দ চক্কোত্তির দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এর আগে তিনি ছিলেন পাটগ্রাম থানায়। সেখানে তিনি প্রবল প্রতাপে চোর ডাকাতদের শাসন করে এসেছেন। থানার লোকজন সবাই বলতো— 'হ্যাঁ, দারোগা বটে সদানন্দ চক্কোত্তি। চোর ডাকাতরা সব এখন ঘানি টেনে মরছে।' কিন্তু পচাগড়ে এসে সে সুনাম বুঝি আর বজায় রাখা যায় না। সদরের কর্মকর্তারাও বেশ বিরক্ত হয়েছেন। তাঁদেরই বা দোষ কি? কাল সারাটা দিন ধরে তিনি রামচন্দ্রপুরের ডাকাতিটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। আশেপাশের গাঁয়ের লোকজনকে, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। মহল্লার চৌকিদারদের অনেক ঝাঁকাঝাঁকি করেছেন। কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারে না। চৌকিদাররা তো দিব্যি করে বলে গ্যালো

যে তাদের মহল্লা দিয়ে রাতে ডাকাতের দল যায় নি। তাহলে? মোটা-মোটি তদন্ত সেরে অনেক রাতে তিনি ঘোড়ায় চেপে থানায় ফিরেছেন। আবার সকাল না হতেই উঠে উর্দ্দি পরে থানায় এসে বসেছেন। সেই এক দুশ্চিন্তা—ডাকাতেরা এলোই বা কোন পথে, গেলোই বা কোন দিক দিয়ে। সনাতন ডাকাতের সম্বন্ধে অনেক কিছুই তিনি ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছেন। থানার কাগজপত্রে যা লেখা আছে তাও তিনি পড়েছেন। কিন্তু ভেতরগড় থেকে রামচন্দ্রপুর যে কম করে বিশ মাইল পথ। এতগুলি লোক এলো গ্যালো—কোনো চৌকিদার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলো না। তাজ্জব ব্যাপার। অথচ তাঁর মন বলে যে কাজটা সনাতনই করেছে। কিন্তু প্রমাণ কি? কিছুই নেই। তবে এমন চুপিসাড়ে কাজ সেরে চম্পট দেওয়া যে কেবল সনাতনের পক্ষেই সম্ভব। বাড়ীর মেয়েদের গা থেকে গয়না একখানাও কেউ নেবার চেষ্টা করে নি, বাড়ীর কর্তাকে মারধোর কিছু বিশেষ করে নি, ঘরদোরের জিনিসপত্তর ঠিক যেমন ছিলো, তেমনিই আছে। শুধু শূন্য সিন্দুকটা হাঁ করে পড়ে আছে। ভেতরে ছিলো কম করে পাঁচ হাজার টাকা—সে সবই লুঠ করে নিয়ে গেছে ডাকাতেরা। সেদিন আমাবস্যের রাতও ছিলো বটে। দারোগাবাবু জানেন যে সনাতন একমাত্র আমাবস্যের রাতেই ডাকাতি করতে বেরিয়ে থাকে। কিন্তু সনাতনকে শায়েস্তা করার কি উপায়? ভেতরগড়ের বন-জঙ্গল হাতড়ে সনাতনকে তিনি না হয় ধরেই আনলেন। তারপর? একরাশ কাঁচা টাকা নিজের কাছে রাখার মতো বেকুব সে নয়। তাছাড়া তার দান ধ্যানের গল্পও তিনি শুনেছেন। এতক্ষণে তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা সে সব টাকা নির্ঘাত গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। ব্যাস্, হয়ে গ্যালো—প্রমাণের দফারফা! এই সব কথাই তিনি থানায় বসে ভেবে চলেছেন। এমন সময় 'হুম্-ব্রো' 'হুম্ ব্রো' শব্দে তাঁর চমক ভাঙলো। দেখলেন একখানি ছোটো পালকি থানার হাতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কি ব্যাপার? কাল রাতে আবার কোনো পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে না কি? পালকি থেকে যিনি নামলেন তিনি আমাদের পরিচিত। শ্রীযুক্ত অরুণ চৌধুরী। সাজে পোষাকে এখনও তিনি সাবেকি জমিদারী ঠাট-টা বজাই রেখে চলেছেন। দারোগা-বাবু তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

—নমস্কার, চৌধুরী মশায়, নমস্কার। দিনটা আজ ভালোই যাবে

দেখছি, সকাল না হতেই আপনার মতো ভাগ্যবান লোকের দেখা পেলাম। আসুন, বসুন। তা সকালবেলাই কি মনে করে? খবর সব ভালো তো?

—আজ পর্য্যন্ত সব ভালোই বলতে হয়। কিন্তু কাল যে কি ঘটবে তা ভগবানই জানেন।

—আপনার কি হয়েছে বলুন তো? আপনাকে কেমন যেন মনমরা বলে মনে হচ্ছে।
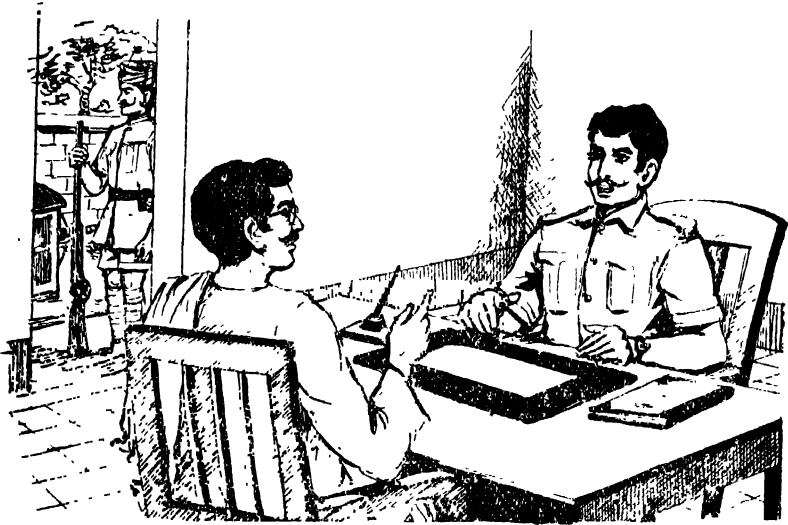
—আর মন-মরা। প্রাণে মরিনি এই কত না। হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম—ঐ রামচন্দ্রপুরের ডাকাতিটার কিছু কিনারা হলো?

—না, এখনও কিছু কুলকিনারা করতে পারি নি। তবে লেগে আছি। আমি হাল ছেড়ে বসে থাকার লোক নই।

—আজ্ঞে তা আমি জানি বৈ কি। আর জানি বলেই তো আপনার কাছে দৌড়ে এলাম। আচ্ছা—ডাকাতিটা কি সনাতনের কীর্তি বলে আপনার মনে হয়?

—মাফ্ করবেন চৌধুরীমশায়। তদন্তের খুঁটিনাটি নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলাপ করা আমাদের মানা। তবে সনাতনের কোনো খবর কি আপনার জানা আছে?

—তা, অবিশ্যি নেই। তবে ছোটো বড়ো চোর ডাকাতদের প্রায় সকলকেই তো আপনি পুরে দিয়েছেন। কয়েকজন আপনার এলাকা

ছেড়ে ভেগেও পড়েছে। বড় ডাকাতদের মধ্যে আছে একমাত্র সনাতন! তাই তাকে ছাড়া আর কাকেই বা সন্দেহ করি বলুন?

—কথাটা আপনার ভেবে দেখার মতো। তবে বাইরে থেকেও ডাকাতের দল আসতে পারে।

—তা সে আপনার কাজ, আপনি করুন। আমি একটু আপনার কাছে পরামর্শো নিতে এসেছি।

—বেশ তো, বলুন।

—আপনাকে বলতে কোন দোষ নেই যে আমি পাটের ব্যবসায় ছু'পয়সা করেছি। টাকাকড়ি আমার শোবার ঘরে সিন্দুকের মধ্যেই থাকে। ঘর দোরও আমার বেশ পাকাপোক্ত। সদর দরজায় খিল এঁটে রাতে ছু'জন দারোয়ানও ঘুমিয়ে থাকে। আমার নিজেরও বন্দুক আছে। কিন্তু তবু যে ভয় যায় না। মনে হয় সনাতন ডাকাত যে কোনোদিন এসে সব লুটে নিয়ে যাবে।

-- হু। আপনার দারোয়ান ছু'জন বেশ বিশ্বাসী লোক তো? তারা কি আপনার গাঁয়ের মানে রতনপুরের লোক?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। তারা ছু'জনই গাঁয়ের নামকরা লাঠিয়াল। বাবার আমল থেকে আছে। বয়স তাদের হয়েছে ঠিকই। তবে এখনও লাঠি ধরলে পাঁচ দশ জনের মওড়া নিতে পারে। আর, হ্যাঁ, আমার চাকর বাকরেরাও সব পুরোনো আমলের লোক।

—ভালো কথা। ভয়ের তো কোনো কারণ আপনার দেখছি না। তবে —ঐ যে বলে—সাবধানের বিনাশ নেই।

—আর কি সাবধান হলো বলুন?

—আমি শুনেছি যে এই অঞ্চলের গরীবগুর্বো লোকজন সব সনাতনকে প্রায় দেবতা বানিয়ে ফেলেছে। লাঠিয়াল ছু'জন বিশ্বাসী হলেও হয় তো সনাতনের ফাঁদে পা দিয়ে বসতে পারে। তাই বলছি, কুচবিহার থেকে ছু'জন ভিনদেশী লাঠিয়াল এনে রাখুন না কেন? এই ধরুন মাস তিনেকের জন্যে। তার মধ্যেই সনাতন বাবাজীকে লীলাখেলা সাঙ্গ করে শ্রীঘরে যেতে হবে।

—আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক দারোগাবাবু। তা-ই-ই হোক। মনে রাখবেন যে আপনার সুনাম ও আমাদের ধনমান—ছুইই আজ বিপন্ন। আমি কালই যাচ্ছি কুচবিহারে। দেখি ছু'জন সাহসী ও বিশ্বাসী লোক পাই কি না।

চৌধুরীমশায় দারোগাবাবুকে নমস্কার জানিয়ে পাল্কিতে উঠে চলে গেলেন। পাল্কিতে বসে তিনি দারোগার বুদ্ধির তারিফই করছিলেন। তাঁর লাঠিয়ালরা হাজার হোক গাঁয়ের লোক তো বটে। কাজেই তাদের বশে আনা সনাতনের পক্ষে বিশেষ শক্ত নাও হতে পারে। না, আর দেরী না করে কালই যেতে হয় কুচবিহার।

একটার পর একটা দিন চলে যাচ্ছে, আর সদানন্দ চক্কোত্তির দুশ্চিন্তাও বেড়ে চলেছে। রামচন্দ্রপুরের ডাকাতির কোনো কিনারাই হলো না। পচাগড় থানার এলাকা তিনি তোলপাড় করে ফেলেছেন। কিন্তু ডাকাত ধরার কোনো সূত্রই তিনি খুঁজে পান নি। নামকরা চোর-ডাকাতেরা হয় সব জেলে, না হয় এলাকার বাইরে। তাহলে কি সত্যিই বাইরে থেকে দল এসে ডাকাতিটা করে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে? কে জানে? কিন্তু তাহলেও খবরাখবর তো স্থানীয় কোনো দাগী আসামীই যুগিয়ে থাকবে? কে সে? পুরোনো অকেজো যতো সব দাগী আসামী ছিলো এলাকায়, সবাইকেই তিনি ঝাঁকাঝাঁকি করেছেন। কিন্তু একই জবাব পেয়েছেন সকলের কাছ থেকে—'বিশ্বাস করুন হুজুর, আমরা কিছুই জানি না।' শুধু সনাতনকেই এতদিন তিনি কিছু বলেন নি। এবার তাকে নাড়াচাড়া না দিলে তো আর চলে না। তিনি ভেবেছিলেন যে একেবারে প্রমাণ হাতে নিয়ে সনাতনকে পাকড়াও করবেন। কিন্তু তা আর হলো কৈ? আইনের জ্ঞানও তাঁর টনটনে। তিনি জানেন যে বিনা প্রমাণে সনাতনকে হয়তো দু'চারদিন হাজতবাস করানো যাবে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বিচারের জন্যে তাকে চালান করাও যাবে না।—রাগের মাথায় তাকে ধরে শেষ রক্ষে না করতে পারলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং তাতে সনাতনই বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াবে- ফুঃ, সদানন্দ দারোগার কেরামতি বোঝা গেছে। কিন্তু তবু সনাতনের সঙ্গে একবার মুখোমুখি পরিচয় করা দরকার। তার ডেরাটা খানা-তল্লাসী করেও দেখা যেতে পারে যে থোক্ টাকাকড়ি কিছু মেলে কি না। কিন্তু ডাকাতের ডেরায় যেতে হলে তৈরী হয়েই যেতে হয়। সনাতনের অবিশ্যি 'খুনে ডাকাত' বলে দুর্ণাম নেই। দারোগার ওপর চড়াও নিশ্চয়ই সে হবে না। তা'হলেও মামুলি প্রস্তুতির তো দরকার। তাই সদানন্দ দারোগা একদিন সাত সকালে দু'জন সিপাহী ও দু'জন চৌকিদার নিয়ে সনাতনের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। বাড়ীর কথা আগেই বলেছি—ভেঙেপড়া কোঠার মধ্যে একটা শোবার ঘর, একফালি

বারান্দা ও একটা মেটে রান্না ঘর। কিন্তু সব কিছু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দারোগাবাবুকে আসতে দেখে সনাতন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়ে এলো। পায়ের ধুলো নিয়ে বললো—হুজুর একে বেরাম্ভন, তাতে দণ্ডমুণ্ডের কত্তা। আজ আমার কি সৌভাগ্যি! রাত না পোয়াতে হুজুরের পায়ের ধুলো পড়লো এই অধমের বাড়ীতে। তা হুজুর এতো কষ্ট না করে আমাকে ডেকে পাঠাতেই তো পারতেন। আমি হুজুরে হাজির হয়ে যেতাম।

দারোগাবাবু হুঁদে লোক। জীবনে বহু চোর-ডাকাতের সংস্পর্শে এসেছেন। এসব খোসামুদি কথায় ভেজার পাত্তর তিনি নন্। তীক্ষ্ণ চোখে তিনি সনাতনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিলেন। দেখে যেন একটু অবাকই হ'লেন। অপরাধের কোন ছাপই নেই সনাতনের মুখে। বেশ দোহারা লম্বাটে চেহারা, মাজা-মাজা গায়ের রঙ ও মাথায় এক ঝাঁকড়া চুল। গড়নও এমন কিছু ষণ্ডামার্কা গোছের নয়। তবে গায়ে যে সে রীতিমত তাগদ রাখে তা দেখলেই বোঝা যায়। মাঝাবয়সী সনাতনের মুখে বিনয় ও সৌজন্যভরা হাসি ছাড়া আর কিছুই তিনি খুঁজে পেলেন না। বললেন—

—সনাতন, তোমার নাম শুনেছি। তোমার ঘরটা একবার তল্লাসী করে দেখতে চাই।

—তা হুজুর, দেখবেন কৈ?

দারোগাবাবু সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভেতরে গেলেন। কিন্তু কিই বা দেখবেন সেখানে? থাকার মধ্যে তো ঘর-সংসারের মামুলি কয়েকটা ঘটি-বাটি-থালা, একটা নড়বড়ে চৌকী ও বিছানা এবং রঙচটা একটা তোরঙ্গ। তবু ও সব উল্টেপাল্টে ও খুলে মেলে দেখলেন। তারপর বাইরে এসে বললেন -

—হুঁ, যা ভেবেছিলাম তাই। তোমার বুদ্ধিতে কিছু ঘাটতি নেই। লুঠের টাকা যে তোমার কাছে পাওয়া যাবে না তা আমি জানতাম।

—লুঠ করলে তো, হুজুর, টাকা পাওয়া যাবে। আর আমার টাকার দরকার কি হুজুর? বে-থা করিনি। আমার নিজের কিছু জোতজমা আছে। তাই থেকেই একটা পেট বেশ ভালভাবেই চলে যায়। নেশাভাঙ ও বদখেয়াল বলতেও আমার কিছু নেই।

—তা, অবিশ্যি নেই। তবে লোকে তোমাকে ডাকাত বলে কেন?

'রায়-ডাকাতের' সুনামের বা দুর্নামের জ্বালায় যে আমাদের এলাকায় টেঁকা দায়।

—কি বলবো, হুজুর। অপযশের ভাগ্যি! আমি কারুর সাতে-পাঁচে থাকি না। তবুও যদি লোকে দুর্নাম করে, তাহলে তো আমি নাচার!

—এই ঘোড়াটি তোমার কি কাজে লাগে সনাতন?

—হুজুর দেখছেন তো দেশে পথঘাট বলতে বড একটা কিছু নেই। তাই ঘোড়াটীর পিঠে চেপেই আমি হাঠে মাঠে যাওয়া আসা করি। আবার ক্ষেতের ফসল ও 'তারা' পিঠে করে বয়ে আনে।

—ঘোড়াটী বেশ তেজীও দেখছি। তা এটীর নাম বুঝি 'তারা'?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ, হুজুর।

—এতো নাম থাকতে, 'তারা' রাখলে কেন?

—হুজুরকে বলা হয়নি। আমি কালীমায়ের একটী অধম ভক্ত। আর ঘোড়াটী ছোটে যেন একেবারে তারার মতো।

—বাঃ তোমার তো বেশ রসজ্ঞানও আছে দেখছি।

—আজ্ঞে কি যে বলেন, হুজুর। আমি হলাম গিয়ে একজন আকাট মুখ্যু। আমার আবার জ্ঞান গম্যি!

—আচ্ছা। আজ আমি আসি, সনাতন। পারো তো ভালোভাবে থেকো। আমার নাম সদানন্দ দারোগা। আমার চোখে ধুলো দিয়ে বেশীদিন কোনো ডাকাতই জেলের বাইরে থাকতে পারে নি। তুমি ও পারবে না।

—আপনার কীর্ত্তিকাহিনী আমি সব শুনেছি, হুজুর। কিন্তু মুখে কিছু না দিয়ে একেবারে ধূলো পায়ে এ অধমের ঘর থেকে চলে যাবেন হুজুর?

—সেসব আর একদিনের জন্যে তোলা রইলো। দেখা তো আমাদের হবেই।

দারোগাবাবু দলবল নিয়ে থানার দিকে রওয়ানা দিলেন। দুশ্চিন্তার বোঝা তাঁর মাথায় সিন্ধাবাদের দৈত্যের মতোই চেপে থাকলো। খেয়েও স্বস্তি নেই, শুয়েও স্বস্তি নেই। শেষে কি অপবাদ নিয়ে মুখ কালো করে বিদায় নিতে হবে পচাগড় থেকে? এদিকে আমাবস্যার রাতও এগিয়ে আসছে। আবারঃ যদি সে-রাত্তিরেও একটা বড়গোছের ডাকাতি হয়, তাহলে যে মুখ দেখানোই ভার হবে। চৌধুরীমশায় তাঁর কথা মতো দু'জন ভিনদেশী দারোয়ান বাহাল করেছেন বটে। কিন্তু রামচন্দ্রপুরের

বাড়ীতেও জনা দু'য়েক দারোয়ান ছিলো। ঘটনার সময় তারা কোনো কাজেই এলো না। তদন্ত যে চালিয়ে যাবেন এমন কোনো সূত্রই যে বার করা গ্যালো না—মুস্কিলের কথা নয় কি? কিন্তু অনেক ঠেকে তিনি বুঝেছেন যে, কোন মুস্কিলের কখন যে কিভাবে আসান হয়ে যায় তা আগেভাগে কেউই বলতে পারে না। কাজেই সদানন্দ চক্কোত্তি ধৈর্য্যও হারালেন না, আশাও ছাড়লেন না!
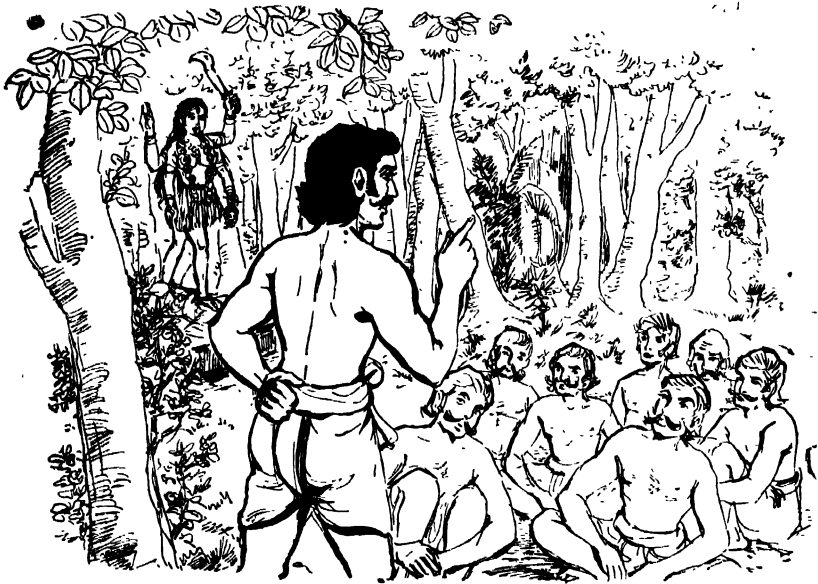
ভেতরগড়ের ঘোর জঙ্গলের মধ্যে সনাতনের দলবল সব জমায়েত হয়েছে। শলা পরামশ্শো চলেছে। সামনে একটী ছোটো কালী প্রতিমা। তখন সবে সন্ধ্যে। কিন্তু একে আমাবস্যের রাত, তাতে চারিদিকে ঘন জঙ্গল। কোলের মানুষ চেনা ভার। সকলের কথা শোনার পর সনাতন কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে—

—আমি আবার তোদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যে কোনো কারণই মেয়েদের গায়ে হাত তোলা চলবে না। পুরুষদেরও ওপর অকারণে জোর জুলুম করা মানা।

—তা আমরা জানি, সর্দার। কিন্তু আসল ঘরের দরজাটা যে বড়ো মজবুত। সেটা ভাঙার কি উপায় হবে?

—পাশেই একটা চাষীর বাড়ী আছে। সে আমাকে চেনে। আমার

নাম করে তার কাছ থেকে ঢেঁকিটা চেয়ে নিবি। কাজ মিটে গেলে আবার ফেরত দিয়ে যাবি।

—কিন্তু অতো রাতে ঢেঁকি চাইতে গেলে, একটা ঝঞ্ঝাট বেঁধে যাবে না?

নিশ্চয়ই যাবে। আবার ঘোর আমাবস্যের রাতে দল বেঁধে পথ হাঁটতে শুরু করলেও বিপদ হতে পারে। সদানন্দ দারোগার কাছে দাবাড়ি খেয়ে চৌকিদাররা সব রেতে একেবারে হন্যে হয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। দারোগার চরও যে কোথায় আছে, আর কোথায় নেই তাও কেউ জানে না।

—তাহলে উপায়, সর্দার?

—সেই কথাই তো বলছি। তার আগে আমি জানতে চাই যে ভিনদেশী ভাষা তোদের সব রপ্ত হয়েছে তো? কার কি নতুন নাম রেখেছি, তাও নিশ্চয়ই মনে আছে?

—হ্যাঁ সর্দার। নাম তো সদা সব্বদাই জপ করেই চলেছি।

—বেশ মনে থাকে যেন। দেশী ভাষায় একটীও কথা বলা চলবে না। আর বেশভূষোর কথা সকলের মনে আছে, তো? অল্প আলোতে কাজ হাসিল করতে হবে। বেশী মশাল জ্বালা চলবে না।

—সব ঠিক আছে, সর্দার।

—বেশ। তোরা তাহলে এখুনি হাঁটা দে। আশেপাশের সব বাড়ীর

লোকই আমাকে চেনে। সেখানে বা ঝোপঝাড়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাক্। শুধু হরবোলা আমার সঙ্গে থাকবে। আমি কালীমায়ের পুজো সেরে ঠিক সময়েই হরবোলাকে নিয়ে চলে যাবো। রণ-পা'য় চড়লে আর পনেরো মাইলের পথ এমন বেশী কি ?

—তা সর্দার, আমরা কখন বাড়ীর সামনে এসে জড়ো হবো ?

—তোদের মাথায় আছে কি ? সেই জন্যই তো হরবোলাকে রাখা। বাড়ীর সামনে আমরা হাজির হলে হরবোলা তখন হোঁদল-কুঁতকুঁতে পাখীর ডাক ডাকবে "দুধ দিবি না পুত দিবি, বৌ দিবি না ঝি দিবি, কি দিবি, কি দিবি ?" ব্যাস, তোরা তখন ধীরে সুস্থে এসে জড়ো হয়ে যাবি, বুঝলি ?

—বুঝলাম সর্দার! কিন্তু হোঁদল-কুঁতকুঁতের ডাক যে বড়ো অমঙ্গুলে।

—হ্যাঁ, বাড়ীর মালিকের পক্ষে তো বটেই। যা এবার সব কালীমায়ের নাম করে হাঁটা দে।

'জয় কালীমায়ের জয়', 'জয় সনাতন সর্দারের জয়' বলতে বলতে সনাতনের দলবল সব হাতে একটা ছোটো খাঁটো পুঁটলি নিয়ে রওয়ানা হয়ে গ্যালো। সনাতন সেদিকে খানিকটা তাকিয়ে রইলো। তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে ভক্তি ভরে প্রার্থনা জানালো - 'মা, কালী করালবদনী মা, দেখো যেন কারুর কোনো বিপদ না হয়। আজ রাতে টাকাটা না পেলে যে আর ওদের বাঁচানো যাবে না।'

॥ ৬ ॥

পুরো একটা মাস কেটে গ্যালো। রামচন্দ্রপুরের ডাকাতির কোনো কিনারাই হলো না। কাল আবার ছিলো আমাবস্যের রাত। কে জানে সনাতন আবার কোথাও হানা দিয়ে বসলো কি না। সকালের দিকে থানায় বসে দারোগাবাবু এই সব কথাই মনে মনে তোলাপাড়া করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো একটা পালকি থানার দিকে আসছে। দু'জন শক্তসমর্থ গড়নের পশ্চিমা লোক ও পালকির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ুচ্ছে। দারোগা উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সর্ব্বনাশ চৌধুরীমশায়ের পাল্কি বলে মনে হচ্ছে যেন! হ্যাঁ, তাই-ই তো, পাল্কিটা যে থানার হাতার মধ্যেই ঢুকে পড়লো। তবে কি ?

আর তিনি ভাবতেও পারলেন না। নিজের অজান্তেই আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। চৌধুরীমশায় পাল্‌কি থেকে নামলেন। তাঁর চেহারা দেখেই দারোগাবাবুর বুঝতে আর বাকী রইলো না যে ভদ্রলোকের শরীর ও মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। চৌধুরীমশায় থানা-ঘরের মধ্যে ঢুকে ধপ্‌ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর যেন অনেকটা ভাঙা গলায় বললেন—

—যা ভয় করেছিলাম বড়বাবু, তাই হলো। কাল রাতে ডাকাতেরা আমার যথাসব্বসো লুঠে নিয়ে গেছে।

—কি আর বলবো, চৌধুরী মশাই! বড়ই—লজ্জার কথা হ'লো। হন্যমুন্য চেষ্টা করেও সনাতনকে রুখতে পারলাম না।

—না, না, এ সনাতনের কাজ নয়! আপনার কথাই ফললো, দেখছি। এ ডাকাতের দলটা একেবারে নির্ঘাত বাইরে থেকেই এসেছিলো।

চমকে উঠলেন দারোগাবাবু! তাহলে কি তিনি বোকার মতো সনাতনের পেছনে ঘুরে মরছেন, আর বাইরে থেকে দাগীরা এসে একের পর এক ডাকাতি করে যাচ্ছে। না. না, তা কি করে হবে? পাশের থানার বড়বাবুদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রেখে চলেছেন। চৌধুরীমশায় ঝানু লোক ঠিকই। কিন্তু এখন কি আর তাঁর মাথাবুদ্ধি ঠিক আছে? তাই অবিশ্বাস ভরা চোখ তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন—

—হয়তো, আপনার ধারণাই ঠিক চৌধুরী মশায়। কিন্তু কারণ তো কিছু বল্লেন না!

—আমিই খাল কেটে কুমীর এনেছিলাম মশায়, নিজে হাতে খাল কেটে কুমীর এনেছিলাম।

—মানে?

—ঐ যে আপনার কথামতো হলদিবাড়ীর এক ব্যবসায়ীর গদী থেকে দু'জন পশ্চিমা লোক নিয়ে এসেছিলাম না?

—তাতো জানি। কিন্তু তারা কি দোষ করলো?

—আর কি করলো? তারাই মশায় যোগসাজস করে হলদিবাড়ী থেকে দল ডেকে এনে কাণ্ডটা করিয়েছে। সব্বনেশে লোকদুটো সঙ্গেই আছে। তাদের একটু দাওয়াই দিলেই সব কথা বেরিয়ে পড়বে।

—এত কাণ্ড করার পর লোকদুটো ডাকাতদের সঙ্গে পালায় নি! তাজ্জব ব্যাপার দেখছি?

—পালাবে কোথায় ? হলদিবাড়ীর গদীতে যে তাদের টিকি বাঁধা আছে।

—তাহলে ? আচ্ছা, তারা কি ডাকাতদের রোখবার কোন চেষ্টাও করেনি ? নিদেনপক্ষে সোরগোলও তো করতে পারতো ?

—তবে আর শুনছেন কি ? লক্ষ্মীছাড়ারা বলে কি না তাদের নাম ধরে কে যেন ডাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সদর দরজা খুলে ডাকাতদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন !

—চৌধুরী মশায় এরা সাধাসিধে প্রকৃতির লোক। এদের বোকা বানিয়েই হয়তো ডাকাতেরা কাজ হাসল করেছে। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার। লোক ছুটোকে, এবার ডাকুন।

চৌধুরীমশায়ের ডাকে রামভজন সিং ও রাজেশ্বর সিং হাতজোড়ো করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে একেবারে ধপাস করে দারোগাবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়লো। দারোগাবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে সরে গেলেন। বল্লেন—ঠিক হ্যায়, খাড়া হো যাও। শরীরটাকে কোনোরকমে টেনে তুলে তারা উঠে দাঁড়ালো। দারোগাবাবু এবার ঠাহর করে তাদের দেখলেন। ঝাড়া যোয়ান। কিন্তু ভয়ে দুঃখে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে। এমনিতে গোবেচারী প্রকৃতির লোক বলেই মনে হয়। দেখাই যাক না কি বলে এরা। দারোগাবাবু হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়লেন—

—ডাকু ! বদমাশ্ !

—বিশোয়াস্ করুন হুজুর, আমরা কুছু জানি না।

—কুছু জানি না! তবে ডাকাতদের জন্যে দরজা খুললো কে?

—হুজুর মাই-বাপ। সাচ্ বোলছি হুজুর, যে বাহার থেকে এক আদমী আমাদের নাম লেকে বলিয়েছিলো।

—ব্যাস, অমনি তোমরা দরজা খুলে দিলে।

—না, হুজুর। আমরা পুছলাম—'তুমি কে আছো?'

—তারপর।

—তখন বিশোয়াস্ করুন, হুজুর, একদম পহছানা আওয়াজ হলো—'হামারা নাম শিউপূজন সিং। রাজেশ্বর কা ঘরসে জরুরী খত আয়া। জল্দি দরওয়াজা খুলে দেও।'

—বলো কি? তারপর?

—ইস্‌সে হামাদের কৈ সক রইলো না। আমরা দরজা খুলিয়ে দিলাম।

—শিউপূজন তোমাদের কে লাগে?

—হলদিবাড়ীমে, হুজুর, হামলোগ্ একই গদীতে কাম করিয়ে থাকি।

—দরজা খুলে কি দেখলে?

—সাথীসাথ বহুৎসে ডাকাত আমাদের পাকড়ে নিলো ও রশিমে বাঁধিয়ে ফেললো।

—তা, তোমরা চেঁচালে না কেন?

—কি করে শোর মাচাবে, হুজুর? দো ডাকাত হামাদের পাশমে খাড়া রইলো। বোলা—চিল্লানেসে খতম করিয়ে দেব।

—হুঁ, বুঝেছি।

দারোগাবাবুর মনে তখন সন্দেহের ঘোর লেগেছে—মুখে তার আভাস ফুটে উঠেছে। এ লোক দুটোকে কি সত্যিই এমনি করেই ডাকাতেরা বোকা বানিয়েছে? না কি এরা কিছু রেখে ঢেকে বলছে? কিন্তু একটা গপ্পো বানাবার মতন বুদ্ধিশুদ্ধি এদের আছে বলে তো মনে হয় না। যা হোক এখুনি একটা কিছু সিদ্ধান্ত করে ফেলা উচিৎ হবে না। এদিকে লোকদুটীর তখন ভয়ে, ক্ষোভে প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা। কোনোরকমে তারা চোখের জল সামলাচ্ছে আর একান্ত অসহায় ভাবে বলে চলেছে আগাগোড়া তাদেরই ভাষায়। সে খেয়ালই এখন তাদের নেই যে দারোগাবাবু তাদের ভাষা পুরোপুরি বুঝছেন কি না।

—এতনাই, হুজুর, ঘট্‌না। হামলোককো বাঁচাইয়ে, জনাব। হামলোগোকো কয়েদ হোনেসে বালবাচ্ছা সব ভুখা মর যায় গা।

তাদের কাতর প্রার্থনায় দারোগাবাবুর মন ভিজলো কি না কে জানে। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—

হুঁ, সে পরে দেখা যাবে। এখন তোমরা যেতে পারো। কিন্তু চৌধুরী মশায়ের বাড়ী ছেড়ে এখন তোমরা কোথাও এক পা নড়বে না, বুঝলে?

লোক দুটী 'জী, হুজুর' বলে বাইরে চলে গ্যালো। চৌধুরী মশায় এতে করে মোটেই খুসী হলেন না। তিনি বড় আশা করে এসেছিলেন যে লোকদুটোকে ঘা-কতক দিলেই, সব কথা বেরিয়ে পড়বে। চাই কি তার টাকা ও কিছু উদ্ধার হতে পারে। কিন্তু দারোগাবাবু তো সেদিকই মাড়ালেন না। দারোগাবাবু তাঁর মনের কথা বুঝে একটু হেসে বল্লেন—

—ওদের সায়েস্তা করার কথা পরে ভাবলেও চলবে। এখন বলুন আপনার এতকালের বিশ্বাসী দারোয়ানেরা কোথায় ছিলো?

—সে বড়ই লজ্জার কথা, বড়বাবু। তাদের এমন কালঘুমে ধরেছিলো যে তারা নাকি কিছুই টের পায় নি। তাদের আমি তখুনি বরখাস্ত করে দিয়েছি।

—বুঝলাম। কিন্তু ডাকাতেরা আপনার ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকলো কি করে?

—দরজা আর ভাঙলো কোথায়? আমিই তো খুলে দিলাম।

—ব্যাপার কি বলুন তো? আপনার দারোয়ানেরা না হয় বোকা বনে সদর দরজা খুলে দিলো। আপনি কেন শোবার ঘরের দরজা খুলে দিতে গেলেন?

—সাধ করে কি আর দরজা খুলে দিয়েছি, মশাই? তখন যা অবস্থা তা আর আপনি কি বুঝবেন। হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হলো এবং অমন মজবুৎ দরজাটাও থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হলো —দরজা খোলো, নৈলে ভেঙেই ফেলবো।

—কি ভাষায় হুকুম হলো।

—ঐ রামভজন ও রাজেশ্বরদের ভাষায়।

—বেশ, তারপর?

—আমি একহাতে বন্দুকটাকে বাগিয়ে ধরে, অন্যহাতে দরজাটা যেই না খুলেছি, অমনি কয়েকটা যণ্ডামার্কা লোক আমার ঘাড়ের ওপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো। আমি নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিলাম, কিন্তু বন্দুক হাত থেকে বেবাক ছুটে গ্যালো। তারপর আর কি? ডাকাতের হুকুমে চাবিকাঠি যা যেখানে ছিলো বার করে দিলাম। আর আমারই

সামনে সিন্দুক খুলে ব্যাটারা আমার রক্ত জল করা টাকার বাণ্ডিলগুলো সব লুঠে নিলো। একেবারে রাস্তার ভিখিরি হয়ে গেলাম, দারোগাবাবু।

—অতো অধীর হবেন না, চৌধুরী মশায়। টাকা আবার আপনার হবে। কিন্তু ডাকাতরা ধরা না পড়লে বিপদের ভয় যে থেকেই যাবে।

—আর ধরা পড়েছে?

—আজ না হয় কাল ধরা তারা পড়বেই। আচ্ছা দলটা যে বাইরে থেকে এসেছিলো, তা আপনি কি করে বুঝলেন?

—সে বোঝাবার আর অসুবিধে কি? ব্যাটাদের চেহারা ও সাজপোষাক মোটেই এদেশী লোকের মতো নয়। কথা তারা বেশী বলে নি। দু'একটা কথা যা বলেছে, তা একেবারে রামভজনদের ভাষায়।

—আপনার পাড়ার লোকেরা এগিয়ে আসে নি?

—ডাকাতেরা তো প্রায় চুপিসাড়েই কাজ ফতে করেছে। পাড়ার লোকেদের তাই ভাতঘুমই বোধহয় ভাঙে নি।

—হুঁ,। এবার চৌধুরী মশায়, আসুন আপনার মামলাটা রুজু করে নিই। তারপর আপনার বাড়ী গিয়ে, সব নিজের চোখে দেখবো।

দারোগাবাবু লেখাপড়ার কাজ সেরে নিয়ে চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে পালকি করে চলে গেলেন। পেছনে পেছনে চললো দু'জন সিপাই এবং রামভজন ও রাজেশ্বর। চৌধুরী মশায়ের বাড়ীতে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখলেন। অনেককে অনেককিছু জিজ্ঞাসাবাদও করলেন। তারপরে হঠাৎ সেখান থেকেই একেবারে হলদিবাড়ী রওয়ানা হয়ে গেলেন। সিপাহীদের মুখে বড়বাবুর খবর শুনে থানার লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো—'আচ্ছা কাজ-পাগলা দারোগা বটে।'

॥ ৭ ॥

দারোগাবাবুর হলদিবাড়ী যাবার খবর শুধু যে থানার লোকেরা জানলো তাই নয়। সনাতনের কাছেও সে খবর পৌঁছোতে দেরী হলো না। সে মনে মনে হিসেব করে দেখলো যে হলদিবাড়ী থেকে তদন্ত সেরে ফিরতে দারোগাবাবুর বেশ কিছু সময় লাগবে। তার যেন তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। হাতজোড় করে মা কালীকে প্রণাম জানিয়ে সে একটা পুঁটলি হাতে করে ভেতর গড়ের দিকে রওয়ানা হলো। ডাকাতি করে সেদিন সর্দার প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা ঘরে তুলেছিলো। এই কয়েক ঘণ্টা তার

যে কি দারুণ ধুকপুকুনি গেছে তা মা কালীই জানেন। কে জানে হঠাৎ যদি দারোগাবাবু এসে হানা দিয়ে বসেন তাহলে? অবিশ্যি টাকাটা কিছু প্যাটরার মধ্যে ছিলো না যে দারোগাবাবু আসবেন আর টাকাটা বার করে ফেলবেন। কিন্তু দারোগাবাবু এলে যে সহজে ফিরে যাবেন না, সেটাও সর্দার জানতো। দরকার হলে ঘরদোর ছ্যাল সব কিছুই ভেঙে খুঁড়ে তছ নছ্ করে যাবেন। খড়ের চাল কেটে নামিয়েও তন্ন তন্ন করে দেখতে পারেন। তাহলেই তো চক্ষুচড়ক গাছ হয়ে যাবে। এখন যথেষ্ট সময় পাওয়া গেছে। দারোগাবাবু ফেবার আগে যা করার করে ফেলতে হবে। সর্দারকে আসতে দেখে তার দলবল এসে গোল হয়ে দাঁড়ালো। হাজার খানেক টাকা সকলকে ভাগ করে দেবার পর সর্দার মুখ খুললো—

—মা কালীর দয়ায় কাল তোরা সুভালাভালি কাজ সেরে ফিরে এসেছিস। দারোগাবাবু আজ পচাগড়ে নেই। এই সুযোগে টাকাটার বিলিব্যবস্থা করে ফেলা চাই।

—টাকাটা কাদের বিলি করতে হবে সর্দার?

—বৈরিগি পাড়ার চাষীরা গাছপাতা সেদ্ধ খেয়ে কোনো রকমে বেঁচে আছে।

—কেনো, সর্দার?

—সবাই তো আমাদের মতো ডাকাতি করতে পারে না এবারে তাদের জমিতে ফসল হয় নি বল্লেই চলে—ডাঙা জমি কি না। কে এখন তাদের খেতে দেবে? তাই না খেয়ে খেয়ে তারা একেবারে অস্তিচম্মোসার হয়ে গেছে।

—কিন্তু সর্দার বৈরিগিপাড়া তো বেশ বড়ো গোছের গাঁ। সেখানে থলি হাতে টাকা বিলোতে লাগলে যে হল্লা হয়ে যাবে। শেষে হাতে দড়ি না পড়ে।

—তোকে প্রেকাশ্যে দানছত্তর খুলতে কে বলেছে? বুদ্ধিতে একেবারে ব্যাটা যেন বেস্পতি। বরং কালুই থাক, ওর মাথায় ঘিলু বলতে তবু কিছু পদাত্থো আছে। কি বলিস্ কালু?

—বলাটলা আমার আসে না সর্দার। আমি শুধু জানি হুকুম তামিল করতে।

—বেশ, যা এই দুপুরেই টাকাটা গাঁয়ের চারজন মোড়লকে ভাগ করে দিয়ে আয়।

—সে আর বেশী কথা কি সর্দার। আমি এখুনি ভিখিরির ভেক ধরে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি। হাতে লাঠি কাঁধে ঝোলা।

—বটে। হাতে লাঠি থাকলে, লোকে সন্দেহ করবে না?

—মোটেই না। ভিখিরি যে আবার খোঁড়াও বটে। লাঠি ছাড়া সে হাঁটবে কি করে। তাছাড়া হঠাৎ কোনো ঝামেলা বেঁধে গেলে? হাতে লাঠি থাকলে এ বান্দা যমকেও ডরায় না।

সাবাস্।

—কিন্তু সর্দার, গোড়াতেই যে ঠেকে গেলাম। আমরা জঙ্গুলে মানুষ। ভিনগাঁয়ের চার-চারজন মোড়লকে খুঁজে বার করাই তো এক ঝকমারি।

—সে সব তোকে কিছু কত্তে হবে না। গাঁয়ের মধ্যে দেখবি একটা কালী মন্দির আছে। সেখানে একজন পুরুতঠাকুর থাকে। তার তিন কুলে

কেউ নেই। সে মার পেসাদ খায় আর মার থানেই পড়ে থাকে। তাকে গিয়ে চুপি চুপি টাকাটা দিয়ে দিবি, বুঝলি?

—বুঝলাম। তবে মন্দিরে তো বামুনপুরুত আরও দু' একজন থাকতে পারে? ঠিক লোকটিকে চিনে নেবার কিছু বুদ্ধি করে দাও, সর্দার?

—তুই হুঁশিয়ার লোক আছিস্, দেখছি? লোকটির বাঁ চোখের ভুরুর ওপর একটা জড়ুল আছে। হলো তো?

— এবার তাহলে হুকুম দাও, রওনা হয়ে যাই সর্দার।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। পুরুতঠাকুরকে কানে কানে বলে আসবি— "মায়ের পেণামি, সনাতন রায় পাঠিয়েছে।' সে তখন উত্তরে নিশ্চয়ই বলবে '—'জয় মা কালী '

—তাহলে আসি সর্দার ?

—হুঁ, একটু দাঁড়া। এতগুলো টাকা একথোকে দেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। হাজার দুই টাকা হলেই চলে যাবে। আর দু'হাজার টাকা তোরা রেখে দে। যা দিন কাল পড়েছে, কবে আমার কাজকম্মো জোটে কিছুই বলা যায়। হাতে কিছু টাকা থাকা ভালো।

সনাতন সর্দারের হুকুমে আরও দু'হাজার টাকা তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা ভাগ করে নিলো। খুসী একটু তারা হলো ঠিকই, কিন্তু অবাক ও কম হলো না। বাড়তি টাকা তো সর্দার চিরকালই দানধ্যানেই খরচা করেছে —তাদের হাতে কখনই তুলে দ্যায় নি। কিন্তু সর্দারের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কিছু বলতেও সাহস করলো না। কালুই সবার আগে সর্দারের হুকুম নিয়ে চলে গ্যালো। তাকে আবার ভিকিরির ভেক ধরে অনেক দূর যেতে হবে তো।

॥ ৮ ॥

সদানন্দ চক্কোত্তি কাল রাতে পচাগড়ে ফিরে এসেছেন। সকালেই উর্দি চড়িয়ে থানায় এসে বসেছেন। কিন্তু তাঁর মন ভালো নেই। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ যেন পাকাপাকি ভাবেই আঁকা হয়ে গেছে। এ কদিনে বয়সও যেন তাঁর কয়েক বছর বেড়ে গেছে। হলদিবাড়ীতে গিয়ে তিনি রতনপুরের মামলার কিছুই সুরাহা করতে পারেন নি। বরং ব্যাপারটা রীতিমত ঘোলাটে হয়ে গেছে। গদীর মালিকের কাছে জেনেছেন যে রামভজন ও রাজেশ্বর দু'জনই তাঁর বিশেষ বিশ্বাসী লোক। অনেকবারই তাদের হাত দিয়ে তিনি মোটা টাকা আনা নেওয়া করেছেন। কিন্তু কোনোদিনই তাদের সন্দেহ করার কোনো কারণ ঘটেনি। চৌধুরী মশায় তাঁর অনেকদিনের জানা লোক। তিনি এসে দু'জন বিশ্বাসী লোকের জন্যে মালিককে একেবারে ধরে পড়লেন। তাই তাঁর সেরা দুজন লোককেই তিনি তিনমাসের জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন।

থানা-পুলিশের ফ্যাঁসাদে পড়তে হবে জানলে তিনি চৌধুরীমশাইকে 'না' করে দিতেন। শিউপূজনও তাঁর একজন পুরোনো বিশ্বাসী লোক। সেদিন রাতে সে যে তাঁর গদিতেই পাহারায় ছিলো, এ কথা তিনি হলফ করেই বলতে পারেন। দারোগাবাবু শিউপূজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। পচাগড় থানার নাম সে জীবনেই শোনে নি। আর সে কি না যাবে রেতের বেলায় দূরবিদেশের জমিদার বাড়ীতে? সেটা যে সম্ভব নয়, তা দারোগা বাবুও বুঝলেন। কিন্তু ডাকাতিটা তা'হলে করলো কারা? সনাতনের দল, নয়তো? কিন্তু তারা শিউপূজনের নামই বা জানবে কি করে, আর দেহাতী হিন্দিতেই বা কথা বলবে কেন? বেশ, তা সনাতনকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করলেও তো হয়। তাতে তো দোষের কিছু নেই। এইসব আকাশ-পাতাল ভেবে দারোগা বাবু সনাতনকে ডেকে আনবার হুকুম দিলেন। দু'জন সিপাহী তাঁর হুকুম তামিল করতে চলে গ্যালো। দারোগা বাবু ভেবেই চলেছেন। সনাতনের অনেক ফন্দি ফিকির জানা আছে। ডাকাতিটাও হয়েছেও আবার ঠিক আমাবস্যের রাতে। কিন্তু আমাবস্যের রাতে ডাকাতি হলেই সেটাকে সনাতনের কীর্তি বলে ধরে নেওয়া যায় কি? দেখাই যাক না সনাতন কি বলে। এদিকে তাঁর মাসখানেকের ছুটির বিশেষ দরকার। বড় মেয়েটার বিয়ে আর না দিলেই নয়। খরচ-খরচার ভাবনা তো আছেই। কিন্তু পাত্রের খোঁজ খবর করারই বা ফুরসুৎ মিলছে কোথায়? থানার ঝামেলা সামলে কখন তিনি পাত্রের খোঁজ করবেন। তাই ছুটি নিয়েই এ সব ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে। কিন্তু এই অপয়া থানাতে তিনি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ডাকাতির হিড়িক পড়ে গেছে। ডাকাত ব্যাটারা তাঁকে যেন জানান দিয়ে বলছে—'এটা পচাগড়, পাটগ্রাম নয়। তোমার মতো অনেক দারোগাকেই এখানে ল্যাজে-গোবরে হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে।' ভাবতে ভাবতে তাঁর কান-মাথা গরম হয়ে যায়। সত্যিই কি তাঁকে মুখে চুনকালি মেখে পচাগড় থেকে বিদায় নিতে হবে? আজ কাল করে তিনি মেয়ের বিয়েও আর কতদিন ফেলে রাখবেন? কিন্তু ডাকাতি না থামাতে পারলে তিনি ছুটিই বা চাইবেন কি করে? তাই আগের কাজ আগেই করতে হবে। ডাকাতদের বিষদাঁত ভেঙে তারপর অন্য কাজ। কিন্তু ডাকাতদের দলকে দল যেন একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আবার মন তাঁর হতাশায় ভরে ওঠে। তবে কি ঐ করতোয়ার জলেই তাঁর সমস্ত সুনাম জলাঞ্জলি দিয়ে যেতে হবে? করতোয়া নামটার সঙ্গে তাঁর দাদুর

স্মৃতি জড়িয়ে আছে। দাদু ছিলেন পণ্ডিত লোক। তাঁর মুখেই ছোটো-বেলায় তিনি শুনেছিলেন করতোয়ার জন্ম কাহিনী। হর-পার্ব্বতীর বিয়ের সময়কার কথা। বরের হাতের জল ঝরে পড়লো মাটীতে। মাটীর বুকে নামলো স্বর্গের জলধারা। সেই জলধারার নামই হলো করতোয়া। দাদুই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কর মানে হাত, আর তোয় মানে হলো জল। শিবের হাত থেকে নেমে এসেছে বলেই করতোয়া পুণ্যসলিলা। এ সব কথা মনে হতেই কেমন যেন তিনি আন্‌মনা হয়ে গেলেন। অজান্তে নিজের হাত দুটী একবার কপালে ঠেকালেন। শিবের, দুর্গার না দাদুর উদ্দেশ্যে—কে জানে? এমন সময় সনাতনের গলার আওয়াজ শুনে তিনি চটকা-ভাঙা হয়ে উঠলেন। সনাতন তখন তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে ও বলছে—

—পেন্নাম হই, হুজুর।

—থাক্ থাক্ আর প্রণাম করতে হবে না।

—তা কি হয় হুজুর? আপনি হলেন বর্ন্নের গুরু।

—হুঁ অনেক কিছুই তোমার জানা আছে। শুধু ডাকাতি করা যে মহাপাপ এই সাদা কথাটাই জানা নেই।

—বললে আপনি পেত্যয় যাবেন না, হুজুর। যে ডাকাত্তির টাকা আমি গো-রক্ত ও বম্মো-রক্ত বলে মনে করি। আর হুজুরের চোখ ও চর তো এলাকার সব জায়গাতেই আছে।

—তা তো আছেই। কিন্তু লোকে যা বলে তাহলে সবই কি মিথ্যে?

—তারা নিশ্চয়ই বলে যে সনাতন শুধু আমাবস্যের রেতেই একটা করে ডাকাতি করে—তাই না, হুজুর?

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো তুমি?

—তাহলে, হুজুর, আমাবস্যের রেতে আমার ওপর নজর রাখলেই তো সমিস্যেটা মিটে যায়। আমার দুর্ণামটাও ঘোচে।

—কথাটা তুমি মন্দ বলো নি, সনাতন। আমি ভেবে দেখবো। তবে মনে রেখো সনাতন, যে তুমি যেমন ধুরন্ধর ডাকাত আমিও তেমনি নাছোড়বান্দা দারোগা। আচ্ছা—তুমি এখন এসো।

সনাতন আবার দারোগাবাবুকে প্রণাম করে চলে গ্যালো। দারোগা-বাবুর সেই একই ভাবনা। সত্যিই কি সনাতন তাহলে ডাকাতি করা ছেড়ে দিয়েছে?

॥ ৯ ॥

পচাগড় থানার গাঁয়ে-গঞ্জে বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। শীতের বিকেলে পড়ন্ত রোদে দারোগাবাবু ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। কোথাও মাঠ আলো করে ফুটে রয়েছে সরষে ফুল। কোথাও আবার বড় বড় কুমড়ো পাতার মতো ঝকে ঝকে সবুজ তামাক পাতার বাহার। দারোগাবাবু মাঝে মাঝে চোখ মেলে মাঠের দিকে তাকাচ্ছেন বটে। কিন্তু সে চাউনির সঙ্গে তাঁর মনের কোনো যোগাযোগ নেই। তিনি কেমন যেন অন্যমনস্ক। গাঁ ঘরের কাছাকাছি এলে তিনি অবিশ্যি হুঁশিয়ার সওয়ারীর মতো ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে চলছেন। গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে হুদ্দাড় করে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে ঘোড়া দেখতে। তাদের মা বোনেদেরও ঘোড়া দেখার সখ কম নয়। কিন্তু বাচ্চাদের সামলাতেই যে তাদের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে গেলে কি আর রক্ষে থাকবে? ছেলে মেয়েদেরই বা দোষ কি? এমন সুন্দর ঘোড়া পাড়াগাঁয়ে তো আর হট্ বলতেই দেখা যায় না। বাদামী রঙের ইয়া বড়ো এক ঘোড়া। গা দিয়ে যেন তেল পিছলে পড়ছে। আর কি সুন্দর চাবুকের মতন গড়ন পেটন—শরীর থেকে তেজ যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। ঘোড়ার সাজপোষাকই বা কি জমকালো? তুলকি চালে চলেছে ঘোড়া। দারোগাবাবু তালে তাল মিলিয়ে ঠিক যেন কলের পুতুলের মতো ঘোড়ার পিঠের ওপর উঠছেন আর বসছেন। মাতব্বর গোছের লোকেরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দারোগাবাবুকে নমস্কার জানাচ্ছেন। কিন্তু দারোগাবাবুর কোনদিকেই যেন খেয়াল নেই। গাঁ ঘর পেরিয়ে মাঠে পড়লেই ঘোড়ার রাশ তিনি আলগা করে দিচ্ছেন। ঘোড়া তখন ইসারা পেয়ে ধূলোর ঝড় তুলে জোর কদমে ছুটছে। শীতের বিকেলের আর আয়ু কতক্ষণ? দেখতে দেখতে সন্ধ্যের ছায়া নামার সময় এগিয়ে আসছে, হাওয়াতেও লাগছে শীতের ছোঁয়াচ। এবার যেন দারোগা হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠলেন। তাইতো! আর কিছু পরেই নামবে ধোঁয়াটে সন্ধ্যে। তার ওপর আমাবস্যের রাত্তির। সন্ধ্যে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঘর-বাড়ী, খেত-খামার ও বন-জঙ্গল সব কিছুই কালো আঁধারে ডুবে যাবে। তার আগেই জায়গামতো গিয়ে পৌছানো দরকার। তেজেই ছুটছে ঘোড়া। খেত-খামারে দিনের কাজ শেষ করে চাষীরা বাড়ীর দিকে হাঁটা দিতে শুরু করেছে। ধান ঝাড়াই-মাড়াই'এর

কাজও শেষ করতে যেন সব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দারোগাবাবু ভাবছেন সকলেরই কাজ আজকের দিনের মতো শেষ। এখন কেউবা হাত পা মেলে বিশ্রাম করবে। ছেলেপুলেদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেও কেউ কিছুটা সময় কাটাবে। যাদের সখ আছে তারা তাস দাবায় বসে যাবে। বুড়ো বুড়ীরা কাছ পিঠে নামগান হলে সেখানেই গিয়ে হাজির হবে। কিন্তু দারোগাবাবুর বরাতে সবই উল্টো। তিনি চলেছেন ঘর ছেড়ে—এক ডাকাতের খোঁজে। মাথায় তাঁর একরাশ দুশ্চিন্তার বোঝা। দু'দুটো বড়ো গোছের ডাকাতি হয়ে গ্যালো। কিন্তু একটা ডাকাতেরও তিনি টিকির নাগাল পেলেন না। আজ আমাবস্যের রাতে আবার একটি ডাকাতি হলে লজ্জা আর রাখবার জায়গা থাকবে না। সনাতনকে আজ যেভাবেই হোক নজরবন্দী করে রাখতে হবে। তার গায়ে হাত তোলবার মতো কোনো প্রমাণই দারোগাবাবুর হাতে নেই। তবুও তাঁর স্থির বিশ্বাস যে দু'দুটো ডাকাতিই সনাতনের কীর্তি। ডাকাতি দুটোর কোনোটাতেই কেউ বাড়ীর মেয়ে ছেলেদের গায়ে হাত দ্যায় নি, কাউকেই বিশেষ মারধোর করেনি এবং নগদ টাকা ছাড়া আর কিছুই ছোঁয় নি।

ডাকাতেরা একেবারে মিহি হাতে কাজ সেরেছে। হৈ হৈ রৈ রৈ নেই, মশালের জৌলুশও নেই বললেই হয়। কাজের নমুনার মধ্যে তিনি তাই যেন সনাতনের হাতেরই কারিগরি দেখেছেন। এখন তিনি চলেছেন সনাতনের আস্তানার দিকে. নিজেই আজ তার ওপর নজরদারী করবেন।

এদিকে সনাতনের ভাবনাও কিছু কম নয়। সিপাই দু'জন আগেই পৌঁছে গেছে। সনাতন জেনেছে যে দারোগাবাবুও আসছেন। কোথায় যে তিনি বসবেন, কিই বা খাবেন তিনি—এসব সাত-পাঁচ চিন্তা তো আছেই। কিন্তু আসল দুর্ভাবনা হলো দারোগাবাবুর এখানে থাকা নিয়ে। সত্যিই কি তিনি সারারাত তার ঘরেই কাটাবেন। তাহলে সনাতন আজ রেতে কি আর নিজের কাজে বেরোতে পারবে?

কিন্তু আজ যে তার জীবনের শেষ কাজ। এ কাজটা ভালোভাবে হাসিল করতে না পারলে তো চলবে না। এক সৎ বামুনের মেয়ের বিয়েই যে তাহলে আটকে থাকবে। মাথা গরম হয়ে গ্যালো সনাতনের। এক ফাঁকে সে সিপাইদের বলে একটা পাঁঠা আনতে চলে গ্যালো। পাঁঠা নিয়ে যখন সে ফিরলো তখন যেন তার মন থেকে ভাবনার মেঘ সরে গেছে। সন্ধ্যেও তখন নেমেছে। গাঁ ও মন্দির থেকে শাঁখ ও কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ

ভেসে আসছে। এমন সময় দারোগাবাবুও ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হলেন। সনাতন দৌড়ে এসে ঘোড়া ধরে দাঁড়ালো। দারোগাবাবু ঘোড়া থেকে নামলেন। সনাতন তাঁর অনুমতি নিয়ে ঘোড়াটার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে চলে গ্যালো। ফিরে এসে আবার সেই যাকে বলে গড় হয়ে দারোগাবাবুকে প্রণাম করে বললো—

—আজ বড়ো সুবোক্ষণেই আমার রাত প্রেভাত হয়েছিলো। এই অধমের বাড়ীতে যে হুজুর দয়া করে থাকবেন—এটা কি আমার কম সৌভাগ্যির কথা।

সনাতনের কথাবার্তা শুনে আবার দারোগাবাবুর মনে সন্দেহের দোলা লাগে। ভয় বা ভাবনার কোনো ছাপই নেই সনাতনের মুখে। তা'হলে কি তিনি বেকুবের মতই সনাতনের পেছনে ঘুরে মরছেন? শেষে তিনি নিজের মনকে বোঝালেন যে রাতটা এখানে কাটালেই তো পরিষ্কার জানা যাবে যে সনাতন এখন ডাকাতি করে কি না। মুখে তাই হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন—অতিভক্তিটা কিসের লক্ষণ, সনাতন?

—চোরের, হুজুর ডাকাতের নয়। তা সে যাকগে, হুজুরের সেবার কি ব্যবস্থা করবো?

—না, না। সে সব নিয়ে তোমাকে ঝামেলা করতে হবে না। আমার খাবার আমি নিয়েই এসেছি।

—আপনার মতো সৎ বেরাম্ভনের সেবা না করলে যে নরকেও আমার জায়গা হবে না, হুজুর। তাছাড়া আপনার সিপাহীদেরও তো খাবার ব্যবস্থা করতে হবে, হুজুর?

—আচ্ছা, সে যা হয় হবে। তোমার কাজ তুমি তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নাও, দেখি! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দারোগাবাবু সনাতনের ঘরের চৌকীর ওপর বসে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলো। সনাতন তখন পাঁঠা মেরে রান্নার উয্যুগ করছে। দারোগাবাবু ভাবতে ভাবতে কখন যে হাত-পা মেলে শুয়ে পড়েছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। এতোটা লম্বা পথ ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন। তার একটা ক্লান্তি তো আছে। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সব চিন্তা-ভাবনারও তাঁর তখনকার মতো শেষ হলো। সনাতনের ডাক শুনে যখন তিনি চমকে উঠে বসলেন তখন রাত বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। রান্না মাংসের গন্ধে বাতাসও ভারী হয়ে উঠেছে। খিদেতে তখন দারোগাবাবুর

নাড়ী যেন চুঁই চুঁই করছে। সনাতন বলছে—দয়া করে এবার উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিন, হুজুর। কাপড়টাও বদলে ফেলুন।

দারোগাবাবু প্রশ্নভরা চোখ তুলে তাকালেন। সনাতন তাঁর মনের কথা বুঝে নিলো—

—আমার পরা কাপড় কি হুজুর কে দিতে পারি? আপনারই ঘোড়ার পিঠে দেখি একটা ঝোলা। সেটার মধ্যেই এই কাপড়টা ও খাবারের কৌটো ছিলো। আপনার সিপাই-শান্ত্রীদের খাওয়া দাওয়া চুকে বুকে গেছে। একটু বিশ্রাম করছিলেন বলে, আপানাকে আর বিরক্ত করিনি। এবার উঠুন, হুজুর।

দারোগাবাবু উঠে কাপড় বদলে হাতমুখ ধুলেন। সনাতন একেবারে ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে ঘুরছে। পাড়াগাঁয়ের প্রাণ-খোলা অতিথি-সেবার যেন এক নিখুঁত ছবি এঁকে চলেছে সনাতন। দারোগাবাবুর ভাবতেও আর ভালো লাগছে না যে এই লোকটাই রাতের অন্ধকারে ডাকাতি করে বেড়ায়। তিনি খেতে বসে নিজের আনা খাবারই খেলেন। তবে পাছে আবার সনাতন কিছু মনে করে এই ভেবে রান্না মাংসও একটু চেখে দেখলেন। সাদা-সিধে রান্না, কিন্তু স্বাদ বেশ ভালোই লাগলো তাঁর। দু' এক টুকরো মাংস তৃপ্তি করে খেলেন। তারপর হাতমুখ ধুয়ে সনাতনের ঘরে এসে বসলেন। সনাতনকে ছেড়ে দিলেন। ডান-হাতের ব্যাপারটা তাকেও তো সেরে নিতে হবে। খাওয়া দাওয়ার পর সনাতন এসে পাশে বসলে দারোগাবাবু কথা শুরু করলেন আমার ঘড়িতে এখন সাড়ে দশটা বাজে। এমন সুন্দর আমাবস্যের রাতটা তোমার এবার পণ্ডই হলো দেখছি।

—আমাবস্যের রাত আসবে যাবে। কিন্তু হুজুরের মতো কেউ-কেটা লোক এ অধমের কুঁড়েতে কবে কোনদিন রাত কাটিয়েছেন? যদি আজ্ঞা করেন, তবে হুজুরের একটু পদসেবা করার ইচ্ছে আছে।

এই কথা বলে সনাতন হুকুমের অপেক্ষা না করেই হুজুরের পা টিপতে আরম্ভ করে দিলো। দারোগাবাবুর ওজর আপত্তিতে কোনো কাজই হলো না। পা-টিপতে টিপতে সনাতন পচাগড় থানার অবনী দারোগার গল্প বলে চলে। এলাকায় ডাকাতি হলেই তিনি সব দাগী আসামীদের এত্তেলা পাঠাতেন—'থানায় হাজির হয়ে যাও।' থানার ঘরে পুরে দরজা বন্ধ করে অবনী দারোগা তাদের সমঝে দিতেন—'এলাকায় ডাকাতি হচ্ছে, আর তোমরা ন্যাকা সেজে বসে আছো। কেউ কিচ্ছু জানো না, নয়? ওসব

কথায় চিঁড়ে ভেজে না। সাত দিনের সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি ডাকাতদের খোঁজ দিতে পারো তো ভালো। না হলে বেছে বেছে তোমাদের জনকয়েককে চালান করে দেবো। সোজা আঙ্গুলে কবে আর ঘি উঠেছে?' দারোগাবাবুর শাসানিতে অনেক সময়েই কিন্তু কড়া দাওয়াই'-এব কাজ হতো। দাগী বেচারিরা প্রাণের দায়ে ডাকাতদের খোঁজে লেগে

যেতো। তারা এককালে নিজেরাই ডাকাতি করেছে। কাজেই ডাকাতদের তাগ্‌বাগ? তাদের অজানা নয়। তাই লেগে পড়ে থেকে তারা মাঝে মধ্যে সাচ্চা খবর দিয়ে দারোগাবাবুর মান বাঁচিয়ে দিতো। এ সব কায়দাকরণ সদানন্দ চক্কোত্তি যে জানেন না, তা নয়। তিনি হেসে বললেন—

—অর্থাৎ অবনী দারোগা দাগী আসামীদের নিয়ে একটা গোয়েন্দাদের দল গড়েছিলেন! বেশ, আমিও অবনী দারোগার পথ ধরতে রাজী আছি। কিন্তু তোমাকেই তাহলে হতে হবে সর্দার—গোয়েন্দা বা গোয়েন্দা-শিরোমণি?

—তা হুজুর, যদি এই অধমের ওপর ভরসা রাখেন, তাহলে চেষ্টা-চরিত্তির করে দেখতে পারি।

লোকটা বলে কি? সত্যি বলছে না ঠাট্টা করছে? সনাতনের দিকে

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন দারোগাবাবু। সনাতনের মুখে ঠাট্টাবিদ্রূপের লেশমাত্রও চিহ্ন নেই। আবার তিনি ভাবনায় পড়লেন। তাহলে কি সত্যিই সনাতন ডাকাতি করা ছেড়ে দিয়েছে? সনাতনের গলার আওয়াজ শুনে তাঁর চমক ভাঙলো—

—মন খারাপ করবেন না, হুজুর' 'দু'একদিনের মধ্যেই আপনি আসামীদের সব খবরই পেয়ে যাবেন।

—কে দেবে সে সব খবর? তুমি?

—তা মা কালীর যদি দয়া হয়, তাহলে তাই হবে। মা তো বুঝতেই পারছেন যে হুজুর বড়ই আতান্তরে? পড়েছেন। তাই মা নিশ্চয়ই কৃপা করবেন।

সনাতনের সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে রাত যে অনেক হয়ে গেছে সেটা আর দারোগাবাবু খেয়াল করেন নি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তে হুঁস হলো। রাত প্রায় বারোটা বাজে। তিনি হিসেব করে দেখলেন যে এরপর বেরিয়ে আর সনাতনের পক্ষে ডাকাতি করা সম্ভব নয়। কাজ তো কম নয়। দল জোটাতে হবে, কালীপুজো সারতে হবে, যেতেও হবে কমসে কম পনেরো-বিশ মাইল—নিজের ডেরার পাশের গাঁয়ে কি আর ডাকাতি করে কেউ? ডাকাতি করতেও বেশ খানিকটা সময় লাগবে, তারপর লুঠের মাল ভাগাভাগি করে ফিরেও আসতে হবে এতোটা পথ। পাড়া-ঘরের লোক কাক-ভোরেই উঠে খেতে-খামারে কাজ করতে বেরিয়ে যায়। তার আগেই যত কিছু কাজ আছে সবে সেরে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফেরা বড়ো চাড্ডিখানি কথা নয়। তাই তিনি সনাতনকে বললেন

—সনাতন. রাত অনেক হলো। এবার তুমি শুতে যাও।

—হুজুর ঘুমিয়ে পড়লেই, আমি শুতে যাবো।

সনাতন মুখে কথা বলছে বটে, কিন্তু হাতদুটো তার ঠিকই চলেছে। দারোগাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর চোখের পাতা বুজে এলো এবং তারপর একসময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ঘুম ভাঙলো, তখন চারদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। শীতের হিমেল হাওয়া বইছে। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন তিনি। সনাতন এক ফাঁকে বেরিয়ে যায় নি তো? ঘরের বাইরে যেতে গিয়ে দ্যাখেন যে সেই একফালি বারান্দাতে শুয়েই সনাতন দিব্যি নাক ডাকিয়ে

ঘুমোচ্ছে। তাই দেখে দারোগাবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভাবলেন সনাতনকে এখুনি ডেকে দরকার নেই; ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। তিনি নিজে ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন। সিপাইরা সব ভোর ভোর উঠে কাজকম্মো সেরে তৈরী হয়ে গ্যাছে। খবর পেয়ে পাশের মহল্লা থেকে দু'জন চৌকিদার এসেছে—কে জানে দারোগাবাবুর কোনো হুকুম হাকিম আছে কি না? এমন সময় সনাতনের ঘুম ভেঙে গ্যালো। ধড়মড়িয়ে উঠে সে ঘরে ঢুকে দ্যাখে যে দারোগাবাবু একদম তৈরী। কাঁচমাচু হয়ে সে বলে—রেতে ঘুম হয়েছিলো তো হুজুর, আমার পোড়া চোখে এমন ঘুম নামলো, যে হুজুর কখন উঠলেন, তা কিছুই জানি না।

—তাতে কি হয়েছে? আমি বেশ যুৎ করেই রাতে ঘুমিয়েছি। এখন তবে যাই, সনাতন?

—হুজুর কিছু মুখে না দিয়েই চলে যাবেন?

—আমায় এখুনিই যেতে হবে, সনাতন। থানায় অনেক কাজ ফেলে এসেছি। তুমি তাড়াতাড়ি ঘোড়া লাগাও, সনাতন।

ঘোড়ার পিঠে জিন কষতে যা দেরী। তারপরই সনাতন ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির। দারোগাবাবু ঘোড়া ধরলেন। সনাতন আবার গড় হয়ে প্রণাম করে বললো—আপনার আসাতে আমি যে কতো কেতাথো হয়েছি হুজুর, তা আর বলার নয়। দারোগাবাবু ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে দেখলেন যে, ঘোড়ার গা যেন কেমন ঘামে ভেজা, আর খুরে লেগে রয়েছে সরষে ফুল। চকিতে সনাতনের দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলেন তার মুখে হাসি, কিন্তু চোখে জল। ভাবলেন কে জানে হয়তো চৌকিদারেরা ঘোড়াকে সকালে খানিকটা ছুট করিয়েছে,—মানে ঘোড়াটাকে ব্যায়াম করিয়েছে আর কি! এই ভেবে তিনি আর দেরী না করে ঘোড়াকে চলতে ইসারা করলেন। দু'এক পা হেঁটেই ঘোড়াটি দুলকি চালে এগিয়ে চললো। সনাতন হাত জোড় করে বিদায় জানালো দারোগাবাবুকে। সিপাই ও চৌকিদার দুজন দিলো তাদের কায়দামাফিক স্যালুট। তারপর চৌকিদারেরা চলে গ্যালো তাদের মহল্লায় আর সিপাই দুজন হাঁটা পথে ফিরে চললো থানার দিকে।

থানায় ফিরে দারোগাবাবু সোজা চলে গেলেন তাঁর সরকারী বাসায়। কাজকম্মো সেরে তৈরী হয়ে এসে যখন তিনি থানায় বসেছেন, তখন বেশ চড়চড়ে রোদ উঠে গেছে ; করতোয়ার জলে ও রোদ্দুরে ঝিকিমিকি খেলা শুরু হয়েছে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা ঘোড়া ঢুকলো থানার হাতায়। সওয়ারকে দেখে দারোগাবাবুর মুখ শুকিয়ে গ্যালো। বিশালাক্ষীপুরের নামকরা ব্যবসায়ী নিতাই সরকার সাত-সকালে থানায় কেন? যাহোক, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

—নমস্কার নিতাইবাবু! তা খবর সব ভালো তো?

—আর, ভালো! কাল রাতে ডাকাতেরা আমার যথাসব্বস্বো লুঠে নিয়ে গেছে।

শুনে দারোগাবাবু যেন নিজের অজান্তেই ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। নিতাইবাবুও বসে বলতে লাগলেন—

—পরশু রাতে ম'শায়, হাজার ছয়েক টাকা যোগাড় করে আনি। পরশু আর কাল এই দুটো রাতই টাকাটা আমার কাছে ছিলো। তা ব্যাটারা ঠিক টের পেয়েছে! এখন আমায় দাঁড়িয়ে বে-ইজ্জৎ হতে হবে।

—সে কি?

মহাজনের গদীতে টাকাটা যে আজই পাঠাবার কথা। এখন আমি মাথার চুল ছিঁড়ি, না ডাক ছেড়ে কাঁদি, আপনিই বলুন বড়বাবু?

—আপনি ভেঙে পড়বেন না, নিতাইবাবু। আমিও আর লজ্জা রাখবার জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে ব্যবসায়ে আপনার সুনাম আছে। মহাজন সব কথা শুনলে, আপনাকে সময়ও দেবেন। কিন্তু আমার কথা কে শুনবে?

—কেন, হুজুর? আমি তো আছি আপনার ছিচরণের দাস!—এই বলে সনাতন ঘরে ঢুকে দারোগাবাবুকে প্রণাম করে দাঁড়ালো। দারোগাবাবু সনাতনকে দেখে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু মনের ভাব চেপে গম্ভীর ভাবে বললেন—

—একী! সনাতন. তুমি? এত তাড়াতাড়ি কি করে এলে?

বলছি, হুজুর। আগে একটু দম নিয়ে নিই।—

এই কথা বলে সনাতন চোখের ইসারায় নিতাইবাবুকে দেখিয়ে দিলো।

দারোগা বুঝলেন যে সনাতনের কাছে খবর আছে। তিনি নিতাইবাবুকে বললেন—

আমায় যদি দু-দণ্ডো সময় দেন, নিতাইবাবু! সনাতনের সঙ্গে আমার জরুরী একটা কথা আছে। আপনি বরং থানার ইনস্‌পেকশন্‌ ঘরে বসে একটু জিরিয়ে নিন—এতোটা পথ ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন! সনাতনের কীর্তি-কাহিনীর কথা নিতাইবাবুও শুনেছেন। তাই তার সঙ্গে বড়বাবুর মাখামাখি দেখে তিনি রীতিমত হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু কি আর বলবেন? বড়বাবুর হুকুমে ইতিমধ্যে একজন সিপাই এসে হাজির হয়েছে। তিনি তার পেছনে পেছনে চললেন।

এদিকে সনাতন তখন পরনের কাপড়ের গেঁজে থেকে একরাশ নোটের তাড়া বার করে বড়বাবুর পায়ের তলায় রেখে বলছে—

'পেন্নামি বলেই নিন হুজুর। মেয়ের বিয়ে দিন। আমারও পাপের কিছুটা প্রাচিত্তির হোক'।

শুনে দারোগাবাবুর মেজাজ যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো। কিন্তু রাগ সামলাবার শিক্ষা তার আছে। তিনি ইস্পাতের মত কঠিন গলায় বললেন—

—সনাতন, তোমার সাহসেরও দেখছি শেষ নেই। কবে আমি তোমার কাছে মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকা চেয়েছি?

—আমি কি তাই বলেছি হুজুর? এখনও যে চন্দ্রোস্যূয্যি উঠছে! আপনার মতো লোককে অপবাদ দিলে জিভ খসে পড়বে না?

—তবে কেন তুমি আমাকে টাকা দিতে এসেছো? আর এতো টাকা তুমি পেলেই বা কোথায়?

—কাল রেতে ঐ নিতাইবাবুর বাড়ী থেকেই এই টাকাটা যোগাড় করেছি।

ঘরের মধ্যে যেন আচম্‌কা বাজ পড়লো। সনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন দারোগাবাবু। সেখানে ছলনার কোনো ভাবলেশই নেই। বরং তার চোখ দুটো যেন জলে ভরে উঠেছে। বোজা গলায় সনাতন শুরু করলো—

—আমার খবর ছিলো যে আপনি টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না। এদিকে আবার মা কালী স্বপ্নে আমায় আদেশ দিয়েছেন 'সনাতন, পাপের বোঝা তোমার পুন্ন হয়েছে। এবার প্রাচিত্তিরের উয্যুগ

করো।' তাই ঠিক করলাম যে এই শেষ ডাকাতি। হুজুরের পায়ে ডাকাতির টাকা কটা ফেলে দিয়ে সব কথা বলে খালাস হবো। তারপর, হুজুরের বিচারে যা হয়, তাই মাথা পেতে নেবো।

—কিন্তু ডাকাতিটা তুমি করলে কখন ?

—কাল সন্ধ্যের ঝোঁকে সিপাইদের দেখে ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম আমার শেষ কাজে কি বাধা পড়বে ? শেষে ভেবে চিন্তে পাঁঠা যোগাড় করার ছল করে বেরিয়ে পড়লাম। এক ফাঁকে সাঙ্গোপাঙ্গোদের টিপে দিয়ে এলাম—'তোরা সব নিতাইবাবুর বাড়ীর কাছে-পিঠে থাকবি। আর হরবোলা থাকবে কালীতলায়। আমি ঠিক সময়ে জায়গা মতো পৌঁছে যাবো। শেয়ালের ডাক শুনলে সব নিতাইবাবুর সদর দরজার সামনে এসে জড়ো হবি।'

—তোমাদের দলে একজন হরবোলা আছে নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর ! সেই তো চৌধুরীবাবুর নতুন দুজন দারোয়ানকে ধোঁকা দিয়েছিলো।

— তাহলে চৌধুরী বাড়ির ডাকাতিটাও তোমরা করেছিলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। প্রথমে বিশালাক্ষীপুরের ডাকাতিটার কথা সেরে নিই। হুজুর ঘুমিয়ে যখন পড়লেন, তখন রাত পেরায় বারোটা। হাতে আর সময় কৈ ? শেষে মা কালীই বুদ্ধি দিলেন। যা হয় হবে বলে আপনার ঘোড়ার ওপরেই চেপে বসলাম।

—ওঃ হো, তাই সকালে দেখলাম যে ঘোড়ার গা ঘামে ভেজা, আর খুরে লেগে রয়েছে সরষে ফুল। কিন্তু তোমার নিজেরই তো একটা ঘোড়া আছে।

—তা আছে হুজুর। তবে হুজুরের ঘোড়ার জাত আলাদা, তেজও অনেক বেশী। সে যাক্ হুজুর। একেবারে সোজা গিয়ে কালীতলায় দেখলাম যে হরবোলা হাজির আছে। প্রথমে ভক্তিভরে পুজো সেরে বললাম—'মা, এই আমার শেষ কাজ, মুখ রেখো মা।' তারপর হরবোলাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে ঘোড়া হাঁকালাম।

—বলো কি ? দু-দুজনে ঘোড়ার পিঠে চেপে গেলে ?

-হরবোলা, হুজুর, একেবারে সেই তালপাতার সেপাই। আর আমার গায়েও গত্তি বলতে বিশেষ কিছু নেই। তা ঘোড়া বটে হুজুরের। একেবারে যেন বাতাসের বেগে ছুটে চললো। পৌঁছেও গেলাম ঠিক

সময়ে। হরবোলার গলায় শ্যালের ডাক শুনে আমার দলবল সব এসে জড়ো হলো। সদর দরজা খোলাই ছিলো। আমরা স্রেফ দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম।

—অবাক কাণ্ড! কিন্তু সদর দরজা খুলে রেখেছিলো কে?

—সে আমাদেরই একজন লোক। সহিস সেজে সে বাবুর বাড়ীতে চাকরী করতো।

—সত্যিই তোমার বাহাদুরী আছে, সনাতন। তা এসব ফন্দী আঁটলে কবে?

—হুজুরের কিছুই অজানা নেই। আমি মাসে মাত্তর একটা ডাকাতি করি। অনেক দিন ধরে সব দিকে বেয়ে ছেয়ে দেখে তবে কাজে নামি। নিতাইবাবুর বাড়ীতে ডাকাতি করার ফন্দিটা আমার মাথায় আসে, গেলো জলপেশের মেলায়।

—সব কথা বেশ খোলোসা করে বলো?

—জলপাইগুড়ির জলপেশের মেলায় যাবার ইচ্ছে আমার অনেক কালের। কিন্তু শিবোরাত্তিরের উপোস করি বলে যাওয়া আর হয় না। তাই ধুত্তোর বলে গেলোবারে বেড়িয়েই পড়ল্যাম। তা মেলা বটে একটা হুজুর। হাজারে হাজারে লোক, আর কতই না হরেক রকমের দব্বো

সামগ্রী। চোখ যেন ঠিকরে পড়ে। আর দেবতার থানের গুণও আছে, হুজুর।

—বুঝলাম। আসল কথায় এসো।

—মাপ করবেন, হুজুর। মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। সব কথা গুছিয়ে বলার ক্ষ্যামতা কোথায়? তা বাবা মহাদেবকে গড় হয়ে পেন্নাম সেরে ঘুরছি, এমন সময় নিতাইবাবুর বাজার সরকারের সঙ্গে দেখা। শুনলাম বাবুদের এখন খুব উঠতি অবস্থা। তাই সে দুটো ভুটানী ঘোড়া কিনতে এসেছে। গেলাম তার সঙ্গে। দু'দুটো চমৎকার ভুটানী ঘোড়া কিনে সে চলে গ্যালো।

—তা তুমিও কিনলে না কেন একটা?

—আমি গরীব মানুষ? আর একটা ঘোড়া তো আমার আছেই। সেখানে একটা অদ্ভুত জন্তু দেখলাম হুজুর—ছ'শিংওয়ালা ভেড়া। সে যাক তখনই ভাবলাম যে আনকোরা ঘোড়াকে তালিম দেবার লোক কি আছে নিতাইবাবুর। ফিরে এসে খোঁজখবর নিয়ে হরেকে পাঠিয়ে দিলাম।

—হরে, আবার কে?

—আমার একজন স্যাঙাত, হুজুর ঘোড়াকে তালিম দিতে তার জুড়ি মেলা ভার। সে গিয়ে সহিস সেজে নিতাইবাবুর চাকরীতে বাহাল হয়ে গ্যালো। তার কাজকম্মেও বাবুও খুব খুশী

—কিন্তু সে যে অনেকদিন আগেকার কথা

—আজ্ঞে, হুজুর। আমি হুজুর ধীরে সুস্থে কাজ করা পছন্দ করি। পরশু সে এক ফাঁকে এসে জানালো যে মহাজনের গদীতে পাঠাবার জন্যে বাবুর এককাঁড়ি টাকার প্রয়োজন। আজকালের মধ্যেই টাকাটা তাঁকে যোগাড় করতেই হবে। ব্যস্, সব কথা পাকাপাকি করে সে চলে গ্যালো।

—তারপর?

—তারপর আর কি হুজুর? একবার বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে পারলে আর রোখে কে? দারোয়ানরা সব ঘুমিয়ে একেবারে কাদা। তাদের বেঁধে ফেলে আসল ঘরের দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। ভয়ের চোটে দরজা খুলে দেবার পথ পেলেন না নিতাইবাবু। সিন্দুকের চাবিও হাতে তুলে দিলেন মুখে শুধু সেই এক কথা—'বাবা সকল, আমাদের পেরাণে মেরো না।' চটপট কাজ হাসিল করে আপনার ঘোড়ায় চেপেই ফিরে এসে বারান্দায় পড়ে ঘুম দিলাম। আসার সময় অবিশ্যি হরবোলা হেঁটেই এসেছে।

—সাবাস্!

চৌধুরী বাড়ীর ঘটনা তো আপনি বাবুর মুখেই শুনেছেন।

—তা শুনেছি বটে! কিন্তু দারোয়ানদের নাম, তার হলদীবাড়ীর দোস্তের নাম ও তার গলার আওয়াজ তোমরা জানলে কি করে?

—সেটা আর এমন কি সমিস্যে হুজুর? হলদিবাড়ী এমন কিছু দূর বিদেশ নয়। খবরাখবর সেখানে থেকেই পেয়ে গেলাম। আর এরা সব সাদাসিধে ভুলেভালে মানুষ। মনে পাপ নেই তো, তাই রেখে ঢেকে কথা বলতে শেখেনি। গাঁয়ের নাম ধাম সব কিছু তারাই বলে দিয়েছে। তাদের বাবাটা মোটামুটি রপ্ত করতে অবিশ্যি আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো। তবে, হুজুর কথা আমরা দুচারটেই মাত্তর বলেছি।

—হুঁ। কিন্তু হিন্দী বুলি বলার ঠেকাটা কি পড়েছিলো তোমাদের?

—গোস্তাকি মাফ করবেন, হুজুর। চৌধুরী মশায়কে ও হুজুরকে ধাপ্পা দেবার জন্যেই এই কারসাজি।

—কিন্তু সে ধাপ্পাবাজি আমার কাছে ধোপে টেকে নি। আমি হলদিবাড়ীতে গিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম যে ডাকাতের দল কিছু ভিন দেশ থেকে আসেনি। হাঁদাকান্ত দারোয়ান দুটোকে কেউ বোকা বানিয়েছে শিউপূজনের নাম করে আর হিন্দী বুলি বলে ধোঁকা দিয়েছে চৌধুরী মশায়কে। কিন্তু একটা কথা, সনাতন। দলের একজন লোক তো পাঁচিল টপকে ভেতরে গিয়ে সদর দরজা খুলে দিতে পারে। তাই বলছি দরজা খোলার জন্যে এতো কাঠ-খড় পোড়ানোর দরকারটা কি?

—না, হুজুর, কাজটা কিন্তু অতো সহজ নয় এ সব বাড়ির খাড়া পাঁচিল টপকানো কি যে সে কথা! আমাবস্যের অন্ধকারে বিপদ যে ওৎ পেতে বসে থাকে, হুজুর। তারপর দেউটিতে দারোয়ানেরা জেগে থাকলে তো কেলেঙ্কারির একশেষ। তারা ঘুমিয়ে থাকলেও লাফানির ধুপ-ধাপ আওয়াজে জেগে যেতে পারে।

—বুঝেছি। তারপর হৈ হল্লা শুনে বাড়ীর কর্তা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বন্দুক চালালেই তো তোমাদের দফারফা।

—তবেই, বুঝুন হুজুর এ সব ফালতু ঝুট-ঝামেলা ডেকে এনে লাভ কি?

—রামচন্দ্রপুরের ডাকাতিটাও কি তোমরা করেছিলে?

—হুজুর ঠিকই ধরেছেন। হুজুর বোধ হয় আন্দাজও করেছেন যে সেখানে বাড়ীর নতুন চাকরটা ছিলো আমাদেরই চর।

—একটা সাক্ষাৎ শয়তান তুমি? তা, রামচন্দ্রপুর ও রতনপুরের ডাকাতির টাকা কি এর মধ্যেই সব ফুঁকে দিয়েছো?

—হুজুরকে তো আগেই নিবেদন করেছি যে ডাকাতির টাকা এ অধম ছোঁয় না। তবে দলের লোককে খাই-খরচা বলে কিছু টাকা ধরে দিয়েছি। বাদবাকী সব টাকাই দীন-দরিদ্রের সেবায় লেগেছে।

—কিন্তু সনাতন, এবার যে তোমায় কম করে দশটা বছর ঘানি টানতে হবে।

—আমি তার জন্যে প্রোস্তুত, হুজুর। যেমন কম্মো তেমনি ফল তো ফলবেই। আমার শেষ কথাটা কিন্তু আপনাকে রাখতেই হবে, হুজুর।

—যথা?

—পেন্নামির টাকা কটা হুজুর না নিলে, আমি মরেও শান্তি পাবো না।

—হুঁ। ভেবে দেখি। তুমি এখন একটু আড়ালে গিয়ে বসো। আমি সরকার মশায়ের সঙ্গে কাজের কথাগুলো সেরে নিই।

সিপাই এর মুখে খবর পেয়ে সরকার মশায় এসে বসলেন। দারোগাবাবু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—

—আচ্ছা সরকার মশাই, আপনার টাকাগুলো ফেরত পেলেই তো

হলো ? কিন্তু আমি বলি কি যে টাকার কথা পরে। আগে চাই ডাকাত ব্যাটাদের হাড় ভাঙা শাস্তি।

—না, বড়বাবু। আমি আমার টাকা ফেরত পেলেই খুসী। কাজ-কম্মো ফেলে কোর্ট-কাছারিতে হাজিরা দিতে হলে আমার ব্যবসা যে শিকেয় উঠবে। তবে আপনার কথা আলাদা। ডাকাত-ধরাই যে আপনাদের পেশা, আপনার আবার সেটা একটা নেশাও বটে।

—বেশ, তাহলে এই নিন আপনার টাকা। খুসী মনে বাড়ী চলে যান। মহাজনের ধার শোধ করুন আর নিজের মান বজায় রাখুন। তবে একটা কথা। টাকা কি ভাবে কবে কার কাছ থেকে ফেরৎ পেলেন এ সব কথা কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে।

সেই কথায় বলে না যে 'হারালে পায়, মলে বাঁচে, এমন ভাগ্যি কজনের আছে।' এতগুলি টাকা ফেরত পাওয়া কি কম ভাগ্যির কথা। সরকারমশাই, তখন তাই. আনন্দে আবেগে একেবারে আত্মহারা। একটা কেন তিনি বড়বাবুর একশোটা কথাও সে সময় মাথায় করে রাখতে রাজী। তাড়াতাড়ি উঠে দারোগাবাবুর দুটী হাত ধরে গদগদ ভাবে বললেন—

আপনার এ উপকার আমার চিরকাল মনে থাকবে। আর কাকে পক্ষীতেও এসব কথা টের পাবে না।

—বেশ, তাহলে আসুন, নমস্কার।

সরকারমশায় নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন। সনাতনও ঘরে এসে ঢুকলো। তার চোখে জল। বাইরে থেকে সে সবই শুনেছে। কাতর ভাবে বলে—হুজুর তাহলে আমার কথা পায়ে ঠেললেন!

—দ্যাখো সনাতন, ডাকাতির টাকা হলো পাপের টাকা। আমার কাজ হলো ডাকাতকে ধরা, ডাকাতির টাকা পকেটে পোরা নয়। আমার মেয়ের বিয়ের টাকা যে ভাবেই হোক যোগাড় হবে।

—তাহলে, আমার কি হবে হুজুর ?

—তোমার নামে কোনো মোকদ্দমাই আমি রুজু করছি না। কিন্তু তুমি আজই এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তোমার পছন্দ মতো কোনো জায়গায় ঘর বেঁধে—কালী মায়ের নাম জপ করে শেষ জীবনটা কাটাবে। তোমার দলবলও শহর বাজারে গিয়ে খেটে খাবে। কি ? রাজী ?

—আমায় বরং শাস্তি দিন, হুজুর। জেবন ভোর আমি নিজের পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে পারবো না।

কথা বলতে বলতে সনাতন বড়বাবুর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। বড়বাবু দাঁড়িয়ে উঠে তাকে তুলে ধরে বললেন—

—মা কালীই তোমার বোঝা হাল্কা করে দেবেন। এবার যাও। আর দেরী করো না।

সনাতন উঠে জলভরা চোখে একবার দারোগাবাবুর দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে থানা থেকে বেরিয়ে পথ ধরে এগিয়ে চললো। কিন্তু

কোথায় যাবে সে কে জানে। সদানন্দ চক্কোতির চোখও বিশেষ শুকনো ছিলো না। সামনে করতোয়ার দিকে তাকিয়ে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বোধ হয় নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'সনাতন তো কালীমায়ের নাম জপে নিজের পাপের বোঝা হালকা করবে। কিন্তু আমাকে অপরাধের কলঙ্ক থেকে মুক্তি দেবে কে? শূন্যসলিলা করতোয়া?

তিন তিনটে বড় ডাকাতি মূলে দোষ কবুল করার পরও সনাতনকে শাস্তির হাত থেকে রেহাই দিয়ে, দারোগাবাবু অপরাধ করেছিলেন কি না সে কথা আমাদের গল্পের চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে না। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে পচাগড় থানার এলাকায় শান্তি ফিরে এসেছিলো। সনাতনকেও কেউ আর এ অঞ্চলে দেখে নি। তবে তার নাম সাবেকি লোকেদের মন থেকে এখনও একেবারে মুছে যায় নি।

রাণা সর্দার প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির
[রাণাঘাটে গেলেই দেখা যাবে]

রাণা সর্দারের বসতবাটির উপর অথবা পাশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাণাঘাট সরকারী প্রসূতি সদন।

রাণা সর্দার

শিয়ালদা ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে চেপে মেইন লাইন ধরে সোজা চলে এসো। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তুমি রাণাঘাট জংশনে পৌঁছে যাবে। রাণাঘাট এখন নদীয়া জেলার একটা জমজমাট মহকুমা শহর। সেখানে এখন নেই কি? কোর্ট কাছারি, ডাক্তার-বদ্যি, থানা-পুলিশ, বাজার-দোকান সবই আছে। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, কিছুরই অভাব নেই। পাকা পথঘাট হয়েছে, যানবাহনের ব্যবস্থাও আছে। আর বিজলি বাতি শহরের চেহারা বদলে দিয়েছে। কিন্তু এসব তো হলো হাল-আমলের ব্যাপার। আমি যে তোমাদের প্রায় তিনশো বছর আগেকার কথা বলতে বসেছি।

যদি কোনো মুনি-ঋষির বরে তিনশো বছর আগেকার রাণাঘাট শহরের (মানে আজ যে শহরকে আমরা রাণাঘাট বলে জানি) দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভেসে ওঠে, তাহলে? আমরা অনেকেই ভয়ে হয়তো চোখ বুজিয়ে ফেলবো বা আঁৎকে উঠবো। পাকা ঘর-বাড়ী, রাস্তাঘাট ও দোকানপাট সব যেন একেবারে মুছে গেছে। চারদিক ঘিরে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল—মাঝে মাঝে দু'চারটে সেকেলে বাড়ী। হাঁটা-পথ বা বন-পথ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। চূর্ণী নদী বয়ে চলেছে উদ্দাম আবেগে। তার পাড়েই যে মহাশ্মশান সে কথা আর কাউকে বলে দিতে হবে না। এখানে ওখানে দু'একটা চিতে জ্বলছে।

জঙ্গলে-ঘেরা নির্জন জায়গাটা চিতের আগুনের আলোয় আরও যেন ভয়ঙ্কর সাজে সেজেছে। সেখানেই এক ছাতিম গাছের তলায় একজন জটাজুটধারী সাধক তাঁর সাধনায় ডুবে আছেন। বাহিরের জগতের কোন কিছুতেই তাঁর টান নেই। ভয় ভাবনার বালাইও তাঁর নেই। তিনি কোথায় আছেন—এ বিষয়েও তাঁর কোনো হুঁস আছে বলে মনে হয় না। আর তা থাকবেই বা কেন? যিনি সবার মধ্যে, সবকিছুর মধ্যে এবং সব জায়গায় এক সেই ভগবানকেই শুধু দেখে থাকেন, তাঁর আবার কিসের ভয়, কিসেরই বা ভাবনা-চিন্তা? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তিনি সাধনা করে চলেছেন। দুরন্ত শীত, দুঃসহ গরম বা দারুণ বর্ষা—কোনো কিছুই এই ধ্যানমগ্ন সাধককে বিচলিত করে না। তাঁর এই সাধনার কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কতো লোক কতো কি ফলমূল নিয়ে এই সাধকের কাছে এসে ধর্ণা দেয়। কিন্তু কিছুতেই সাধকের ধ্যান ভাঙে না। কখন যে তিনি ধ্যানে বসেন আর কখনই বা তিনি ধ্যান ভেঙে উঠেন বিশ্রাম নেন, তা কেউ জানে না। ফলমূলও লোকে যেমনটি—রেখে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই পড়ে থাকে। সে সব সাধকের কোনো ভোগে লাগে বলে মনে হয় না। এই দুশ্চর সাধনা ও আরাধনা কি বিফলে যেতে পারে? যথাসময়ে সাধক সিদ্ধিলাভ করলেন। পেলেন মুনি-ঋষিদেরও বাঞ্ছিত ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকের প্রতি ভক্তিতে আনত হলো গাঁয়ের আপামর জনসাধারণ। অঞ্চলটির কপালে পড়লো নতুন নামের পুণ্যটীকা—'ব্রহ্মডাঙ্গা'।

॥ ২ ॥

'ব্রহ্মডাঙ্গা'র ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকপুরুষ যথাসময়ে দেহ রাখলেন। মরদেহ ছেড়ে তিনি অমরলোকের দিকে যাত্রা করলেন। আর দেশবাসীর জন্যে রেখে গেলেন তাঁর আশ্চর্য্য সাধনার কাহিনী ও মুক্তিমন্ত্র। সে পুণ্য-কাহিনীর খুঁটিনাটি অবশ্য আজও আমাদের অজানা। তবে মহাশ্মশানেই যিনি সাধনায় আসন পেতেছিলেন তাঁকে কালীসাধক বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। তিরোধানের পরও তাঁর অলৌকিক সাধনার পুণ্যপ্রভা ব্রহ্মডাঙ্গাকে বেশ কিছুকাল আলোকিত করে রেখেছিলো। আজও স্থানীয়

জনসাধারণের মন থেকে সে পুণ্যস্মৃতি একেবারে মুছে যায় নি। তবে 'ব্রহ্মডাঙ্গা' নামটী তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল তলে।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে অর্থাৎ ব্রহ্মডাঙ্গার প্রাণপুরুষের তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বছরের পরে, ব্রহ্মডাঙ্গার এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে নিয়েই আমাদের গল্পের শুরু। এই পঞ্চাশ বছরে ব্রহ্মডাঙ্গার ওপর দিয়ে তেমন কোনো ভাঙা-গড়ার ঝড় বয়ে যায় নি। দু'চার ঘর লোক অবিশ্যি বেড়েছে। কিন্তু সে তেমন চোখে লাগার মতো কিছু নয়। ঘন নিবিড় জঙ্গল যেখানে যেমন ছিলো, প্রায় তেমনিই আছে। চূর্ণী নদীও বয়ে চলেছে তেমনি উদ্দাম বেগে। পথঘাট বলতে বিশেষ কিছু আগেও ছিল না, এখনও নেই ভিনদেশী সওদাগরের পথ চলার আওয়াজ তাই এই জঙ্গল মহলের শান্তশিষ্ট মানুষদের আজও অশান্ত করে তোলে নি। জলপথেই চলে মালপত্তরের আনা নেওয়া এবং মানুষের যাতায়াত। ব্রহ্মডাঙ্গার মানুষের দিন কেটে যায় একটানা একঘেয়ে ছন্দে ও ঢিমে তালে। আমাদের এই ব্রাহ্মণ পরিবারেরও দিন চলেছে ঐ একই ছন্দে, একই তালে। কোথাও কোনো বৈচিত্র্যের ঝলমলানি নেই। স্ত্রী, একটী ছেলে ও মেয়ে—এই নিয়েই হলো ব্রাহ্মণের পরিবার। খড়ের চাল দেওয়া একটী মেটে বাড়ী। তাতে আছে দু'খানা ঘর, একটী ছোট্ট ঠাকুর ঘর ও এক ফালি রাঁধার জায়গা। এতেই তার বেশ কুলিয়ে যায়। দু'দশ ঘর যজমানও তার আছে। তখন ঘরে ঘরেই ছিলো বারো মাসে তেরো পার্বণের পালা। আর যজমানদের দানে পুরুত ঠাকুরদের ঘর ভরে উঠতো। সে দানের মধ্যে অসম্মানের কোনো কালিমাই ছিলো না। একটা ছড়া আছে না—'ছায়, থোয়, রাখে মান; তারে বলি যজমান।' তখনকার দিনের যজমানেরা তাই-ই করতো। আবার পুরুত ঠাকুরেরাও যজমানদের মঙ্গলের জন্যে চেষ্টা করতো, বিধান দিতো। সে কথাও আর একটা ছড়ার মধ্যে বলা আছে—'নেয়, থোয়, করে হিত; তাকে বলে পুরোহিত।' কাজেই আমাদের এই ব্রাহ্মণের খাওয়া-পরা একরকম করে চলে যেতো। কিন্তু টাকা পয়সার মুখ দেখবার সৌভাগ্যি তার হয়নি। কি করেই বা হবে তা? সেকালের ব্রাহ্মণ কি আর কোমর বেঁধে ব্যবসায় নেমে পড়তে পারে? নিজে হাতে লাঙ্গল ধরে চাষ করার কথা তো উঠতেই পারে না। ব্রাহ্মণও ছিলো অল্পে তুষ্ট। যজমান বাড়ীতে পুজো আচ্চা করে যা পেতো তাতেই সে খুশী। হাতে সময় থাকলে সে ঠাকুর ঘরে

বসে প্রাণ ভরে কালীমাকে ডাকতো। মায়ের কাছে কি যে ছিলো তার প্রার্থনা, তা আমরা জানি না। রাণা তো তার একটীমাত্র ছেলে। বয়েস তার সবে এগারো। লেখাপড়া অল্পস্বল্প করেছে। আর একটু বড় হলেই তার পৈতে হবে। তারপর বাবার কাছে পুজোর মন্তর ও করণ-কারণ সব কিছু শিখে নেবে। সময়ে বাবার যজমানদের কাজ সেই করবে এবং তাতেই তার চলে যাবে। মেয়েটীর বয়স সবে ন বছর—নাম তার মালতী। তার জন্যেই ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীর যা কিছু ভাবনা। সেকালের হিসেবে মেয়ের বয়স নেহাৎ কম নয়। তাড়াতাড়ি তার বিয়ে না দিতে পারলে গাঁ-ঘরে যে মুখ দেখানো ভার হবে। দেখতে শুনতে মেয়ে তাদের বেশ ভালোই। কিন্তু দেখতে ভালো বলে তো খালি হাতে কেউ তাদের মেয়েকে ঘরে তুলবে না। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে পার করতে গেলে হাতে নগদ কড়ি চাই। কিন্তু কোথায় পাবে তারা মেয়ের বিয়ের কড়ি? তারপর ব্রাহ্মণ নিজে কুলীন। কাজেই মেয়ের জন্যেও চাই কুলীন পাত্র। তা না হলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। গাঁয়ের লোক তাকে ছেড়ে কথা কইবে না। কিন্তু যজমান ছাড়া তাকে সাহায্য করার আর কেই বা আছে? যজমানেরা খুশী মনেই তাদের পুরুত ঠাকুরকে কাপড়-গামছা ও চাল-ডাল দিয়ে সাহায্য করতে রাজী। কিন্তু সোনাদানা বা নগদ টাকা তারাই বা কোথায় পাবে? যত দিন যায়, মেয়ের বিয়ের দুশ্চিন্তার বোঝা ততই ভারী হতে থাকে। ব্রাহ্মণীর মুখে ভাত রোচে না, ব্রাহ্মণেরও রাতে চোখে ঘুম আসে না। দুজনেরই অবিশ্যি ভরসা আছে যে শেষ পর্য্যন্ত মা কালী যা হোক একটা ব্যবস্থা করেই দেবেন।

॥ ৩ ॥

—দাদা, ও দাদা

হঠাৎ পিঠে এক ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠলো রাণা। ফিরে দেখলো সামনে মালতী দাঁড়িয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। রেগে মেগে সে বোনকে দিলো এক দাবাড়ি—

—দিলি তো সব পণ্ড করে?

—ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসে এই বনের মধ্যে বসে কি এমন রাজকার্য্য করছিলি তুই? —'দিলি তো সব পণ্ড করে'—কথার কি ছিরি ছাখো না!

—ওরে লক্ষ্মীছাড়ি। আমি যে তোরই জন্যে মা কালীর কাছে পাথনা করছিলুম! আর তুই-ই সব গোলমাল করে দিলি?

—ও মা তাই তো বলি! আমি ভাবি যে দাদা চোখ বুজিয়ে বিড় বিড় করে বকে মরছে কেন? তা তুই কালীপূজোর জানিস্ কি?

—বামুনের ছেলে পূজো জানি না, মানে? তবে শোন—'কালীং করালবদনীং ঘোরাং—'। কিরে, তুই যে হেসেই খুন হোলি?

—থামুন, ভশ্চায্যি মশাই থামুন। এই সব মন্তর শুনলে বাবা তোর পিঠের চামড়া খুলে নেবে, বুঝলি?

—বাবার কাছে মন্তর আওড়াতে যাচ্ছে কে? যাক্‌গে, তোর বরাতে যখন নেইকো ঘি—

—ফের! আবার তুই বুড়োদের মতো ছড়া কাটছিস্!

—বেশ করবো, তোর কি? কথা ছ্যাখো না, একেবারে যেন তেকেলে বুড়ী! কে বলবে যে আমার থেকে দু বছরের ছোটো।

—বেশ, তুই যতো ইচ্ছে মনের সুখে ছড়া কেটে মর। কিন্তু আমার জন্যে মার কাছে কি পাথনা করছিলি, দাদা?

—কি আর পাথনা করছিলাম। বলছিলাম কি—'মা, মালুর তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও। আপদটা বিদেয়—'

—ফের? আচ্ছা দাদা, বিয়ে হলে আমি কোথায় থাকবো?

—কি বোকা মেয়ে রে বাবা! সেদিন বাবার এক যজমানের মেয়ের

বিয়েতে গেলাম না আমরা। বিয়ের পর দিনের কথা মনে নেই? তোরই মত একটা মেয়ে কেমন সেজে গুজে শ্বশুর বাড়ী চলে গ্যালো?

—হুঁ।

—হুঁ কিরে? আমরা কেমন মজা করে পাত পেতে ভালোমন্দ খেলুম?

—থাম তুই। পেটুক কোথাকার! আচ্ছা দাদা, যাবার সময় কনে, কনের মা-বাবা অমন করে কেঁদে ভাসাচ্ছিলো কেন?

—কাঁদবে না? তুই কি মেয়ে রে? মেয়ে বাপ-মাকে ছেড়ে চেরকালের জন্মে চলে গ্যালো যে!

—তার মানে, সে কি আর বাপ-মায়ের কাছে আসতে পারবে না?

—আচ্ছা, বোকা তো তুই। আসবে তো বটেই। তবে সে একেবারে কালে ভদ্রে, বুঝলি?

—আমি পারবো না, দাদা। আমি তোদের সকলকে ছেড়ে পরের বাড়ী গিয়ে থাকতে পারবো না!

—আরে ছাড়, ছাড়। তোর হাত নয়তো যেন সাঁড়াশি!

—আহা, তোর লেগেছে বুঝি, দাদা?

—না, তা কি আর লেগেছে?

—আমি, মানে ভয় পেয়ে তোকে একেবারে জাপটে ধরেছিলাম, না?

—ভয় পেয়ে? বলি এতবড় ধিঙ্গী মেয়ের আবার বিয়ের নামে ভয়! রঙ্গ দেখে আর বাঁচি না।

—মার মুখে শুনে শুনে কথাগুলো তো বেশ শিখেছিস দেখছি? আজ যদি বাবাকে না বলে দিই—

—এই মালু, খবরদার বাবাকে—

—কেন? মুখ শুকিয়ে গ্যালো যে!

—বাবা যে তোর কথা শুনে একেবারে তেড়ে মারতে আসে।

—না তা আসবে কেন? তোর দু'হাত ভরে নাড়ু দেবে!

—আরে আমি যে তোর ভালোর জন্মেই মার কাছে পাখনা করছিলাম। আর তুই কি না—

—থাক্, খুব হয়েছে। আচ্ছা দাদা, মেয়েদের বিয়ে না হলে কি হয় রে?

—সব্বোনাশ! আটবছরের মধ্যেই যে মেয়েদের বিয়ে না দিলেই নয়। আর তুই তো কবেই আট পেরিয়ে ন'য়ে পড়েছিস্?

—এ সব পাকা পাকা কথা কে বলেছে তোকে?

—কে আর বলবে ? এ যে সর্ব শাস্তোরে লেখা আছে।

—আহা, কি আমার শাস্তোর-পড়া পণ্ডিত রে ?

—চটিস্ কেন ? বাবার কাছে যজমানেরা সব বিধান নিতে আসে না ? তখন বাবাই তো তাদের বলে—

—তা যে যা বলে বলুক গে। আমি বাবা, পরের বাড়ী গিয়ে থাকতে পারবো না।

—না, তা পারবে কেন ? এদিকে যে বাবা-মা তোর বিয়ের জন্যে ভেবে সারা।

—কেন ভাববার অতো আছে কি ?

- নাঃ, কিছুই নেই। গাঁয়ে যে বাবা আর মুখ দেখাতে পারছে না, তা বুঝিস তুই ?

—আমার আর বুঝে কাজ নেই।

- মার গলা না ? চল, তাড়াতাড়ি পালাই। ইস্, অনেক দেরী হয়ে গেছে। তোকে ডাকতে এসেছি, সেই কবে! মা, আর আজ আমাকে আস্ত রাখবে না।

॥ ৫ ॥

—বলি, এতক্ষন কি করা হচ্ছিলো শুনি ? এমন হাড়-জ্বালানো মেয়ে আমি বাপের জন্মে দেখিনি।

—আঃ, ঠিক দুপুর বেলায় আবার মেয়েটাকে নিয়ে পড়লে কেন ? মায়ের প্রাণ যে এতো কঠিন হয় তাও তো কখনও শুনিনি।

—ব্যস্, মেয়ের হয়ে বাপ এবার এলেন ঝগড়া করতে। তোমার আস্কারা পেয়েই তো মেয়ে মাথায় উঠেছে।

—আহা আস্কারা আবার কবে কে দিলে ? বলি, ও করেছে টা কি ?

—করবে আর কি ? আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছে। সেই কখন রাণাকে ডাকতে গেছে আর এলো কি না বেলা পার করে ? আবার পেত্নীর মতো মুখ করে দাড়িয়ে আছে, ছাখোনা।

—গিন্নি, তোমার মাথার ঠিক নেই। মা মালুর আমাদের পেত্নীর মতো মুখ হতে যাবে কিসের দুঃখে ?

—না, মেয়ে তোমার রূপের ধুচুনি। দেশবিদেশের কতো রাজপুত্তুর এসে এই মেয়ের জন্যে তোমায় সাধাসাধি করছে—

—আঃ একটু থামো না, গিন্নি। তোরা যা, হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বস্।

- হ্যাঁ, তোমার মেয়ের কাজ বলতে ঐ দুটী—গেলা আর খেলা। বলি, পরের বাড়ীতে যেতে হবে? না, না! সেখেনে যে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরতে হবে!

—উঃ, জন্মের পর বাপ-মা' কি তোমার মুখে একটু মধু দিতে পারে নি?

—আবার আমার বাপ-মা তোলা? এক কড়ার মুরোদ নেই, বড়ো বড়ো কথা?

—আহা, চটো কেন, গিন্নি? ঠাট্টা বোঝো না কেন?

—না, চটবো কেন? এ যে একেবারে আহ্লাদে ফেটে পড়ার কথা। এত বড়ো মেয়ে যার গলায় ঝুলছে, তার মুখে আবার ঠাট্টা আসে কি করে?

—মেয়ের বিয়ের বয়েস কিছু পেরিয়ে যায় নি। তাছাড়া চেষ্টাও তো হন্তমুন্ত কোরছি। তবে ঐ কথায় বলে না—'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে। তিন বিধাতা নিয়ে।'

—তা বলে গাঁয়ের লোক তোমায় ছেড়ে কথা কইবে না। আজই রাঙাখুড়ি আমাকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে ছাড়লেন। সব কাজ শিকেয় তুলে, এখন মেয়ের জন্যে পাত্তরের খোঁজ করতে লেগে যাও।

—হাঁটাহাঁটি করতে আর বাকী কি রেখেছি? মেয়ে আমার অপছন্দের নয়। কিন্তু মেয়ের বাপের টাকা যে নেই। বরপণের টাকা যোগাড় হবে কোত্থেকে? তোমার আবার কুলীন পাত্র চাই, রাঙা টুকটুকে জামাই চাই।

—আমি মা। তোমার মতো তো পাষাণ হতে পারি না। কি বলে তুমি একটা তেজবোরে তেকেলে বুড়োর সঙ্গে মেয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলে?

—তেকেলে বুড়ো আবার কোথায় দেখলে তুমি? প্রথম দুটো বৌ মারা গেছে সেই কোন কালে। ছেলেপুলেও কিছু নেই। আর চল্লিশ বছর পুরুষের পক্ষে এমন কিছু বয়স নয়।

—না, একেবারেই ছেলে মানুষ! আর ন বছরের মালুর সঙ্গে মানাবেও ভালো—কি বলো?

—গিন্নি, তোমার কথার জ্বালায় একদিন আমি ঘরদোর ছেড়ে বিবাগী হয়ে চলে যাবো!

—না, না, তুমি কেন ঘরদোর ছাড়তে যাবে! ফের যদি মালুর জন্যে বুড়ো-হাবড়া কাউকে ধরে আনো, তাহলে—

—তাহলে কি করবে, শুনি?

—যা, করতে পারি তাই করবো। আমি আর মালু দুজনে খিড়কির পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হবো!

— কালী, কালী! ঠিক দুপুর বেলায়—

— ভণ্ডামি, রাখো তোমার। তারপর তুমি মনের সুখে আর একটা সংসার কোরো!

— তোমার মাথার ঠিক নেই, গিন্নি। যাও এখন গিয়ে ভাত বাড়ো—

—হ্যাঁ, তাই বাড়ছি। ঘরে যার এতবড়ো একটা মেয়ে, তার ডান হাত মুখে ওঠে কি করে?

—তুমি খাওয়ার খোঁটা দিলে, গিন্নি? বেশ, আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি, মেয়ের বিয়ের ঠিক না করে আর ফিরছি না।

—হ্যাঁ, তাই করো। অকর্মা পুরুষ আমার দু'চোখ্যের বিষ!

ব্রাহ্মণ ঘর থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে, হন্ হন্ করে সত্যিই যে চলে যায়। ব্রাহ্মণী ঘাবড়ে গিয়ে বাধা দিতে গ্যালো। মালুও আকুল হয়ে 'বাবা, বাবা' বলে ছুটতে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণের তখন মাথায় রাগ চড়ে গেছে। কারুর ডাকই তার কানেও বোধ হয় ঢুকলো না।

ব্রাহ্মণী বাড়ীর দাবায় বসে পড়ে 'হাঁ' করে খানিকটা পথের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর যেন লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। মালু এসে কান্না-ভেজা গলায় মাকে বলে—'মা এই কাঠফাটা রোদ্দুরে, বাবাকে ঘর থেকে বার করে দিলে?' মার কাছে কোনো জবাব না পেয়ে মালুও চুপ করে বসে থাকে। রাণা দূরে একপাশে বসে আকাশ-পাতাল কি যে ভেবে চলেছে, তা সেই জানে।

॥ ৫ ॥

রাগের মাথায় বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে পড়া যতো সহজ, মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজে আনা অতো সহজ নয়। ব্রাহ্মণ তাই ফিরে এসে ব্রাহ্মণীকে কোনো আশার কথা শোনাতে পারে নি। কিন্তু রাগ তখন তার পড়ে গেছে এবং তার গিন্নির ক্ষোভের জ্বালাও অনেকটা কমেছে। আবার সেই আগেকার মতো ব্রাহ্মণের সংসার চলতে থাকে। রাণা-মালুর দিন কাটে খেয়ে, খেলে ও ঝগড়া করে। দেখতে দেখতে আর একটা বছর ঘুরে গ্যালো। মালতী এখন দশ বছরের মেয়ে, রাণার বয়স বারো। বাপ-মায়ের কিন্তু উঠতে বসতে মেয়ের বিয়ের কথা মনের ভেতরে কাঁটার মতো

খচ্ খচ্ কোরে বিঁধতে থাকে। গরীবের মেয়ের বয়সকে সবাই যেন একটু বেশী করেই ছাখে। পাড়াপড়শীদের সকলের ঘরেই মেয়ে আছে। কিন্তু তারাই যেন সব থেকে উঠে পড়ে লেগেছে মালুর বাপকে এক ঘরে করতে। সেকালে যাকে এক-ঘরে করা হতো, তার ঘরে কেউ পা ধুতেও যেতো না। তার—ধোপা, নাপিত সব বন্ধ হতো এবং দায়ে অদায়ে তার পাশে এসে কেউ দাঁড়াতো না। ফলে তার দুর্গতির আর শেষ থাকতো না। একদিন তো ত্রৈলোক্য ঠাকুর ব্রাহ্মণকে ডেকেই পাঠালেন। ত্রৈলোক্য ঠাকুর তখন ব্রহ্মডাঙ্গার সমাজের একেবারে শিরোমণি! গোটা সমাজকে শাসনে রাখার দায় দায়িত্ব যাঁর, তিনি বড়ো যে সে লোক নন্। বারো বছরের মেয়ে মালুর এখনও বিয়ে হচ্ছে না শুনে তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কালে কালে হলো কি? কুলীন বামুনের মেয়ের বয়স বারো পেরিয়ে যেতে চললো, এখনো তার বিয়ে হলো না। জাতধম্মো সব গ্যালো দেখছি। এখুনি এর একটা সুরাহা করা দরকার। নৈলে এত বড়ো একটা অঞ্চলের মাথা বলে লোকে তাঁকে মানবেই বা কেন?

লোকের মুখে খবর পেয়ে ব্রাহ্মণ তো হন্ত দন্ত হয়ে এসে হাজির। শিরোমণি মশাই'কে প্রণাম করে সে একপাশে বসে পড়লো। শিরোমণি মশাই'এর মুখ তখন একেবারে ভরা বর্ষার মেঘের মতো—কালো ও গম্ভীর। ভয়ে ব্রাহ্মণের বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। শিরোমণি মশায় যে সহজে তাকে রেহাই দেবেন না—এটা বুঝতে আর তার বাকী রইলো না। বাজ পড়তে দেরীও হলো না। শিরোমণি মশায় হাড় হিম-করা চাউনি মেলে ব্রাহ্মণের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন দেখে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করলেন—

—কি হে, তুমি যে দেখছি একেবারে সমাজের মাথায় পা দিয়ে চলতে চাও!

—গরীব ব্রাহ্মণ—সমাজের ভয়ে সে একেবারে কাঁটা। কিন্তু এ কি কথা শিরোমণি মশায়ের মুখে! ব্রাহ্মণ ভয়ে উত্তেজনায় একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় নিবেদন করে বলে—

—ছিঃ ছিঃ একথা শুনলেও যে পাপ হয়, শিরোমণি মশায়! আমি একজন গরীব ব্রাহ্মণ—

—যাক। পাপ-পুণ্যির জ্ঞানটা তোমার এখনও একেবারে লোপ পায়নি, দেখছি। তাহলে আর পাপের বোঝা বাড়াচ্ছো কেন?

—আজ্ঞে ?

—শোনো, খোলোসা করেই বলি। তোমার বুড়ো ধাড়ী মেয়ের বয়স—যে বারো পার হতে চল্‌লো, তার খবর রাখো ?

—কিন্তু ক্ষমা করবেন শিরোমণি মশায়। মালুর আমার বয়েস দশ বছরের এক মাসও বেশী নয়।

মেয়ের বাপের মুখে এ ধরনের কথা আজ প্রথম শুনছি না। সমাজকে মিথ্যে বলে ভাঁওতা দিতে পারো, কিন্তু ভগবানকে ?

—আমি এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি শিরোমণি মশায়, যে মালুর বয়স—

—আরে থাক্ থাক্। এই ভর সন্ধ্যে বেলায় আর দিব্যি-টিব্যি নাই বা গাললে !

সত্যিই তো, সন্ধ্যে যে লেগে গেছে। ঘরে ঘরে সাঁঝ-বাতি দেওয়া এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। শাঁখের আওয়াজও ভেসে আসছে কানে। কিন্তু ব্রাহ্মণের কোনোদিকে যেন হুঁস্ নেই। একতাল কাদার মতো বসে আছে, বেচারী। শিরোমণি মশায় আবার বলতে শুরু করলেন—

—দেরী যা হবার হয়েছে। এবার উঠে পড়ে লেগে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও। নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে কি শেষে পিতৃপুরুষদের নরকে পাঠাতে চাও ?

—আপনি বিশ্বাস করুন, শিরোমণি মশায়, চেষ্টার আমার ক্রুটী নেই। কিন্তু খালি হাতে, কেউ যে মেয়ে ঘরে তুলতে চাচ্ছে না ?

—তোমার ছেলের বেলায় তুমিও বাবাজী তা চাইবে না। তা, দেশে কি দোজবরে-তেজবরে পাত্তরেরও অভাব পড়েছে?

—সে রকম দু'একটা খোঁজ অবিশ্যি পেয়েছি। তাদেরও খাঁই একেবারে যে নেই তা নয়। কিন্তু বাপ হয়ে মেয়েটাকে একবারে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে যে মন সরছে না, শিরোমণি মশাই।

—বেশ। তা'হলে তুমি সমাজে পতিত হয়েই থাকতে চাও দেখছি। তাই হবে। তুমি তো যজমানি করে পেট চালাও। একঘরে ব্রাহ্মণকে কেউ আর পুজো-আচ্চা করতে ডাকবে না। তখন গুষ্টি-বগগো শুদ্ধু না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

—আপনার দোহাই, শিরোমণি মশাই। আর কিছু দিন সময় দিন।

—দিলাম। কিন্তু বেশীদিন আর আমি লোকের মুখ চাপা দিয়ে রাখতে পারবো না। এখন বোশেখ মাস চলেছে। ভাদ্দর মাস পড়ার আগেই তোমাকে যে ভাবেই হোক মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হবে। এখন আমি উঠি। আমার সন্ধ্যে-আহ্নিকের সময় প্রায় উতরে যেতে চলেছে। তারা, ব্রহ্মময়ী মা—

শিরোমণি মশায় উঠে খড়মের আওয়াজ তুলে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলো। তারপর কোনোরকমে যেন শরীরটাকে টেনে তুলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেড়িয়ে বাড়ীর পথ ধরলো। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত। সে অন্ধকারের মধ্যেও মাঝে মাঝে শিরোমণি মশায়ের মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো। ভয়ে তখন তার পথচলা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় আর কি! শিরোমণি মশাই মুখে যা বলেছেন, কাজেও যে তাই করবেন—একথা ব্রাহ্মণের অজানা ছিলো না।

॥ ৬ ॥

দুঃখে ভাবনায় মালুর বাপ-মায়ের দিন যে কেমন করে কাটছে, তা মা কালীই শুধু জানেন। এদিকে ভাদ্দর মাস পড়তে আর কটা দিন মাত্তর বাকী। সময়ের স্রোত তো বাপ-মায়ের দুঃখের কথা ভেবে এক নিমেষও থমকে দাঁড়াবে না। দেখতে দেখতে এ কটা দিনও কেটে যাবে। তার মধ্যে যদি মালুকে পাত্রস্থ না করা যায়, তাহলে—। তাহলে যে কি হবে তা ভাবতেও ব্রাহ্মণ শিউরে ওঠে। তার রকমসকম দেখে গিন্নিও অনেকটা

চুপচাপ আছে। মালু যেন কেমন মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর রাণা আনমনা হয়ে কি যে ভাবে তা সে মা কালীই জানেন।

শেষে বাড়ীশুদ্ধ লোকের ডাকে মা কালী বোধ হয় মুখ তুলে চাইলেন। মালুর বিয়ের ঠিক হলো। মালুর মার শেষ পর্য্যন্ত দোজবরে ছেলের হাতে মেয়ে দিতে আর আপত্তি রইলো না। গরীবের মেয়ের বয়সটাই বড় কথা; পাত্র দোজবোরে কি তেজবোরে এ নিয়ে কোনো কথা কেউ বলে না। তাছাড়া কুলীন পাত্তর ছাড়া চলবে না। কুল ভেঙে কে লোক হাসাবে? তার থেকে মেয়ের কপালই ভাঙুক! গরীবের মেয়ের বিয়ের এই সবই হলো আসল মন্তর। তাই মালুর-মাকেও একটা একটা করে সব মন্তর-গুলোই মেনে নিতে হলো। পাত্র কুলীন ও দোজবোরে। বয়স অবিশ্যি এমন কিছু বেশী নয়—পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। আগের পক্ষের পরিবারের একটী মেয়েও আছে। সে প্রায় মালুর বয়সী। দিতে থুতেও যে একেবারে কিছু হবে না, তা নয়। ফর্দ্দো-মাফিক গয়না ছাড়া নগদ টাকাও দিতে হবে করকরে একশোটী! বরের বোতাম, ও আংটি তো আছেই। বরযাত্রীও আসবে কম কোরে জনা পঁচিশেক। বরের চেহারার কথা শুনে কারুর কোনো লাভ নেই। গরীবের মেয়ের চেহারা ভালো না হলে চলে না। কিন্তু পুরুষের চেহারার আবার ভালো মন্দ কি? সোনার আঙটি বাঁকাতেড়া হলেও দর তার এক কাণাকড়িও কমে না। এ সব এখন মালুর মাও ঠেকে শিখেছে। তাই মালুর বে'র শাঁখ বেজে উঠলো বলে। মালুর বাবা যজমানের বাড়ী বাড়ী ধর্ণা দিয়ে বেড়াতে লাগলো টাকাকড়ির আশায়। মালুর মা চোখের জল চেপে বিয়ের উয্যুগ করতে শুরু করলো। মেয়ের বিয়ে বলে কথা। সুভালাভালি চার হাত এক হলে তবে না নিশ্চিন্তি। তাই মালুর বাপ-মায়ের আর এখন হাঁফ ফেলার সময় নেই। সামনে আর দশটা দিন মাত্তর আছে। এর ভেতরেই যোগাড়-যন্তর যা কিছু করার সব সেরে ফেলতে হবে।

মালুর মার অল্প-স্বল্প সোনা-দানা যা ছিলো তার শেষ গুঁড়োটুকু পর্য্যন্ত নিতে হলো। তাতে মেয়ের বাপের দুঃখু করার কিছু নেই। এই নাকি নিয়ম? মালুর বাবা তাই মন খারাপ না করে সোনা হাতে নিয়ে স্যাকরার দোকানে ছুটলো। এ অঞ্চলে স্যাকরার দোকান বলতে ঐ একটী। কাজেই আর দেরী করা যায় না। কিন্তু স্যাকরার মুখে সোনার ওজনটা শুনে মন তার দমে গ্যালো। গিন্নির যা কিছু ছিলো সব ঘুচিয়েও তো পাঁচ ভরি সোনা

হলো না। কি হবে তাহলে? বরের বাবা বেশ কড়া ধাতের লোক। সাত ভরি সোনার এক আনা কম হলে তিনি আর রক্ষে রাখবেন না। তাছাড়া তাঁকেই বা দোষ দিয়ে কি হবে? কথাবার্তা সব পাকা-পাকি হয়ে গেছে— এখন আর কমসম করা চলে না। বাড়ী ফিরে এলো ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে রাতভোর পরামর্শ্যোই চললো। আত্মীয়-স্বজন অবিশ্যি দু'এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। কিন্তু ছাতা ধরে ব্রাহ্মণের মাথা রক্ষে করবে এমন অবস্থা তাদের কারুর নয়। কাজেই ভোরে উঠে মালুর বাবা আবার বেরিয়ে পড়লো। ভরসা এখন মা কালী আর যজমানেরা। কিন্তু যজমানেরাই বা আর কতো করবে? তারা তো কেউ-কেটা লোক নয়। তারপর এবারে ফসলও তেমন ভালো হয় নি। সব শুনে তারা বলে—'ঠাকুর মশায়, আপনার এ বিপদে সাহায্য করতে আমাদের কি অনসাধ? বেরাস্তনের কন্যেদায় বলে কথা। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো আপুনি সবই জানেন।' তবু তারা চেষ্টা করে এবং আর এক ভরি সোনাও যোগাড় হয়ে যায়। কিন্তু আর এক ভরির কি হবে? হাতে-পায়ে ধরলেও কি বরের বাবা রেহাই দেবেন না? অজানা আশঙ্কায় বাপের মন কেঁপে উঠে। বরপণের টাকাও পুরো যোগাড় হয় নি—কিছু কম আছে। কিন্তু এখন আর ভাববার সময় নেই।

আর ভেবে করারই বা কি আছে? যজমান থেকে শুরু করে চেনা-শোনা সকলের কাছেই হাত পেতেছে, মালুর বাবা। দোরে দোরে একরকম ভিক্ষে করেই বেড়িয়েছে মানুষটা। নিরুপায় হয়ে শেষে ভিটে মাটীও বাঁধা রেখেছে চড়া সুদে। তাতেও যে শেষ রক্ষে হয় না! মালুর মা সবই বোঝে। ভেবেও সারা হয় রাতদিন।

এ যে অকূল পাথার! এক মা কালীই শুধু পারেন এ পাথার পার করতে! কিন্তু মা কালীর কাছে মালুর মার আকুল প্রার্থনা পৌঁছোয় কিনা কে জানে।

॥ ৭ ॥

আজ মালুর বিয়ে। দশ বছরের মেয়েটাকে সবাই যেন দাবড়াচ্ছে— এটা করিস নি, এটা খাস নি। একেতো রাত পোয়ালেই তাকে ঘরদোর, বাপ-মা ও দাদাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে— এ কথা ভাবলেই তার ভীষণ

কান্না পাচ্ছে। তার ওপর এসব কি জ্বালা! কিন্তু বেচারী করবেই বা কি!
দাদাটারও টিকির নাগাল পাবার যো নেই। সে সকলের ফাই-ফরমাস
খেটেই সারা। বাপ-মার মুখেও হাসি নেই। সবটা মিলিয়ে কেমন যেন
থম-থমে ভাব। নিজের বুদ্ধিতে কতটা সে কি বুঝেছে মা কালীই জানেন।
কিন্তু পাড়াপড়শীদের মুখে সে কিছু কিছু জেনেছে বৈ কি? বাবা নাকি
ভিক্ষে সিক্ষে করে তার বিয়ে দিচ্ছে। এমন কি তাদের থাকবার বাড়ীটাও
বাঁধা দিতে হয়েছে চড়া সুদে। সুদের টাকা সময়মতো দিতে না পারলে
তাদের বাড়ী ছেড়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে। তার বাবা মা'র কথাও যে
তার একেবারে কানে আসেনি, তাও নয়। এই সব শুনেটুনে সে আন্দাজ
করে নিয়েছে যে সে এক ভয়ানক অপয়া মেয়ে। তার জন্যেই বাপ-মায়ের
আজ বাদে কাল ভিখিরির হাল না হয়ে যায় না। কিন্তু একটা কথা মালুর
মনে বারবার ঘোরা ফেরা করতে থাকে---এতো ধার-কর্জো করে বিয়ে তার
না দিলেই তো হতো! পাড়ার রাঙাখুড়ির মুখে কিছুই আটকায় না। তিনিই
ছড়া কেটে সকলকে বলে বেড়িয়েছেন যে এই ভাদ্দরে মালুর বিয়ে না হলে,
তার বাবাকে একঘরে করা হবে। তখন দেখা যাবে কি করে তাদের দিন
চলে? বেঁচে থাকতে তো কেউ তাদের ঘরের দরজা মাড়াবেই না। এমনকি
মারা যাবার পরও কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক জুটবে না। তখন
শ্যাল কুকুরেই তাদের যা করার করবে। ভয়েতে শিউরে ওঠে মালু। কিন্তু
সে কিছুতেই বুঝতে পারে না যে তার বাবার কি দোষ। বরপণের টাকা ও
মেয়ের গয়না যোগাড় করা মুখের কথা নয়। তার বাবা যদি তা যোগাড়
করতে নাই পারেন, তাহলেই তাঁকে শাস্তি পেতে হবে? এ কথার কোনো
জবাবই সে খুঁজে পায় না। দাদাও যে বিশেষ কিছু বোঝে বলে তার মনে
হয় না। কিন্তু তার বিয়ে হয়ে গেলে কি সত্যি-সত্যিই বাড়ীঘর ছেড়ে
সকলকে গাছতলায় থাকতে হবে? মালু আর ভাবতে পারে না।

'গোধূলি লগ্নেই বিয়ে। সন্ধ্যে লাগবার আগেই বর এসে গেছে। বরের
বাবা, এবং বরযাত্রীরাও এসেছেন। গরীবের বাড়ীর বিয়ে। জৌলুষ তেমন
নেই। কিন্তু ঘটা না থাকলেও ল্যাঠা আছে বৈকি। বরযাত্রীদের আদর-
আপ্যায়ন করার ব্যাপার আছে; বিয়ের অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটিও বড় কম
নয়। তাই গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেছে। পাড়া-
পড়শীরাও ভিড় করে বর দেখতে এসেছে। ছাঁদনাতলায় বরকে দেখে
মেয়ের মা চোখের জল চেপে কাজ করে যাচ্ছে। পাড়া-পড়শীরা কেউ বা

মুখ বেঁকিয়ে হাসলো, কেউ বা আবার মমতা-ভরা চোখ মেলে মালুর দিকে তাকিয়ে রইলো। ছাদনাতলার কাজ শেষ হলো। এবার মেয়েকে সম্প্রদান ক'বে তার বাবা। দান-সামিগ্রি যা কিছু সেখানেই সব সাজানো আছে। গয়না অবিশ্যি গায়ে পবেই মেয়ে বিয়ের আসরে বসে আছে। বরের বাবা হুঁশিয়ার লোক। বিয়ের আগে তিনি যাচাই করে নিতে চান যে দান সামিগ্রি সব ঠিক্ ঠাক্ আছে কি না। তাই তিনিই শুরু করলেন —বুঝলেন না, ভশ্চায্যি মশাই! আর কয়েকঘণ্টা পরেই আপনি হবেন আমার পরমাত্মীয়। তখন দেনা-পাওনা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার মাথা কাটা যাবে। তাই—কি চমকে উঠলেন কেন? না, না, বাড়তি কিছু দাবী-দাওয়া আমার নেই। আমি এক কথার মানুষ। তবে আমার জানা দরকার যে দান সামিগ্রি সব ঠিক-ঠাক আছে কি না? পরে যাতে এই নিয়ে কথা না ওঠে।

মালুর বাবার বুকে যেন আর হাওয়া নেই। চোখের সামনে তার দুলে উঠলো বিয়ের আসর, ঘরবাড়ী সব কিছু। মুখেও কোনো কথা যোগালো না। চার হাত এক হয়ে গেলে ব্রাহ্মণ নিজেই বরের বাবার হাতে পায়ে ধরে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতো। কিন্তু এখন উপায়?

—কি হলো ভশ্চায্যি মশায়? একি ছিঃ ছিঃ, আমার হাত ধরছেন কেন?

—বিশ্বাস করুন, আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। লোকের কাছে ভিক্ষে করেছি, সোনা বলতে বাড়ীতে আর কিছুই রাখিনি; এমন কি ভদ্রাসনটুকুও বাঁধা দিয়েছি। কিন্তু—

—কিন্তু কি? বলুন।

—তা সত্ত্বেও সব পুরোপুরি যোগাড় করে উঠতে পারি নি। সোনা এক ভরি কম পড়েছে। আর বরপণের জন্যে কোনোরকমে পঁচাত্তর টাকা যোগাড় হয়েছে। আমি বিয়ের পর নিজেই সব কিছু বলে—

—থাক, খুব হয়েছে। ভগবান বাঁচিয়েছেন! জোচ্চোর আর কাকে বলে?

—আপনি আমাকে যা ইচ্ছে হয় বলুন, যা শাস্তি দিতে চান দিন। কিন্তু কচি মেয়েটার মুখের দিকে একবার দয়া করে তাকান, সে তো কোনো অপরাধ করে নি—

—সে করেনি, তার বাবা তো করেছে। তার ফলভোগ কে করবে?

—আপনি মেয়েটাকে ভাসিয়ে দেবেন না। তাকে আপনি পায়ে ঠেলবেন না।

—জোচ্চোরের কথায় আর আমি ভুলছি না। একেবারে যাকে বলে সেই মিটমিটে শয়তান্! আর একটু হলেই বেবাক বোকা বনে যাচ্ছিলাম আর কি!

—বামুনকে জাতে মারবেন না। দয়া করুন।

—আমার দয়ার বিশেষ খ্যাতি নেই। আমার মেয়ের বিয়ের বেলায় কেউ দয়া করেনি। তাছাড়া যার কথার কোনো দাম নেই, তার সঙ্গে আমি কোনোরকম আত্মীয়তা করতে রাজী নই। হাত ছাড়ুন, আমাদের যেতে দিন।

এমন সময় বাইরে থেকে চড়া গলার আওয়াজ আসতে লাগলো। 'এমন অখ্যাচ্ছি জীবনে খাইনি, মশায়' 'আমরা কি ভিখিরি নাকি' 'উঠে পড়ুন, এ অচ্ছেদ্যা'র খাচ্ছি গলা দিয়ে নামবে না'—এই সব বলতে বলতে বরযাত্রীরা রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালো। বিয়ে বাড়ী হট্টগোলে ভরে গ্যালো। ছেলের বাবা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

—চলো বাবা অরুণ, এখানে আর একদণ্ডও থাকা নয়। এই ধড়িবাজ বামুন আমাদের ধাপ্পা দিয়েছে এবং বরযাত্রীদেরও অপমান করেছে! এই মাসেই ভালো ঘর দেখে তোমার বিয়ে দেব। চলো।

—কিন্তু, বাবা—

—আমি এক কথার মানুষ। কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ো।

এর পর আর বরের গলা দিয়ে কথা সরলো না। বরের বাপ, বর ও বরযাত্রীরা দল বেঁধে বিয়ে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিয়ে বাড়ী একেবারে ফাঁকা। মালুর বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মালুর মা সবই শুনেছে। সে বেচারা দাবায় বসে রয়েছে—তার চোখে দৃষ্টি নেই, শরীরেও নেই প্রাণের স্পন্দন। রাণাকে আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মালু—এক ফাঁকে উঠে গিয়ে কোথায় যে মুখ লুকিয়েছে তা কেউ জানে না। আত্মীয়-স্বজন এবং যজমানেরাও কি যে করবে তা ভেবেই পাচ্ছে না। গোটা বাড়ীটাই যেন সব-হারানোর দুঃখে একেবারে বোবা হয়ে গেছে।

যজমানদের চেষ্টায় খানিক পরে মালুর বাবার জ্ঞান ফিরে এলো। কয়েক মিনিট ধরে বেচারী বুঝতেই পারলো না যে কি অঘটন ঘটে গেছে। তারপর সব কিছুই তার মনে ভেসে উঠলো। দারুণ দুঃখের আঘাতে ডুকরে কেঁদে উঠলো ব্রাহ্মণ—'মা মালু, আমি বাপ হয়ে তোব কি সব্বোনাশই না করলুম'। যজমানেরা বোঝাতে চেষ্টা করে—'ঠাকুর মশায়, যা হবার হয়েছে। ভগবান মারলে আর কে বক্ষে করবে? এখন উঠুন, আপনি অধৈর্য্য হয়ে পড়লে, গিন্নি-মাকে কে দেখবে?' তাদেব কথা শুনে ব্রাহ্মণ গিন্নির দিকে চোখ তুলে তাকালো। দুখে অপমানে গিন্নি যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছে। অনেক ডাকাডাকিতেও গিন্নির কাছ থেকে কোনো সাড়া এলো না। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেলো ব্রাহ্মণের। তাহলে কি গিন্নিকে আর বাঁচানো যাবে না! কি উপায়? মালুটাই বা কোথায়? খোঁজা খুঁজি করে মালুকে ঘরের মধ্যেই পাওয়া গ্যালো। সে বেচারী বিয়ের জামাকাপড় পরেই শুয়ে আছে। সে কি পুরোপুরি বুঝেছে যে বিধাতা আজ তার কপালে এক দারুণ অভিশাপ এঁকে দিয়ে গেলেন? সে কি জানে যে এই অভিশাপের কালো দাগ এ জীবনে আব উঠবে না? তার গরীব বাবার অপমানের ও লাঞ্ছনার যে আর কিছু বাকী নেই, তা অবিশ্যি সে বুঝতে পেরেছে। ডাকাডাকিতে সে উঠে দাঁড়ালো। বাপের হাত ধবে আস্তে আস্তে মার কাছে এগিয়ে এলো। মেয়েকে দেখে মার বুক ভেঙে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো—'মালু, মা' তারপর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে মার সে কি কান্না। 'তোর যে সব্বোনাশ হয়ে গ্যালো হতভাগী। কি কুক্ষণেই না তুই জন্মেছিলিস্। এ জীবনে আর

তোকে কেউ বিয়ে করবে না। তোর এ কালামুখ কেউ দেখবে না। ঘরের কোণে বসে কেঁদে কেঁদেই তোর গোটা জীবনটা কাটাতে হবে। উঃ মা কালী।' হাঁফ ছেড়ে আবার মা আরম্ভ করে—'এর থেকে যদি

তুই আমার কোল খালি করে চলে যেতিস। সে আঘাতও আমার সহ্য হতো যমের হাতে দেওয়াও এর থেকে অনেক ভালো ছিলো। এই বয়েসেই তোর সাদ আহ্লাদ সব ঘুচলো। এ আমি কি করে সহ্য করি, ভগবান? আর তোর এই মুখ আমি চোখের সামনে জীবন ভোর কি করে দেখবো?' মালু গুম হয়ে বসে শোনে। মালুর বাবা নিজের দুঃখ ভুলে গিন্নিকে বোঝায়। কিন্তু মায়ের প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানে না। রাণা যে কখন এসে তার পাশে চুপ করে বসে আছে, তাও মার খেয়াল নেই।

॥ ৮ ॥

দুঃখ শোকের রাতও এক সময় শেষ হয়। প্রভাত হয়, সূর্য্যও উঠে। ব্রাহ্মণের বেলায়ও এ নিয়মের কোনো নড়চড় হলো না। শেষ রাতে শোকে দুঃখে কাতর হয়ে নিজেদের অজান্তেই যে যেখানে ছিলো, একটু আড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। দিনের আলো ফুটতেই সকলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলোও কিন্তু কোনো কাজেই কারুর হাত-পা আসছে না। কি সব্বোনাশ

যে হয়ে গ্যালো তাই সবাই বসে বসে ভাবছে। পাড়ার দু'চার জন গিন্নি-বান্নীরা এসেছে। তারাই মালুর মাকে বোঝাতে থাকে—'কি আর করবে বলো, বৌ! এরকম করে বসে থাকলে কি আমাদের চলে! তোমাকে শক্ত হতে হবে নাও, উঠে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসো। মেয়েটাকে এখন একটু দেখতে হবে যে? কাল থেকে ঐ একফোঁটা মেয়েটার উপরও ধকল তো কম যায় নি।' চকিতে মার প্রাণ কেঁদে ওঠে—'তাইতো। মালু বেচারা কাল থেকে কিছুই বিশেষ মুখে তোলে নি।' টলতে টলতে মা এগিয়ে চলে খিড়কির পুকুরের দিকে। বর্ষার জলে পুকুর একেবারে ভরা ভর্তি। পুকুরে নামতে গিয়ে মার হঠাৎ নজরে পড়লো যে মালুর বিয়ের শাড়ীটা যেন জলে ভাসছে। মা 'মালু' বলে চীৎকার করে উঠে—জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গ্যালো। দৌড়ে এলো মালুর বাবা। কোথায় মালু? ঘরে তো সে নেই। হাঁকাহাকিতে পাড়ার লোকজনও জড়ো হলো। পুকুরের জল তোলপাড় করে শেষে পাওয়া গ্যালো মালুকে। কিন্তু তার ছোট্ট দেহটা ছেড়ে প্রাণ অনেক আগেই চলে গেছে!

॥ ৯ ॥

সন্ধ্যে তখনও লাগেনি। দিনের আলো একেবারে মিলিয়ে যায়নি। এমন সময় চৌধুরী মশায়ের নৌকো যুগলকিশোরের ঘাটে এসে নোঙোর বাঁধলো। চৌধুরী মশায় মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে যাচ্ছেন নিজের কাছে। অল্পবয়সী মেয়ে। বিয়ের পর পুরো একটা বছরও ঘোরেনি। চৌধুরীমশায় নিজে ব্যবসা করে বেশ দুপয়সা কামিয়েছেন। মেয়েকে দেখেশুনে পয়সাওয়ালা ঘরেই বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে বাপের সঙ্গে গা ভর্তি গয়না পরে চলেছে। ব্যাক্স-প্যাঁটরায় ঠাসা কাপড় চোপড়। মেয়ের আর তর সয় না। কিন্তু বাড়ী পৌঁছোতে যে এখনও অনেক দেরী। সাত তাড়াতাড়ি নৌকোটা আবার এ ঘাটে থামে কেন? মেয়ে বাপকে প্রশ্ন করে—

—এখানে কেন থামলে বাবা? এখন তো সবে সন্ধ্যে। একটু তাড়াতাড়ি বেয়ে গেলে আমরা দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ী পৌঁছে যেতাম।

—তা হয় না মা! সামনে ব্রহ্মডাঙ্গা। রাতে ব্রহ্মডাঙ্গা পার হয়ে যাবার মতো বুকের পাটা আমার নেই।

—কেন বাবা ?

—ওমা, কি মেয়েরে তুই ? শুনিসনি যে ব্রহ্মডাঙ্গাই হলো রাণা সর্দারের ঘাঁটি। রাতের বেলায় নৌকো দেখলেই, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাণার দল।

—কিন্তু আমাদের সঙ্গে মাঝি-মাল্লারা রয়েছে। অতো ভয় কিসের ?

—মা, রাণা সর্দার বড় জবরদস্ত ডাকাত। তাকে রোখা দু'চারজন মাঝি-মাল্লার কম্মো নয়। কি বলো হে মাঝি ভাই ?

তা যা বলেছেন, কত্তা ! তবে দিদিমণি যখন সঙ্গে রয়েছেন, তখন আর ভয়ডা কি ?

—মানে ? দিদিমণি কি লাঠি ধরে ডাকাতদের রুখতো ?

—আজ্ঞে, তা নয়। তবে রাণা সর্দার মেয়েদের খুব মান্য করে। তাদের গায়ে হাত তোলে না।

—তাবলে ডাকাতদের মন মেজাজের ওপর ভরসা রাখা যায় না। কখন যে তারা কি করে বসে তা কি বলা যায় ?

—মাফ করবেন, কত্তা। রাণা সর্দারের বেলায় দিব্যি করেই বলা যায় যে মেয়েদের গায়ে সে কিছুতেই হাত দেবে না তার কারণও আছে, কত্তা !

—কি রকম ?

—রাণা সর্দার হলেও তার বয়স বেশী নয়। যখন সে বারো-তেরো বছরের ছেলে, তখন তাদের বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। হ্যাঁ—বলতেই ভুলে গেছি যে রাণাদের বাড়ী ছিলো এই বেম্মডাঙাতেই। রাণা আবার বেরাম্ভনের ছেলে। পেরায় দশ-পনেরো বছর আগেকার কথা। রাণার ছোটো বোন মালতীর বে। কিন্তু দেনা পাওনা নিয়ে বিয়ের আসরেই বরকত্তা বেঁকে বসলো। গরীব বেরাম্ভনের চোখের জলেও কিছু কাজ হলো না। পিঁড়ি থেকে বর উঠে পড়লো।

—বলো কি ! সে যে সব্বনেশে কথা ?

—এ তো সবে সব্বোনাশের শুরু ! বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গ্যালো। ভোরের দিকে মালতী খিড়কির পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আপ্তঘাতী হলো।

—নারায়ণ, নারায়ণ ! মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ী ফিরছি, আর এসব কি অলুক্ষণে কথাবার্তা আরম্ভ করলে তুমি ! দ্যাখো তো মেয়েটা কেঁদেই সারা।

—কেঁদে আর কি হবে দিদিমণি? ভগবানের মার! কে কি করবে বলো? বাড়ীতে যেন বাজ পড়লো। বাপ-মা শোকে একেবারে তখন পাগলের পারা। তারপর অবিশ্যি সময়ের গুণে তারা একটু একটু করে সামলে উঠলো। কিন্তু শোকটা রাণারই সব থেকে বেশী লেগেছিলো—পিঠোপিঠি ভাই বোন তো। সে কিছুদিন গুমরে গুমরে থেকে, হঠাৎ উধাও হয়ে গ্যালো। তারপর বছর দশেক পরে সে বেম্মডাঙ্গায় ফিরে এলো। তখন তার তিনকুলে আর কেউ নেই—সব মরে গেছে। সেও একজন পাকা ডাকাত বনে গেছে—

—বুঝলাম। কিন্তু তার দয়ামায়ার কথাই তো বললে না!

—ঐ দেখুন কত্তা! আবার বেব্‌ভুল হয়ে গিছি। রাণা এদিকে আবার মা কালীর বেজায় ভক্ত। ডাকাতি সে করে ঠিকই। কিন্তু টাকা পয়সার অভাবে কারুর মেয়ের বে হচ্ছে না শুনলে সে বেচারা আজও থির থাকতে পারে না। নানান ফন্দি ফিকির করে সে মেয়ের বাপকে সাহায্য করে। এমন লোক কি মেয়েদের ওপর জুলুম করতে পারে, কত্তা?

—বাবা, আমি রাণা-ভাইকে দেখতে চাই।

মেয়ের কথা শুনে চৌধুরী মশায় এবার এক প্রাণ-খোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন। লজ্জা পেয়ে মেয়ে তখন বলে—

—তুমি বুঝছো না, বাবা! রাণা সর্দার ঝিউড়ি মেয়েদের মধ্যে তার বোন মালতীকেই যেন দেখতে চায় তাই তাকে রাণা-ভাই বললে দোষ কি?

ডাকাতকে ভাই বলা দোষের না হাসির সে কথা আমাদের বিচার করার দরকার নেই। রাণার দুঃখটা যে তাঁর মেয়ের মনে বেজায় বেজেছে এটা বুঝেই চৌধুরী মশায় চুপ করে গেলেন।

॥ ১০ ॥

সত্যিই কি রাণা সর্দার কম বয়সের বৌ-ঝিদের বোনের মতো দেখতো? গরীব গুর্ব্বো মানুষদের সে কি সত্যিই কন্যেদায় থেকে উদ্ধার করতো? কিন্তু খালি হাতে তো মেয়ের বে হয় না। সে টাকাকড়ি ও গয়নাপত্তরই বা রাণা পেতো কোত্থেকে? রাণা-ডাকাতের খোঁজখবর নিলে হয়তো এসব প্রশ্নের জবাব মিলতে পারে।

ব্রহ্মডাঙ্গার এক জঙ্গলের ভেতরেই রাণা সর্দারের আস্তানা। বিরাট একটী বটগাছ জঙ্গলের মাঝ বরাবর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছের নীচে ছোট্ট একটী কালীপ্রতিমা। রাণা পুজো সেরে তার দলবলের সঙ্গে শলা পরামশ্শো করতে বসেছে। সূর্য তখন পশ্চিমে হেলেছে, কিন্তু পাটে নামে নি। সবাই কানখাড়া করে সর্দারের কথা শুনছে—

—অনেক বছর পরে বেম্মোডাঙ্গায় ফিরে এসে দেখছি যে মোটামুটি সব ঠিকই আছে। বাবা-মা অবিশ্যি মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। কিসের টানেই বা আর বেঁচে থাকবেন? যাক্ সে কথা। এই বটগাছটা কিন্তু বহুকাল ধরে চুপচাপ এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে সব কিছু চোখ মেলে দেখছে।

হাবুল, সর্দারের একেবারে ডান হাত। সে সাহস করে জিজ্ঞাসা করে—

—কি এত দেখছ সর্দার?

—দেখার জিনিষের কি আর শেষ আছে রে! পঞ্চাশ বছর আগে মেয়ের বে দিতে বাপের ভিটেমাটী চাটি হয়ে যেতো। আজও সে ব্যবস্থার কিছু তেমন বদবদল হয় নি। এটা কি দেখার মত ব্যাপার নয় একটা? হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে।

—কি সর্দার?

—নিবারণ বাঁড়ুজ্যের মেয়ের বে'এর দিন দু'য়েক মাত্তর বাকী। আমি তার মেয়ের বে'র সব ভার নিয়েছি। কিন্তু কদিন যেন কিছুই জুটছে না। জানি না মা কালীর কি ইচ্ছে! কিছু খবরটবর যোগাড় করতে পারলি তোরা?

—একটা খবর আছে, সর্দার। ওলা গাঁয়ের রতন প্রামাণিক তার মেয়েকে নিয়ে বলাগড়ের পথে রওয়ানা দিয়েছে।

—বলাগড়ের দিকে কেন?

—বলাগড়ে তার মেয়ের শ্বশুর বাড়ী। বড়লোকের মেয়ে যাচ্ছে। গা ভর্তি গয়না তো তার থাকবেই। সঙ্গে টাকাকড়িও থাকতে পারে।

—বুঝলাম। তোদের কতবার না হুঁশিয়ার করে দিয়েছি যে মেয়েছেলের গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। আর বেম্মোডাঙ্গার ঘাটের নামে ভয়ে লোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রামাণিক মশায় সন্ধ্যের পরে এ ঘাটের আশেপাশে নৌকা ভেড়াবে কি?

—তাহলে কি সর্দার, আজও আমাদের নিজ্জলা একাদশী?

—বাজে বকিস নি। প্রামাণিক মশাই লোক লস্কর নিয়েই যাতায়াত করে। তাই হয়তো সন্ধ্যে লাগার পরও বেম্মোডাঙ্গার ঘাট পেরিয়ে যাবার মতলব তার থাকতেও পারে। দেখাই যাক্ না। তোরা সব ছিপ নৌকোগুলি তৈরী রাখগে। আমিও গেলাম বলে। তবে প্রামাণিক মশায়ের মেয়ের গায়ে হাত না দিয়েই কাজ ফতে করতে হবে।

—সে কি করে হবে সর্দার?

—সে হয় কি না হয়, আমি দেখবো। তোরা শুধু নৌকোটাকে ঘিরে ফেলবি। তারপর লোক লস্করদের আটকে রাখবি—বুঝলি?

—বুঝেছি, সর্দার।

—বেশ, তাহলে তোরা মা কালীর নাম করে হাঁটা দে।

হাবুলের ইসারায় ডাকাতেরা সব চূর্ণী নদীর দিকে চলে গ্যালো। রাণা সর্দারও উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলো। ভাবনা অবিশ্যি এখন তার একটাই। নিবারণ বাড়ুয্যের মেয়ের বে'র দায়দায়িত্ব সব কিছুই সে নিজে যেচে মাথায় তুলে নিয়েছে। এখন তার মুখ রক্ষে হলে হয়। এদিকে সন্ধ্যে লাগতে আর দেরী নেই। 'ইচ্ছেময়ী মা, সবই তোমার ইচ্ছে'—এই বিশ্বাসে ভর করে রাণা তাড়াতাড়ি নদীর দিকে এগিয়ে চললো।

॥ ১১ ॥

—যতই তাড়াহুড়ো করুন কত্তা, বেম্মডাঙ্গায় পৌঁছোতে আমাদের রাত হয়ে যাবে।

মাঝি-মাল্লাদের মুখে একথা শুনে প্রামাণিক মশায় রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। বাপের মনের অবস্থা বুঝে মেয়েই সাহস দিতে এগিয়ে এলো—

এতে ভয়ের কি আছে, বাবা? রাণা সর্দার কখনও মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না। গয়নাগাঁটি কি সে আমার গা থেকে জোর করে খুলে নেবে?

—কিছুই বলা যায় না, মা। হাজার হলেও ডাকাত তো বটে।

কিন্তু ডাকাতরাও সবাই একছাঁচে গড়া নয়। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে মাঝি-ভাইরা আছে। লাঠিয়াল দু'জনও সঙ্গে চলেছে।

—তা আছে বটে। তবে রাণা সর্দারের মুখোমুখি দাঁড়ালে এদের হাত থেকে হাল, দাঁড় লাঠি সব ঝপাঝপ খসে পড়বে।

—তা জানি না, বাবা। তবে সময় মতো বলাগড়ে পৌঁছোতে না পারলে আমায় অনেক গঞ্জনা সইতে হবে।

মাঝিরা কি বলো?

—আমরা আর কি বলবো, কত্তা? তবে দিদিমণি যখন বলছেন, তখন 'জয় মা কালী' বলে বেয়েই চলি।

তবে তাই চলো। নে মা, টাকার থলিটাও তোর কাছে রেখে দে। 'জয় মা কালী' 'জয় মা কালী'।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে। চূর্ণীর জল কালো অন্ধকারে ডুবে গেছে। ব্রহ্মডাঙ্গা আসতে আর দেরী নেই। প্রামাণিক মশায় ভয়ে ইষ্টনাম জপছেন। মাঝি-মাল্লারা ও লাঠিয়াল দু'জন ভয়ে ও উত্তেজনায় অস্থির। মেয়েটী শুধু টাকার থলিটি হাতে ধরে শান্তভাবে বসে আছে। বোধ হয় মনে মনে সে মা কালীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে—'আমার কথাতেই ভরসা পেয়ে বাবা মত দিয়েছে। দেখো, আমার মুখ রেখো মা।'

দেখতে দেখতে নৌকোটা ব্রহ্মডাঙ্গার ঘাট পেরিয়ে গ্যালো। বাঁচলো সবাই—যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। কিন্তু একি? হঠাৎ তিন-চারটে ছিপ তাদের নৌকোটাকে ঘিরে দাঁড়ালো। বেশ কয়েকজন ষণ্ডা মার্কা লোক লাফিয়ে পড়লো নৌকোর ওপর। তখন প্রামাণিক মশায় যা বলেছিলেন তাই হলো। মাঝি-মাল্লারা ভয়ে একেবারে কাঠ, মুখে টুঁ শব্দটী নেই।' তাদের বেঁধে ফেলতে ডাকাতদের কিছুই বেগ পেতে হলো না। ব্রহ্মডাঙ্গা পেরিয়ে যাবার পর লাঠিয়ালরাও লাঠি রেখে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই বসেছিলো। আচমকা লাঠির বাড়ী খেয়ে তারাও একেবারে কাবু। বিনা বাধাতেই ডাকাতরা তাদের বেঁধে ফেললো। প্রামাণিক মশায়ের তখন ডাক ছেড়ে কাঁদার মতো অবস্থা। তিনি হাতজোড় করে বলছেন—'বাবা, আমাদের যা কিছু আছে সব নাও। শুধু আমাদের প্রাণে মেরো না।' তিনি তো বলেই খালাস। কিন্তু মেয়ের গা থেকে গয়না খোলে কে? তাদের ঘাড়ের ওপর কটা মাথা যে সর্দারের হুকুম অগ্রাহ্যি করবে? এমন সময় স্বয়ং রাণা সর্দার এসে হাজির। 'সর্দার' 'সর্দার' রব শুনে মেয়েটী চোখ তুলে তাকালো। এই কি তাহলে সেই রাণা সর্দার। রাণা সোজা মেয়েটীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো—

—দিদি, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তোমার বড়ো ভাই।'

আমার নাম রাণা সর্দার তবে বড়ো বিপদে পড়েই তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।

—তুমি বাঁচালে রাণা ভাই। আমি সামান্যি মেয়েছেলে। আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি?

—আমার আর একটী ছোট বোনের দুদিন পরেই বে। তাই দু'চার খানা ভারী গয়না ও কিছু টাকা না হলে যে চলে না।

—এই কথা? এ আর এমন কি সমিস্যে?

মেয়েটী, তারপর, নিজের গা থেকে দুচারখানা ভারী গয়না খুলে রাণার হাতে তুলে দিলো। থলে থেকে বার করে এক আঁজলা টাকাও দিলো রাণার হাতে। আবেগে তখন তার চোখ দুটী জলে ভরে উঠেছে এবং গলাও বুঁজে এসেছে। কোনোরকমে সে বললো—এই তুচ্ছ গয়নাগুলো যে এমন সৎকাজে লাগবে তা কোনো দিন ভাবিনি। এতে কাজ মিটবে তো রাণা ভাই?

—এর দাম অনেক, দিদি। কাজ আমার এতে ভালোভাবেই হয়ে যাবে। কি আর বলবো দিদি! মা কালী তোমাকে রাজরানী করুন।

রাণা সর্দার ফিরে দাঁড়িয়ে ইসারা করতেই তার দলবল তাড়াতাড়ি মাঝি-মাল্লা ও লাঠিয়ালদের বাঁধন খুলে দিলো। তারপর রাণা সর্দার সদলে তাদের ছিপে উঠে—অন্ধকারে মিলিয়ে গ্যালো।

প্রামাণিক মশায় ততক্ষণে সামলে উঠেছেন। মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি মোটেই খুশী হন্ নি। ডাকাতরা চলে যেতে তিনি সাহস পেয়ে বল্লেন—

—তা বলে মা তুই নিজের হাতে গয়নাগুলি খুলে দিলি? '

না দিলে যে মান ইজ্জৎ সবই যেতো। রাণা হাজার হলেও ডাকাত তো বটে!

প্রামাণিক মশায় নিজের কথাই ফেরত পেয়ে চুপ করে গেলেন। '

॥ ১২ ॥

মাঘমাসের শেষ। লোকে কথায় বলে মাঘের শীতে বাঘে কাঁপে। এখানকার দিনে, বিশেষ করে শহরবাজারে, মাঘের শীতে মানুষেও কাঁপে না। শীতের আর দাঁত থাকে না। বেচারা শীত বুড়ো লোকের মতো তখন যাবার দিন গোনে। কিন্তু তোমরা প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার গল্প শুনছো, তো। তাও আবার জঙ্গলে এক পাড়াগাঁয়ের গল্প—শহর-বাজারের কাহিনী নয়। সে সব জায়গায় তখন সত্যিই মাঘের দুরন্ত শীতে লোকজন হি হি করে কাঁপতো। এমনি এক শীতের দুপুরে একজন সন্ন্যাসী হন হন করে গাঁয়ের পথ ভেঙে চলেছেন। হাতে লাঠি, কাঁধে ঝোলা ও পরনে গেরুয়া কাপড়। যখন তিনি ব্রহ্মডাঙ্গার মাইল দশেক দূরে বত্তিপুরে গিয়ে হাজির হলেন, তখন বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে।—সন্ন্যাসী ঠাকুরের গাঁ-ঘর সবই যেন চেনা। তিনি সোজা বিমল চাটুয্যের বাড়ীর সামনে গিয়ে হাঁক দিলেন—'জয় হোক, মাঠাকরোণ'। বিমল চাটুয্যে ছাপোষা গোছের লোক। স্ত্রী ও একটী বছর পনেরোর ছেলেকে নিয়েই তার সংসার। ছেলেটী ভালো—গাঁঘরে সবাই তাকে ভালোবাসে। আর সম্পত্তি বলতে ঐ ছোট্টো মেটে বাড়ীটা। চাটুয্যে মশাই আজ এখানে কাল ওখানে পূজো-আর্চ্চা করে যা ঘরে আনে, তাতেই তাদের পেট তিনটে কোনোরকমে চলে যায়। সে যাহোক তখন চাটুয্যে মশাই বাড়ীতে নেই। হাঁক শুনে মা ও ছেলে দুজনেই বাইরে বেরিয়ে এলো। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখে দুজনেই তাঁকে প্রণাম করলো। ছেলেটী তাড়াতাড়ি একখানি আসন এনে দাবায় বিছিয়ে দিলো। শ্রান্ত সন্ন্যাসী আসনে বেশ আয়েস করে বসে বললেন—

—মা, তোমার ছেলের সুসময় এলো বলে। দুচার দিনের মধ্যেই তার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে।

—সুসময়ের মুখ আমরা কখনো দেখিনি সন্ন্যিসি ঠাকুর। কোনো-রকমে মাথা গুঁজে আমরা দিন কাটাচ্ছি।

—আমি সন্ন্যিসি নই, মা। আমি সামান্যি লোক। ঘর সংসার করিনি। মাকালীর নাম জপ করি। আর বাড়ী বাড়ী ঘুরে লোকের হাত দেখে ও ভিক্ষে-সিক্ষে করে যা পাই, তাতেই আমার হেসেখেলে দিন চলে যায়।

তা বাবা, দয়া করে আমার বাছার হাতটা একটু দেখবেন?

সন্ন্যাসী ঠাকুর বেশ যত্ন করে অনেকটা সময় নিয়ে ছেলেটীর হাত দেখলেন। তারপর হাসিমুখে বলতে লাগলেন

—যা বলেছি মা, ঠিক তাই। আজ হলো গিয়ে মঙ্গলবার। আসছে শুক্কুরবারেই বাবাজীর বে। তারপর থেকেই তার নোতুন জীবন শুরু হবে।

—বলেন কি, বাবা? বাছার বে'র কোনো কথাই এখনো আমরা ভাবিনি।

—তোমার আমার ভাবায় কি এসে যায় মা! যাঁর ভাববার কথা, তিনি ভাবলেই তো হলো।

—এ অবিশ্যি লাখ কথার এক কথা। তবে মাঝে মাত্তর আর দুটো দিন, কনেরও কোনো খোঁজ নেই—

—বুঝেছি মা, আমার কথায় তোমার বিশ্বেস হচ্ছে না। তবে শোনো মা, বছর পাঁচেক আগে বাবাজী একবার নদীতে ডুবে যেতে যেতে কোনো রকমে রক্ষে পেয়ে গেছে। তারও বছর দুই পরে বাবাজীকে নিয়ে একবার যমে মানুষে টানাটানি হয়েছে। যম হেরে গিয়ে যা শিক্ষে পেয়েছেন, তাতে বছর পঞ্চাশেকের আগে আর তিনি বাবাজীর দিকে তাকাতে সাহস করবেন না। বুঝলে, মাঠাকরোণ?

এই বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর ভরাট গলায় প্রাণ খুলে হেসে নিলেন। চমকে উঠলো মাঠাকরোণ। তার বুঝতে বাকী রইলো না যে এই গণক ঠাকুরের কথা হেলাফেলা করার নয়। কবে তার বাছার কি বিপদ হয়েছে এসব একেবারে ঠিক্ ঠিক্ বলে দিচ্ছেন যিনি, তিনি একটা যে সে লোক নন্। তাই গড় হয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করে সে বলে—

—অপরাধ নেবেন না বাবাঠাকুর। আমি মুখ্যুসুখ্যু মেয়েছেলে, না

বুঝে কি বলতে কি বলেছি। তবে বাবা আমার বাছার বে'টা হবে কোথায়?

—অতো বিদ্যে আমার নেই, মা। তবে মা কালী আমার মুখ দিয়ে যা বলেছেন তা হবেই। এবং মাই যা করার তা করবেন। তোমার ভাবনা চিন্তে করার ঠ্যাকাটা কি মাঠাকরোণ এবার? তাহলে উঠি!
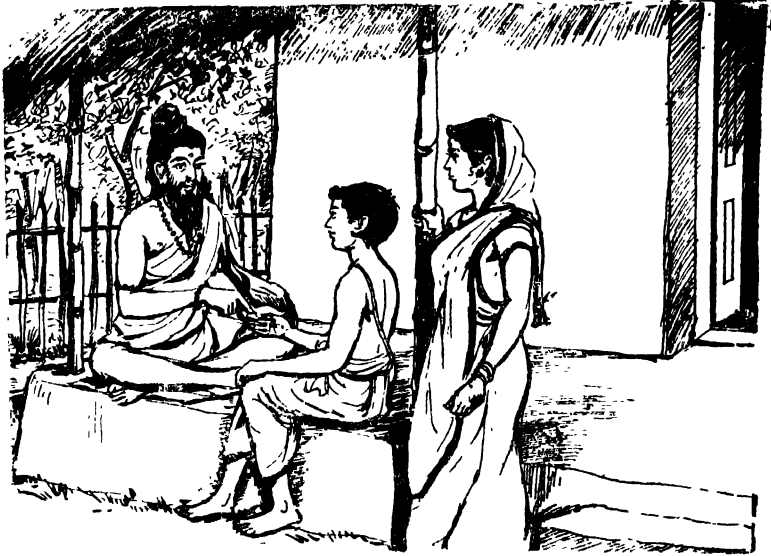
—না, বাবা, সে কি! একটু দাঁড়ান বাবা।

এই বলে চাটুয্যে গিন্নী একটা ছোটো থালা করে চাল নিয়ে এলো। সন্ন্যাসী ঠাকুরও এগিয়ে গিয়ে ঝোলা পেতে ভিক্ষে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর 'জয় হোক মাঠাকরোণ' বলে আশীর্ব্বাদ করে পথের দিকে পা বাড়ালেন। খর পায়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। অনেকটা পথ তাঁকে এখন ভাঙতে হবে। সূর্য্য ডোবার আগে নিজের ঘরে পৌঁছাতে না পারলে শীতে যে একেবারে কালিয়ে যাবেন তিনি।

॥ ১৩ ॥

মাসুণ্ডা গাঁয়ের রাখহরি চাটুয্যের মেয়ের বে। গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের বে'তে জাঁকজমকের কোনো বালাই নেই। তার ওপর—বে'র লগ্ন সেই রাত দুপুরে। কাজেই বিয়ে বাড়ীও কেমন যেন ঘুমে ঢুলছে। হঠাৎ 'বর

এসেছে', 'বর এসেছে' শুনে বিয়ে বাড়ী ঘুম ছেড়ে উঠে বসলো, কর্ত্তা ব্যক্তিরা হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলেন, এবং পাড়াপড়শীরা তুচারজন এসে জড়ো হলো। বাঁড়ুয্যে মশায় আমাদের গরীব বলে কি হবে, একেবারে যাকে বলে সেই নিখাদ কুলীন ব্রাহ্মণ। কাজেই কুলরক্ষা করাই তাঁর প্রধান কর্ত্তব্য। সেই গুরুতর কর্ত্তব্যই, তাঁকে আজ পালন করতে হচ্ছে। তাঁর ন বছরের মেয়ে মাধবীকে সম্প্রদান করতে হবে এক তেকেলে বুড়োর হাতে। বুড়োও একেবারে জাত-কুলীন ব্রাহ্মণ। শুধু তাই নয়। বুড়োর শরীরে দয়ামায়ারও অভাব নেই। তিনি স্রেফ শাঁখা সিঁতুর পরিয়ে মাধবীকে বে' করে নিয়ে যেতে এসেছেন। একটু বড়সড় মেয়েই অবিশ্যি তিনি খুঁজছিলেন। আগের পক্ষের তু'তুজন পরিবার গত হয়েছেন বটে। কিন্তু তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের তুটী ছেলেকে। তারা এখন বড় হয়েছে। কাজেই বুড়োর সংসার তো ছোটো নয়। বুড়োর ইচ্ছে ছিলো যে তাঁর নতুন বৌ এসেই হেঁসেলের হাঁড়ি ও সংসারের হাল তুই-ই বেশ পোক্ত হাতে ধরবে। কিন্তু তা আর হলো কই? কুলীনের ঘরের মেয়েদের যে আট-ন বছর বয়সেই বে'র বাজনা বেজে ওঠে। কুলের মুখে কালি দিয়ে তিনি তো আর যার তার মেয়েকে ঘরে আনতে পারেন না। বাঁড়ুয্যে মশাই অভাবী লোক। এর থেকে ভালো কুলীন জামাই তাঁর বরাতে জুটবে কোথায়? কাজেই জামাই'এর বয়েস নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তিনি মাথা নেড়ে রাজী হয়ে গেলেন। মেয়ের মা বুঝলেন যে মেয়ের কপাল পুড়লো। কিন্তু হা-হুতাশ করা ছাড়া তিনি আর করবেন কি? হা-হুতাশ করে তো আ'র নিয়তিকে ঠেকানো যায় না। তাই ঠিক দিনের দিনও যথাসময়ে বর এসে হাজির। ছাঁদনাতলায় বেজে উঠলো মাধুর বে'র শাঁখ।

এমন সময় শাঁখের আওয়াজকে ছাপিয়ে কানে এলো এক দারুণ অলুক্ষণে রব—হা রে রে রে—'। বে' বাড়ীর লোকজন সব ভয়েতে যেন একেবারে বোবা। বাঁড়ুয্যে মশাই চোখ বুঁজে ইষ্ট নাম জপতে আরম্ভ করে দিলেন। ভাবলেন—এ আবার কি উৎপাত? কিন্তু বেশী ভাববার আর সময় কোথায়? হুড়মুড় করে লাঠি হাতে কারা সব এসে দাঁড়িয়ে গ্যালো একেবারে ছাঁদনাতলায়। কি ভীষণ চেহারা তাদের—জমকালো গোঁফ, মাথায় বাবরী চুল, কপালে সিঁতুরের টিপ আর ইয়া বুকের ছাতি। বরের দলবল তখন মণ্ডা মেঠাই এর লোভ ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু

পালাতে দিচ্ছে কে? বাজের মতো আওয়াজ হলো—'খবরদার'। আর যে যেখানে ছিলো সব যেন পটে আঁকা ছবির মতো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বর বেচারার তো আগেই দাঁতকপাটি লেগে গেছে। কনে কি বুঝলো সেই জানে। সে একবারে চুপচাপ। কনের মার রকমসকম দেখেও কিছু বোঝার উপায় নেই। মিনিট খানেকের মধ্যেই অবিশ্যি সবাই বুঝতে পারলো যে ব্যাপারটা কি। বাবরী চুলওয়ালা একজন বাঁজখাই গলায় বললো—

—আমি রাণা সর্দার।

সঙ্গে সঙ্গে দলের লোক গর্জ্জে উঠলো—'জয়, মা কালীর—জয়। জয়, রাণা সর্দারের জয়।'

হাঁউমাউ করে একেবারে সর্দারের পায়ে লুটিয়ে পড়লো আমাদের বাঁড়ুয্যে। সর্দার চোখের নিমেষে সরে দাঁড়িয়ে বলে—

—আহা, করো কি? তুমি যে একে বেরাম্ভন, তার ওপর কুলীন! ডাকাতের পায়ে পড়লে তোমার জাত যাবে না!

—কিন্তু সর্দার বে পণ্ড হলে যে জাতও যাবে এবং মেয়ের আমার কপালও পুড়বে।

—বটে। একটা বুড়ো হাবড়া লোকের সঙ্গে ধরে বেঁধে মেয়েটার যে বে দিচ্ছিলে—

—কি করবো, সর্দার? বাপ হয়ে এই নিদ্দয় কম্মো কি লোকে সাধ করে করে? ভগবান জানেন—

—রাখো ও সব কথা। ভগবান কি জানেন তা তোমার মুখে শুনতে চাই না। মাধুদি, তুমি ঘরের ভেতর যাও তো দেখি। তোমার কোনো ভয় নেই। মা কালীই তোমাকে রক্ষে করবেন।

মাধু ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গ্যালো। সর্দার তখন পড়লো বরকে নিয়ে। বললো—

—কি হে বর বাবাজী। আর একটু হলেই তো একটা কচি মেয়ের সব্বোনাশ করে বসেছিলে। তোমার না তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! যাক্ সে এককালও আজ আমরা খতম করবো। কেলো…

—হুকুম করো, সর্দার।

লাঠি ঠুকে এগিয়ে এলো কেলো। বর বাবাজীর অবস্থা তখন কাহিল। মুখ দিয়ে রা সরছে না, হাত পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে আর চোখের সামনে

থেকে থেকে ভেসে উঠছে রাশি রাশি সরষে ফুল। কোনো রকমে কটা কথা ঘড় ঘড় আওয়াজ করে তার গলা থেকে বেরিয়ে এলো—

—প্রাণে মেরো না সর্দার, দোহাই তোমার!

—তোমার মতো একটু ছুঁচোকে মেরে রাণা সর্দার হাত গন্ধ করে না। তাই তুমি আজ বেঁচে গেলে। কিন্তু ফের যদি—
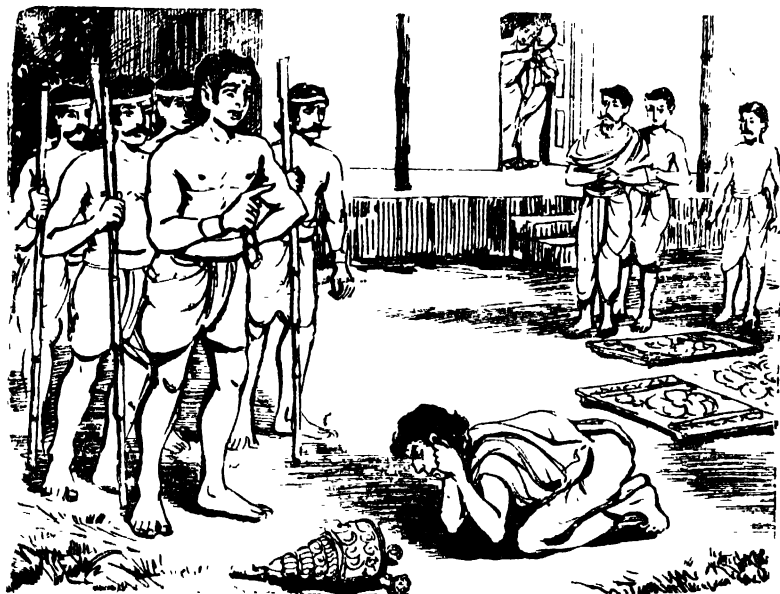
—না, সর্দার,—না। আমি এই নাকে কানে খত দিচ্ছি

তার কথা শুনে ও ভাবভঙ্গী দেখে ডাকাতরা সব হেসে উঠলো। কিন্তু সর্দারের দাবড়ানি খেয়ে তাদের হাসি মাঝ পথেই মাঠে মারা গ্যালো। সর্দারের মুখের চেহারা তখন ভীষণ হয়ে উঠেছে। সেদিকে যেন তাকানোই যাচ্ছে না। লম্বা এক নিঃশ্বাস ফেলে সর্দার ধীরে ধীরে বলে চললো···

—বর বাবাজী, তোমার দলবল নিয়ে এখুনি বিদেয় হও। মনে রেখো, আবার যদি কখনও বে'র তাল করো, তাহলে তোমার মাথাটা পাকা তালের মতোই মাটিতে গড়িয়ে পড়বে। বুঝলে এখন যাও।

বর বাবাজী তার দলবল নিয়ে বে বাড়ী থেকে বেরিয়ে দৌড়োতে আরম্ভ করে দিলো। এই বয়সে যে সে এমন দৌড়তে পারবে তা সে নিজেই জানতো না।

এবার আবার কনের বাবার পালা। তাঁর আর ভাবনার শেষ নেই। বর না হয় পালিয়ে বাঁচলো, কিন্তু কনে? সে বেচারা কি চেরোটা কাল আইবুড়ো হয়ে কাটাবে? মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই, আবার বাইরে

থেকে হল্লার আওয়াজ ভেসে এলো। কি কাণ্ড! দুনিয়ার যতো ডাকাত কি আজ সবাই তাঁর বাড়ীতে এসে চড়াও হবে না কি? হ্যাঁ, যা তিনি ভেবেছেন, ঠিক তাই!

জনা দশেক ষণ্ডামার্কা লোক। দেখলে লোকে ভয়ে ভিরমি যাবে—এমনি তাদের চেহারা। কিন্তু এ কি? তাদের সঙ্গে যে রয়েছে দু'জন ভদ্দর লোক। একজন মাঝবয়সের লোক; এর একজন তো দিব্যি ছেলেমানুষ—বয়স তার পনেরো ষোলোর বেশী হবে বলে মনে হয় না। তাদের দেখে সর্দারের মুখে এবার হাসি ফুটেছে। হেসেই সে বলে—

সাবাস্, হাবুল। সব ঠিক আছে?

দলের ভেতর থেকে একজন এগিয়ে এসে লাঠি ঠুকে জবাব ছায়—'মায়ের দয়ায় সব কাজই হাসিল করে এসেছি।'

সর্দারও জানতো যে হাবুলের ওপর যে কোন কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে থাকা যায়। সে যে তার সব থেকে সেরা সাকরেদ। তবুও সর্দার জিজ্ঞাসা করে—

—গায়ের জোর ফলিয়ে বসিস্ নি তো?

—না, সর্দার। তার কোনো দরকারই পড়ে নি। বামুন ঠাকুর একটু গাঁইগুঁই করছিলো বটে। কিন্তু বরের মা বেরিয়ে এসে বলে কি না—'এ যে নলাটের নেখন।—আমি বলেছিলাম না যে গণকঠাকুরের কথা মিথ্যে হবার নয়।' তাই শুনে বরের বাবা—

'বর. বর' শুনে চমকে উঠলো কনের বাপ। এ সব যে ভোজবাজি বলে মনে হচ্ছে। সর্দার তার অবস্থা বুঝে হেসে ফেলে বলে—

—অতো ছাইপাঁশ কি ভাবছো? দ্যাখো না, কেমন চাঁদপানা ছেলেটা। মাধুদির সঙ্গে মানাবেও ভালো। বলি, উঠে বে'র যোগাড়যন্তর করবে? না, হাঁ করে বসে থাকবে। দেরী করলে যে লগ্ন চলে যাবে। ডাকো, গিন্নিমাকে ডাকো। এই যে গিন্নিমা নিজেই এসে গেছেন।

এই বলে সর্দার এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে গিন্নিমাকে প্রণাম করে ভারী গলায় বলে—

আপনার চোখে জল কেন, মা? মাধুদিদিকে কি আমি জলে ফেলে দিতে পারি? এরা হলেন বড়িপুরের চাটুয্যে, আপনাদেরই পালটি ঘর। ছেলেটীর খবরও নিয়েছি। দেখতে শুনতে সে ভালোই। সব দিক থেকেই সে সুপাত্তর।

চোখের জল সামলে ঘোমটার ভেতর থেকেই বললেন মাধুর মা—

—বাবা তুমি যা করলে পেটের ছেলেতেও তা সব সময় করে না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

—চোর-ডাকাতের মঙ্গল করলে যে ভগবানের রাজত্বি থাকবে না, মা। তা সে যাক্, এবার মাধুদিকে সাজিয়ে ছাঁদনা তলায় আনার উয্যুগ করুন, মা। আরে, হেবলো, মাধু-দি কি খালি হাতে শ্বশুরের ঘর করতে যাবে?

—কি যে বলো, সর্দার! তাই কি হয়? তোমার হুকুম মতো সব কিছুই যোগাড় করেছি।

হাবুল তখন এগিয়ে একটি পুঁটলি খুলে গিন্নিমা'র পায়ের কাছে রাখলো।

পিদ্দিমের আলোতে ঝলসে উঠলো বেশ কয়েকখানা সোনার গয়না এক আঁজলা রূপোর টাকা। সবাই হতভম্ব। সর্দার হেসে বলে—

—এবার, খুশী তো চাটুয্যেমশাই! তবুও তো এখনো কনে দ্যাখেন নি। মাধুদিদি আমাদের যাকে বলে সেই অন্নপূর্ণা! দিদি আমার যার বাড়ীতে যাবে, তার আর দুঃখু কষ্ট বলতে কিছু থাকবে না। সংসার একেবারে উথলে পড়বে!

—সর্দার!

—কি রে হেবলো?

—সর্দার। আমি বুদ্ধি করে বরের জন্যে একজোড়া কাপড় ও চাদরও এনেছি।

এবার সর্দারের হার মানতে হলো। সর্দার খুশীতে যেন ফেটে পড়ে আর কি! হাবুলের পিঠ চাপড়ে বলে—'শোন্, সব, আমার পর এই হাবুলই হবে তোদের সর্দার।' সবাই লাঠি ঠুকে যেন জানালো 'ঠিক্ আছে, সর্দার।' কিন্তু একটা কথা কেউই তখন তলিয়ে দেখলো না। সর্দারের তো এখন যোয়ান বয়েস। এখনই হেবলোর সর্দার হবার কথা ওঠে কেন?

এদিকে তখন মাধুর মা বিয়ের উয্যুগ সেরে ফেলেছেন। মনে উৎসাহ থাকলে কাজ সারতে কি আর সময় লাগে। বরও নতুন কাপড় পরে চাদর গায় দিয়ে তৈরী। বরের বাবা ও কনের বাবা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। মনের খুশী তাদের মুখের হাসিতেই যেন উপছে পড়ছে। মাধু-দিদিও সেজগুজে বসে আছে। এমন সময় ভেতরে রাণার ডাক পড়লো। অবাক কাণ্ড আর কাকে বলে! আজ দুনিয়ার যতো কিছু অবাক কাণ্ড-

কারখানা সবই যেন দলবেঁধে বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে। রাণা গিয়ে দাঁড়াতেই তার মাধুদিদি বলে উঠলো—'রাণা ভাই'। গলা বুঁজে এলো রাণার। কোনোরকমে,—'সুখী হও, দিদি'—একটী কথা বলে রাণা আর দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি ছাদনাতলায় চলে এলো। চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে মশায়দের দিকে চোখ তুলে, বললো—'তাহলে, এবার আসি আমরা?' বাঁড়ুয্যে মশাই-এর হঠাৎ খেয়াল হলো। আরে, তাইতো? তিনি রাণার দুটো হাত ধরে বললেন 'সে কি হয় বাবা? আমরা বড়ই গরীব। কিন্তু তাবলে তোমাদের কি আজ মিষ্টি মুখ না করিয়ে ছেড়ে দিতে পারি?' রাণার কিন্তু তখন যেন আর তর সইছে না। সে বলে—'মুখে যে তুমি বললে, ঠাকুর, এই আমাদের অনেক। কিন্তু পাত পেড়ে বসে খাবার সৌভাগ্যি নিয়ে ডাকাতেরা জন্মায় নি।' তারপর রাণা সর্দার তার দলবলদের ইসারা করতেই সবাই 'জয় মা কালী' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সর্দার তার দলবল নিয়ে উধাও হয়ে গ্যালো।

ছাঁদনাতলায় আবার বেজে উঠলো বিয়ের শাঁখ। কনে দেখে চাটুয্যে-মশাই বেজায় খুশী। রাণা একতিলও বাড়িয়ে বলে নি—মা সত্যিই যেন সাক্ষাৎ অন্নপুণ্যা। বেহাইমশায়'কে তিনি তখন বলছেন—'এমন মাকে আপনি একটা তেকেলে বুড়োর হাতে সঁপে দিচ্ছিলেন? যাক হরিই আপনাকে ও মাকে রক্ষে করেছেন। বুঝেশুঝেই বাপ-মা আপনার নাম রেখেছিলেন—রাখহরি। সবাইকে চমকে দিয়ে দুজনেই হেসে উঠলেন।

এদিকে ডাকাতরাও যেতে যেতে হাসিতে যেন ফেটে পড়ছে। সর্দার বলছে—'দেখলি তো তোরা? গণকঠাকুরের পালাটা কি দারুণ জমেছিলো। গিন্নঠাকরোণ এক্কেবারে মাত।'

॥ ১৪ ॥

অতুল চৌধুরী গ্যাংনাপুর গাঁয়ের বেশ নামজাদা জমিদার। কিন্তু কলসীর জল গড়িয়ে খেলে আর কদিন থাকে? জমিদারির আয় তো আর দিনের দিন চড় চড় করে বেড়ে যাচ্ছে না। এদিকে সরিকের সংখ্যা যে বেড়েই চলেছে। তাই বলে, 'নামে তালপুকুর, কিন্তু ঘটি ডোবে না'—গোছের কাহিল অবস্থা এখনও অতুল চৌধুরীর হয় নি। তাঁর নামের

তালপুকুরে ঘটি আজও বেশ আওয়াজ করেই ডোবে, কিন্তু ঘড়া আর ডোবে না। তা সে না ডুবলেও, ঠাটবাট বজায় রেখেই তাঁকে চলতে হয়। নামের এমনিই মহিমা। আজ তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে তাই ঘটাপটার শেষ নেই। ঘটার সঙ্গে ল্যাঠাও আছে অনেক। 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ বলে কথা। সকাল থেকেই দানধ্যান শুরু হয়ে গেছে। দুপুরে হয়েছে ব্রাহ্মণ ভোজন। তারপর হলো পণ্ডিত বিদায়। বিদায়ের দান সামিগ্রি দেখে খুশী মনেই পণ্ডিতেরা চৌধুরী মশায়ের মার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করতে করতে এই সবে ঘরে ফিরে গেলেন। এখন চলেছে কাঙালী ভোজন। যে আসছে সেই পাত পেতে বসে যাচ্ছে। আর চৌধুরী মশায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাওয়ার তদারকি করছেন। এ পর্ব কখন যে শেষ হবে তা বলা যায় না। এদিকে দিন কিন্তু শেষ হতে চলেছে—সূর্য্য ডোবার আর বেশী দেরী নেই।

এমন সময় 'জমিদারের জয় হোক' বলে দুজন সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালো। জমিদার মশায় চমকে তাকালেন তাদের দিকে। দুজনেরই পরণে গেরুয়া ও কাঁধে ঝোলা। একজন বেশ রীতিমতো লম্বা ও ছিপছিপে গড়নের মানুষ। তার মুখের দিকে তাকালে মনটা যেন শান্তিতে ভরে ওঠে। কিন্তু লোকটা যেন হাঁটু ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে, একটা লাঠির ওপর ভর করে। অপর লোকটী একটী বেঁটে খেঁটে তাগড়া যোয়ান। তার হাতে চিমটে ছাড়া আর কিছু নেই। জমিদার মশায়ের ঘোর কাটবার আগেই লম্বা লোকটী কথা আরম্ভ করে—

—সাবাস বেটা! এই তো ছেলের উপযুক্ত কাজ। আমরা বেরিয়েছি তিথি করতে। গাঁয়ের লোকের মুখে শুনে ভাবলাম যে দেখিই না গিয়ে একবার।

—খুব ভালো করেছেন বাবা। দয়া করে যদি এসেইছেন, তাহলে একটু জিরিয়ে নিয়ে—

—হ্যাঁ, একটু জিরিয়ে না নিয়ে আর পারছিও না। আমি যে একজন ল্যাংড়া সন্ন্যিসি, বাবা।

—তা বেশ তো আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—তাই করো বাবা। তোমার মঙ্গল হোক। সবই মা'র ইচ্ছে। কোথায় চলেছিলাম কালীঘাটের কালীমা'কে দর্শন করতে, তা এখানেই দেখছি আটকে গেলাম। একটু তাড়াতাড়ি করো, বাবা। আমাদের আবার—

—সে কি হয়, বাবা! সন্ধ্যে লাগে-লাগে, এখন কি আপনাদের ছেড়ে দিতে পারি। আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে—

—আচ্ছা সে যা হোক হবে বেটা।

জমিদার মশায় ব্যস্তসমস্ত হয়ে ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন। সন্ন্যিসি দুজনকে ঘিরে তখন বেশ একটা ছোটোখাটো জটলা আরম্ভ হয়ে গেছে। সাধু-সন্ন্যিসি গোছের লোক দেখলে পাড়া-গাঁয়ে যা হয় আর কি। আমাদের বড় সন্ন্যিসিটী আবার কথা বলতে ওস্তাদ। মুখ বা হাত দেখে একটু আধটু বলতেও পারে। তাই দেখতে দেখতে লোকের ভিড় বেড়েই চলেছে। জমিদার মশাইকে আসতে দেখে অবিশ্যি সবাই সড়ে দাঁড়ালো। তিনি সন্ন্যিসি দুজনকে আদর আপ্যায়ন করে ভেতরের দিকে নিয়ে গেলেন। ভাগ্যে কি আছে তা আর জানতে না পেরে অনেকেই মন খারাপ করে যার যার বাড়ী চলে গ্যালো।

জমিদার মশাই সন্ন্যিসি ঠাকুরদের আদর যত্নের কোনো ত্রুটিই রাখলেন না। নিজে দাঁড়িয়ে থাকলেন, যতক্ষণ না তাঁদের সেবা শেষ হলো। কথাবার্তা যা বলার বড় সন্ন্যিসি ঠাকুরই বলে চললো। বেঁটে ঠাকুরটী বড় একটা রা করলো না। তার কারণও আছে। সে বেচারা ভীষণ তোতলা। একবার জমিদার মশায় বলতে গিয়ে 'জোম্-জোম্-জোম্—' করে সে প্রায় হাসির আসর জমিয়ে ফ্যালে আর কি। তারপর থেকেই সে চুপ মেরে গ্যাছে। সেবার পর চৌধুরী মশায় হাত কচলাতে কচলাতে নিজের কথাটা পাড়লেন—

—আমার হাতটা যদি দয়া করে একটু দ্যাখেন, বাবা।

—হাত আর কি দেখবো বাবাজী। কপাল যে ভালো নিয়েই এসেছো, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। না হলে কি আর জমিদার বংশে জন্মো হয়।

—আপনি তো সবই জানেন বাবাজী। জমিদারীর সে দপ্ দপা আজ আর নেই। ঠাকুদ্দার পর সম্পত্তি এক কড়াও কেউ বাড়ায় নি। কিন্তু ভোগদখল করেছে সবাই, আর সরিকদের মধ্যে ভাগাভাগিও হয়েছে। তার ওপর এ গাঁয়ে থেকে মামুলি চালে চলা যায় না। তাই ভেতর থেকে সব ফোঁপরা হয়ে যেতে বসেছে, তালুক-মুলুক যা আছে তাও সব লাটে উঠলো বলে।

—কথায় বলে বাবাজী যে মরা হাতী লাখ টাকা। অনেক গিয়েও

তোমার যা আছে, তাও নেহাত কম নয়। বুঝে সুঝে চললে দু'পুরুষ বসে খেতে পারবে।

—আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি বাবা, যে জমিদারির যা আয় তাতে ঠাটবাট্ বজায় রেখে আর মোটেই চালানো যাচ্ছে না। ভাঁড়ার একদম খালি বললেই হয়। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু সেকালের কিছু ভারী ভারী গয়না ও কয়েকখানা বাদশাহী মোহর, আর বেয়াড়া মাপের সব যতো বাসনপত্তর।

—তাহলে তো বড় ভাবনার কথা বাবাজী। তা, দেখি তোমার হাতখানা।

হাতখানা দেখে যেন চমকে উঠলো সন্ন্যিসিঠাকুর মুখে তার ঘনিয়ে এলো চিন্তার কালো ছায়া। গম্ভীর মুখে সে বললো—

—তাইতো বাবাজী। তোমার সামনে যে বড়ই বিপদ।

এবার চৌধুরী মশায় যেন ভেঙে পড়লেন। কাতর ভাবে বললেন—

—কি বিপদ, বাবা। খুলে বলুন।

—দস্যুভয়।

—একটা যা হয় উপায় করুন, বাবা। আমাকে বাঁচান। একটা তাবিচ—

—তাবিচে কি আর কপালের লেখন মুছে দেবে? তা দস্যু-ডাকাতেরা তো আর তোমার জমি-জেরাত মাথায় করে নিয়ে পালাচ্ছে না।

—তা বটে, তবে গয়নাগাঁটী ও মোহরগুলো—

—সেগুলোকে সাবধানে রাখলেই তো গোল মিটে যায়।

—কতো আর সাবধানে রাখবো, বাবা? সেগুলোকে আমার শোবার ঘরে সিন্দুকের মধ্যে রেখেছি।

—তবে আর ভাবনা কি? এখন যাও বাবাজী। রাত অনেক হলো, শুয়ে পড়ো। দিনভোর অনেক খাটাখাটি নি করেছো।

মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে চৌধুরী মশাই চলে গেলেন। কিন্তু সন্ন্যিসি ঠাকুরদের চোখে ঘুম নেই কেন? জমিদার-মশায়'এর সম্পত্তি কিসে রক্ষে হবে—এই ভাবনাতেই বোধ হয় তাদের চোখ থেকে ঘুম পালিয়েছে। বেশ কিছুটা সময় তারা কি যেন পরামশ্শো করে নিলো। বুদ্ধিও বোধ হয় একটা খেলে গ্যালো তাদের মাথায়। তাগড়া-সন্ন্যিসিটী হঠাৎ ঘর ছেড়ে যাচ্ছে কোথায়? বোধহয় বড় সন্ন্যিসিটীর কোনো হুকুম-টুকুম কিছু তামিল করতে চললো সে।

॥ ৫ ॥

চোরডাকাতের ভয় চৌধুরীমশায়ের বড়ো একটা ছিলো না। তবে হাতে দস্যুভয় লেখা আছে শুনলে কার না মন দমে যায়? তাই তিনি অন্যমনস্কভাবে দোতালার শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে ঢুকে, চারদিক দেখে নিলেন। তারপর বেশ যুৎ করে হুড়কো এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম আসে কৈ? এপাশ-ওপাশ করেন আর ভাবেন—সন্নিসি ঠাকুরের কথা তো ভুলও হতে পারে। লোকটা ধাপ্পা দিয়েছে কি না তাই বা কে জানে? না, না তা হতেই পারে না। লম্বা-সন্নিসিটাকে ধাপ্পাবাজ বলে ভাবাই যায় না। কেমন শান্ত সুন্দর চেহারা। একটা জমিদারির মালিক হয়ে মানুষ চিনতে এতবড়ো ভুল তাঁর হতেই পারে না। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

নীচের দেউড়িতে পড়ে তখন দারোয়ানেরা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। কাজের বাড়ীতে সারাদিন একে হাড়-ভাঙা খাটুনি গেছে। তার ওপর পেটে ভালোমন্দ পড়েছেও অনেক কিছু। কাজেই ঘুমের আর অপরাধ কি?

কিন্তু সন্নিসিঠাকুর দু'জন কোথায় না, কোথাও যায়নি তারা। তবে সাজপোষাক বেমালুম এমন বদলে ফেলেছে যে তাদের এখন চেনাই দায়। তাদের কথা শুনতে না পেলে আমরাও চিনতে পারতাম না।

—আঃ বাঁচলাম সর্দার। গোটা দিনটা কথা না বলতে পেরে আমার যেন পেট্‌টা ফুলে উঠেছে।

—পেট্‌টা তোর ফুলেছে ঠিকই তবে সেটা গেলার ফল। পাহাড়-প্রেমাণ মণ্ডা-মেঠাই গিললে কার আর না পেট ফোলে?

তা, তোমার মতো নিখাকি আর কে আছে! ভালোমন্দ পেলে সবাই—

—রাখ্‌ তোর খাবার গপ্পো। সব কাজ ঠিক্‌ ঠিক্‌ করেছিস তো? তোর যা বুদ্ধির বহর!

—বুদ্ধির ঘাটতিটা কোথায় দেখলে, সর্দার? আমি আগেভাগেই ওপরে গিয়ে শোবার ঘরের কাছে একটা থামের আড়ালে লুকিয়েছিলাম। জমিদারবাবু উঠলেন, সিঁড়ির দরজায় খিল লাগালেন, তারপর শোবার

ঘরে ঢুকে হুড়কো এঁটে দিলেন। আমি তখন তরতর করে নেমে এলাম, সিঁড়ির খিল খুললাম ও বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

—না, সত্যিই তোর মাথা এখন বেশ খুলে গেছে। তা শোবার ঘরের দরজা খোলার কি মতলব করলি ?

—আমরা গিয়ে চড়াও হলে, জমিদারবাবু নিজেই পেরাণের ভয়ে দরজা খুলে দেবে। তা ছাড়া একটা তুরমুশও দেখে রেখেছি। দরকার হয় ওটা দিয়েই দরজা ভেঙে ফেলবো।

—হুঁ, বুঝলাম। রাত অনেক হলো। এখন চল দেখি।

দু'জনেরই এখন পাক্কা ডাকাতের মত সাজপোষাক। লম্বা লোকটীর হাতে লাঠি, আর বেঁটে বক্কেশ্বরের হাতে একটী ছোটো লোহার ডাণ্ডা। তারা ধীরে ধীরে দেউড়ির দিকে এগিয়ে এলো। দারোয়ান কজন তখনও ঘুমিয়ে একেবারে কাদা। রাত সত্যিই তখন অনেক হয়েছে। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। দুজনেই কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলো। বক্কেশ্বর চুপি চুপি কি যেন বলতে গ্যালো। কিন্তু লম্বা লোকটী ইসারা করে তাকে থামিয়ে দিলো। কিন্তু লোক দুটো দাঁড়িয়েই বা আছে কেন ? কি চায় তারা ? কিছুই বোঝার উপায় নেই। এমন সময় শ্যালের ডাকে দুজনেই চমকে উঠলো। চমকাবারই কথা। চারদিক তখন এমন নিঃস্তব্ধ যে একটা ছুঁচ মাটীতে পড়লেও তার আওয়াজ

শোনা যায়। সেই সময় হঠাৎ 'হুক্কা হুয়া'র মতো বিচ্ছিরি ডাক শুনলে কে না চমকে ওঠে! প্রাণ থাকলে বনবাদাড়ও শিউরে উঠতো। শ্যালের ডাক শুনে চমকালেও কিন্তু তুজনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তারা বুঝলো যে এখন একেবারে ভরা রাত। কাণা-কুয়ো পাখিও 'কু কু' করে ডেকে জানিয়ে দিলো যে রাত প্রায় তুপুর হতে চলেছে। এবং এখনি এসে হাজির হবে তাদের জুড়িদারের দল। তাই আর তো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। বক্কেশ্বর সদর দরজা পর্যান্ত এগিয়ে এলো। লম্বা লোকটী লাঠি হাতে দারোয়ানদের কাছে থেকে গ্যালো। কে জানে দরজা খোলার আওয়াজে যদি তারা জেগে ওঠে? তাহলে নিশ্চয়ই তারা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তবে ছাড়বে। লম্বা লোকটী জানে যে তার হাতে লাঠি থাকলে সে দারোয়ান কটাকে সহজেই কাবু করতে পারবে। এদিকে দেখা যাক্ বেঁটে বক্কেশ্বর কি করে। জমিদার-বাড়ীর সদর দরজা। পেছন থেকে খিল-আঁটা। লোহার খিল—বেজায় ভারী। নিঃশব্দে সে খিল খুলে ফেলা যার তার কম্মো নয়। কিন্তু আমাদের বাঁটুলবাবাজীর যেমন হাতির মতো খোরাক, তেমনি তার গায়ের জোরও বটে। কোনোরকম আওয়াজ না করে সে দেখতে দেখতে খিল খুলে ফেললো। তারপর ধীরে ধীরে দরজার পাল্লা তুটে মেলে ধরলো। লম্বা লোকটী তখন এসে আস্তে করে বক্কেশ্বরের পিঠ চাপড়ে কানে কানে বললো—সাবাস। তারপর তুজনেই বেরিয়ে পড়লো। দরজার পাল্লাও আবার বন্ধ হয়ে গ্যালো। কিন্তু কোথায় তাদের দলবল? তাদের সব ফন্দি-ফিকির কি তাহলে ভেস্তে যাবে? ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে থোক্ থোক্ জোনাকি পোকা তাদের দিকে চেয়ে যেন হাসিতে ঝলসে উঠলো। না, হাবুলচন্দ্র অতো হাবাগোবা গোছের লোক নয়। দলবল নিয়ে সে রণ-পা চড়ে সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসছে। দেখতে না দেখতে তারা এসে রণ-পা মাটীতে রেখে বুক টান করে দাঁড়ালো। সর্দারের হুকুমে সব জমিদার বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। জনা তুয়েক লাঠি হাতে দারোয়ানদের ওপর নজর-দারী করতে রয়ে গ্যালো। বেঁটে বক্কেশ্বর তার দলবলকে পথ দেখিয়ে সোজা জমিদারবাবুর শোবার ঘরের সামনে নিয়ে এসে হাজির। তারপর তার হাতের লোহার ডাণ্ডার ঘায়ে ঝনঝনিয়ে উঠলো শোবার ঘরের দরজা। সে আওয়াজে মরা মানুষ জেগে ওঠে, আর জমিদারবাবুর। ঘুম ভাঙবে না। ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠলেন জমিদারবাবু। কোনোরকমে ভয়ে-ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'কে'? চাবুকের মতো জবাব এলো—

—রাণা সর্দার। দরজা খোলো, ভয় নেই।

রাণা সর্দারের নামে ভয় যেন অক্টোপাশের মতো আট-আটটা হাত পা মেলে জমিদারবাবুকে সাপটে ধরে ফেললো। তখন তিনি না পারেন উঠতে, না সরে তাঁর মুখে কথা। কিন্তু রাণা সর্দার দরজার গোড়ায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পাত্তর নয়। এবার এক বিকট আওয়াজ তুলে দরজা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। এক ধাঁকে বক্কেশ্বর দুরমুশটাকে যে ঘাড়ে করে থাকতে পারলেন না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে পা দুটো টেনে টেনে এসে দরজাটা দিলেন খুলে। প্রথমেই তাঁর নজর পড়লো লম্বা লোকটীর ওপর। লোকটী একগাল হেসে বলে—

কি জমিদারবাবু! চিনতে পারো? আমিই রাণা সর্দার।

জমিদাববাবু খানিকটা সময় হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁর অজান্তেই যেন দুটী কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—

—স-ন্নি-সি ঠাকুর!

-হ্যাঁ, ঠিক্ তাই। কালীমায়ের আদেশ—তোমাকে তাঁর কাছে বলি দিতে হবে।

এই শুনে জমিদার মশায় কাটা কলাগাছের মত পড়ে গেলেন। মান-মর্য্যাদা সব ভুলে বলতে লাগলেন—

—না, না। আমাকে বাঁচতে দাও। গয়নাগাঁটি যা আছে সব তোমরা নিয়ে যাও।

—এতো তোমার পেরাণের মায়া? বেশ্, সিন্দুক খুলে যা আছে বার করো।

জমিদার মশায়ের তখন মাথার কি আর ঠিক আছে? চাবিই খুঁজে পান না তিনি। চাবি যদি বা পেলেন, সিন্দুকই খুলতে পারেন না। পারবেন কি করে, তিনি যে তখন ঠক্ ঠক্ করে কেঁপেই সারা। বক্কেশ্বরই শেষে খুলে ফেললো সিন্দুকের ডালা। চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল সকলের। সেকালের সব ভারী ভারী সোনার গয়না! রাণা এগিয়ে গিয়ে শুদ্ধু খান ছয়েক গয়না বেছে নিলো। তারপর বললো—মা কালীর একজন ভক্তের ভিটেমাটি মিথ্যে মামলার জোরে তুমি চাটি করে দিয়েছো। এই তার শাস্তি। মাত্তর কয়টা গয়না নিয়েই এবার তোমাকে ছেড়ে দিলাম। মা কখনও কি সন্তানের রক্ত খেতে পারেন? তবে ফের যদি গরীবের ওপর

অত্যাচার করো, তাহলে তোমার ধড়ের ওপর থেকে মাথাটা নামিয়ে দেবো।

—এবারের মতো মাফ করো সন্ন্যিসিঠাকুর। আর কখনও এমন কাজ করবো না।

—বেশ। মনে থাকে, যেন গয়না কটার জন্যে দুঃখু করো না। ও কটা একজন গরীবের উপকারে লাগবে, তোমার পুণ্যি হবে। তুমি আমাদের আদর যত্ন করে খাইয়েছো। তাই বলি, মার ক্রেপায় তোমার ভালোই হবে।

রাণা সর্দারের ইসারা পেয়ে সকলেই সর্দারের পিছু পিছু বেরিয়ে গ্যালো। দেউড়ি পেরিয়ে যাবার সময় নজরদারেরা তাদের সঙ্গে ভিড়লো। দারোয়ান কটা তখন জেগে উঠে ভোম মেরে বসে আছে। মনিবের হয়ে লাঠি ধরা তো দূরের কথা, ভালোয় ভালোয় এখন ডাকাতের কবল থেকে ছাড়া পেলেই তারা বাঁচে।

রণ-পা চড়ে ডাকাতেরা ফিরে চলেছে। সবার আগে রাণা সর্দার। যেতে যেতে সে হাবুলকে প্রশ্ন করে—

হ্যাঁরে হাবুল। গয়না কটাতে আমাদের কাজ মিটবে তো?

—কি যে বলো সর্দার। গরীব-গুর্বো লোকেরা কবে আর মেয়েদের গা-সাজানো গয়না দিয়ে থাকে? তাদের কষ্টে দায় থেকে উদ্ধার হওয়া নিয়ে কথা। তবে সর্দার, সব গয়নাগুলোই হাতিয়ে নিলে হতো।

—ছিঃ! আমরা ডাকাত বটে। তবে লোকের সর্ব্বোনাশ করা আমাদের ধম্মো নয়। আমাদের কাজ মিটলেই হলো, দিন চলে গেলেই হলো।

॥ ১৬ ॥

কালী প্রতিমাকে সামনে রেখে সর্দারকে ঘিরে সবাই বসে আছে। চারপাশে ঘন বন জঙ্গল। সকলেরই কেমন যেন মনমরা ভাব। রাণা সর্দার থমথমে মুখ করে বলে চলেছে—

—ডাকাতি করে কিছুই করতে পারলাম না। জাতও গ্যালো, পেটও ভরলো না।

সবাই বুঝলো যে সর্দারের মাথায় একটা কিছু ভর করেছে। হাবুল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে—

—এসব কথা কেন, সর্দার।

—আর, কেন? এখন মনে ভয় হয়—

—কিসের ভয়, সর্দার? ফৌজদারের লোকেরা কোনো কালেই আমাদের টিকির নাগাল পাবে না।

—আরে, সে ভয় নয়। মা কালী যদ্দিন রক্ষে করবেন, তদ্দিন আমাদের গায়ে হাত দ্যায় কার সাধ্যি?

—তবে?

—বামুনের ছেলে হয়ে সারা জীবনভোর ডাকাতি করে কাটালাম। পরকালে যে নরকে যেতে হবে, সে খেয়াল আছে তোদের? তাই বলছি, ডাকাতি করা এখন আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

সবাই মাথ হেঁট করে বসে রইলো। কবে কোন দিন নরকে যেতে হবে ভেবে কে আর ডাকাতি করা ছেড়ে দিয়ে থাকে। কেলো অনেক ভেবে হঠাৎ বলে বসে—

—ডাকাতি না করলে আমাদের পেট চলবে কি করে? তাছাড়া গরীবের মেয়েদের বিয়ের ভার নেবে কারা?

—বাজে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্ নি, কেলো! দু' চারটে গরীব লোককে কন্যেদায় থেকে উদ্ধার করে আমরা একেবারে স্বগ্‌গে যাবো, নয়? গোটা দেশ জুড়ে রোজই যে হাজার হাজার গরীবের মেয়ের কপাল পুড়ছে, সে খবর তোরা কিছু রাখিস্?

আবার সবাই চুপচাপ। রাণা খানিকটা থেমে বলতে থাকে—

—ভুলই করেছি। ক্ষোভে দুঃখে মাথার ঠিক ছিলো না। মালুর মুখখানা মনে পড়লেই মাথায় আগুন জ্বলে উঠতো। তাই ডাকাতের দল গড়লাম। মালুর মুখখানা মনে রেখেই গরীব লোকদের কন্যেদায় নিজেদের মাথায় তুলে নিয়েছি। কিন্তু—

—কিন্তু, কি সর্দার?

—এখন বয়স হয়েছে, রক্তও অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কালী মায়ের দয়ায় বুঝতে পেরেছি যে পাপ করে লোকের উপকার করাও ঘোরতরো অপরাধ। তাছাড়া দেশের রাজা আছেন, সমাজের মাতব্বর লোকেরাও আছেন—তাঁদেরই এ কাজ সাজে। আমরা কে? কিই বা আমরা করতে পারি?

—এ সব কথা শুনলে বেম্মোডাঙ্গার গরীব-গুর্ব্বো লোক সব যে

একেবারে ভেঙে পড়বে, সর্দার। কে তাদের দেখবে? কে তাদের বুক দিয়ে সাহায্য করবে?

—মা কালীই তাদের দেখবেন। আর তোরা তো রইলি। আমি তাহলে এখন চলি।

সবাই এক সঙ্গে বলে ওঠে -'সর্দার'। সর্দার শুয়ে পড়ে মা কালীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে

—হাবুলই, এখন থেকে তোদের সর্দার হলো। তার কথা মেনে চলবি, সবাই। আর মার সেবার যেন কোনো ত্রুটি না হয়। বেমক্কা খুন জখম করিস্ নি। খবরদার। মেয়েদের গায়ে ভুলেও হাত তুলিস্ নি। মায়ের জাতের গায়ে হাত দিলে অপোঘাতে মরবি সব। পারিস যদি গরীবদের দিকে একটু নজর রাখিস্। আমি চললাম্। কোনো একটা তিথ্থে গিয়ে মার নাম জপেই পাপের প্রাচিত্তির করবো।

॥ ১৭ ॥

এখন হাবুল সর্দারের আমল। রাণার ছিলো সে ডান হাত, একেবারে সেরা সাকরেদ। রাণা চলে যাবার পর সকলেরই যেন কেমন মনমরা ভাব। কিন্তু এভাবে তো আর বেশী দিন চলে না। তাই হাবুলের দলবল আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো—কাজ চাই। কাজের আর অভাব কি দেশে? আর কিছু না জোটে, নৌকো লুট করেই পেট চালানো যেতে পারে। তাই জলডাকাতি দিয়েই হাবুলের সর্দারি শুরু হলো। রাণার শেষ কথাগুলো হাবুল সর্দার কড়ায় গণ্ডায় মেনে চলতো। মাকালীর পায়ে পূজো না দিয়ে সে কোনো কাজেই হাত দিতো না। নেহাৎ ঠেকায় না পড়লে, মারপিঠ কখনও করতো না তারা। আর মেয়েদের গায়ে তারা হাত তুলেছে—এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি। তা গরীবের দিকে তাকাবার বড় একটা গরজ তাদের দেখা যায় না। হয়তো তেমন রোজগারপাতিও নেই তাদের। দিন তাদের অবিশ্যি খেয়ে পরে একরকম করে চলে যাচ্ছে। হাবুল সর্দারকে মান্যও করে সবাই। সর্দারি করার মতো গুণেরও তার অভাব নেই। বুকভরা সাহস ও মাথাভরা বুদ্ধি দুইই তার আছে। একবার একটা জলডাকাতি করতে গিয়ে কি কাণ্ডটাই না হাবুল সর্দার করেছিলো।

কৃষ্ণ পান্তীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। আমাদের দেশের একজন প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ বললেই হয়। সাধক কবি রামপ্রসাদ এনাকে লক্ষ্য করেই গেয়েছিলেন--

"পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তী
তারে দিলে মা জমিদারী।"

সহস্ররাম পান্তীর ছেলে কৃষ্ণ পান্তী। বড়ই অভাবী লোক ছিলেন সহস্ররাম। পান বেচে যা তিনি ঘরে আনতেন, তাতে পরিবারের সকলের পেটের ভাত বা পরনের কাপড়ও জুটতো না। কৃষ্ণচন্দ্রের চেহারাও ছিলো রীতিমতো কুৎসিত। তাহলেই বুঝছো তোমরা যে কৃষ্ণ পান্তীকে ভগবান রূপ বা রুপোর টাকা কোনোটাই দিয়ে পাঠান নি। কিন্তু যা দিয়েছিলেন তার তুলনা মেলে না। কৃষ্ণ পান্তীকে ভগবান দু হাত ভরে দিয়েছিলেন— সততা ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও কর্মপ্রেরণা। এই সব গুণগুলিকেই মূলধন করে পান-বেচা কৃষ্ণ পান্তী এক দিন 'রাজা' কৃষ্ণচন্দ্র নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। অবিশ্যি ইংরেজের দেওয়া 'রাজা' উপাধিকে তিনি তেমন সম্মানের চোখে ছাখেন নি। তার বদলে নবদ্বীপের মহারাজ শিবচন্দ্রের 'চৌধুরী' উপাধিকেই তিনি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। আজকের রাণাঘাট শহরের তিনিই হলেন প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। ব্রহ্মডাঙ্গার নামের পেছনে রয়েছে এক ব্রহ্মজ্ঞানীর সাধনার কাহিনী। আর সে ব্রহ্মডাঙ্গাকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের নামের কোনো আভাসই আমরা পাই না তাঁর হাতে-গড়া শহরের নামটীর মধ্যে। তাঁর সে সাধের শহরের নাম যে রাণাঘাট তা তো তোমরা আগেই শুনেছো। কেন? একটু পরেই আমরা এ প্রশ্নটার আলোচনা করবো। এখন আমাদের হাবুলের কথায় ফিরে যেতে হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র তখন কলকাতার একজন নামজাদা ধনী লোক। আর হাটখোলার তিনি 'কর্ত্তা বাবু'। দেশে তখনও রেলপথ তৈরী হয় নি। নৌকো করেই তাই লোকে দেশ-বিদেশে যাতায়াত করতো। মালামালও আসতো যেতো ঐ জলপথেই। একবার কৃষ্ণচন্দ্র নৌকো করে রাণাঘাট থেকে কলকাতা যাচ্ছেন। তাঁর পিছনে গদাইলসকরী চালে চলেছে কয়েকটা মাল-বোঝাই মহাজনী নৌকো। জলপথ যে নিরাপদ নয়, এ কথা কৃষ্ণচন্দ্র জানতেন। যে কোনো সময়ে ডাকাতেরা যে তাঁর নৌকো ঘিরে ফেলতে পারে, তাও তাঁর অজানা ছিলো না। কিন্তু তবুও তিনি

পাইক বরকন্দাজ নিয়ে জাঁকজমক করে যাতায়াত পছন্দ করতেন না। বোধহয় তাঁর বিশ্বাসও ছিলো যে তাঁর রক্ত-জল করে রোজগার করা টাকা ডাকাতের পেটে যেতে পারে না। কিন্তু সাধু-অসাধু বাছ-বিচার করলে যে ডাকাতদের চলে না। তাছাড়া দূর থেকে দেখে ডাকাতরা বুঝবেই বা কি করে যে কার নৌকো যাচ্ছে ও নৌকোর ভেতরে কে আছেন? হাবুল সর্দার ছিপের বহর নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের নৌকোগুলোর পিছু পিছু চলেছে। দূর থেকে হাবুল সর্দার নজর রাখছে নৌকাগুলোর ওপর —কিসের নৌকো, কোথায় যাচ্ছে, এই সব আর কি? এদিকে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে, রাত নেমেছে। অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু নজরে আসছে না। কৃষ্ণচন্দ্রও তখন হুগলী নদীর মোহানায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর মনে ভয়ের কোন কালো ছায়াই পড়ে নি। তিনি চোখ বুজে মনে মনে ভগবানের নাম করে চলেছেন। মাঝি-মাল্লারা অবিশ্যি হুঁশিয়ার হয়েই নৌকো চালাচ্ছে। চারিদিকে তাদের কড়া নজর। কিন্তু হাবুল সর্দারকে রুখবে কি করে তারা? অন্ধকারের আড়ালে এগিয়ে আসছে তার পাঁচ-পাঁচখানা ছিপ! সরু লম্বা-লম্বা ছিপগুলো। তায় আবার এক-একটাতে পাঁচ-ছ'জন করে ডাকাত বসে দাঁড় চালাচ্ছে। বিদ্যুৎগতিতে জল কেটে চলেছে ছিপগুলি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাবুল সর্দারের হুকুমে কৃষ্ণচন্দ্রের নৌকোগুলো সব ঘিরে ফেললো ঐ ছোটো ছোটো পাঁচখানা ছিপ। হাবুল সর্দার নিজে তার ছিপের লোকজন নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের নৌকোর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে সে কি কান-ফাটানো বিকট আওয়াজ—মাঝি-মাল্লাদের হাত থেকে হাল দাঁড় খসে পড়ে আর কি! কিন্তু তাদের নৌকোর মধ্যে যে রয়েছেন 'কত্তাবাবু'। এ্যাতো বড় একজন ধনী মানী লোক কি শেষে ডাকাতদের হাতে নাকাল হবেন! তাই তারা নিজেদের প্রাণের মায়া ছেড়ে, সাহসে ভর করে লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। মাঝি-মাল্লারা এমনিতেই বেশ তাগড়া যোয়ান, তার ওপর তারা তখন একদম বেপরোয়া। হাবুল সর্দার দাঁড়িয়ে দেখছে যে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! বেপরোয়া লোকের সঙ্গে লড়াই করা সহজ কথা নয়। হাবুল সর্দারের লোকেরা বুঝতে পারলো যে তারা বেশ শক্ত পাল্লায় পড়েছে। একজনের তো হাতের লাঠি ছিটকে গিয়ে পড়লো একেবারে সেই গঙ্গার জলে। হাবুল সর্দার তখন নিজে 'রাণা সর্দারের জয়' বলে হুঙ্কার ছেড়ে কোমর বেঁধে এগিয়ে এলো।

ধন্যি শিক্ষা তার। কখন যে সে চোট সামলাচ্ছে আর কখনই যে সে ফাঁক বুঝে লাঠি হাঁকড়াচ্ছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। মাঝি-মাল্লার দল এবার পিছু হঠতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরে হাবুল সর্দার চীৎকার করে ওঠে—'ফ্যাল্ লাঠি, নয়তো তোদের মাথা আজ ফুটি-ফাটা করে ছাড়বো।' মাঝি-মাল্লারা বুঝলো যে আর দেরী করলে মাথা তাদের সত্যিই আজ বাঁচবে না। তারা লাঠি ফেলে মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো। সর্দারের ইসারায় তার দলবল তখুনি এদের বেঁধে ফেললো। ডাকাতরা তখন বেজায় খুশী। আর কোনো বাধা-বিপত্তির বালাই নেই। এবার লুঠতরাজের পালা। এমন সময় কৃষ্ণচন্দ্র বেরিয়ে এসে বললেন—'আমি কৃষ্ণ পান্তী'।

নৌকোর ওপর যেন আচমকা বাজ পড়লো। হাবুল সর্দারও তার দলবল চমকে উঠলো,—মানে আঁৎকে উঠলো। এখন উপায়? করেছে কি তারা? শেষমেষ একেবারে কৃষ্ণচন্দ্রের নৌকোর দিকে হাত বাড়িয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র শুধু একটু পুলিশে খবর দিলেই বিপদের আর শেষ থাকবে না। হাবুল সর্দার আবার মেজাজ দেখিয়ে রাণা সর্দারের নাম নিয়েই লাঠি
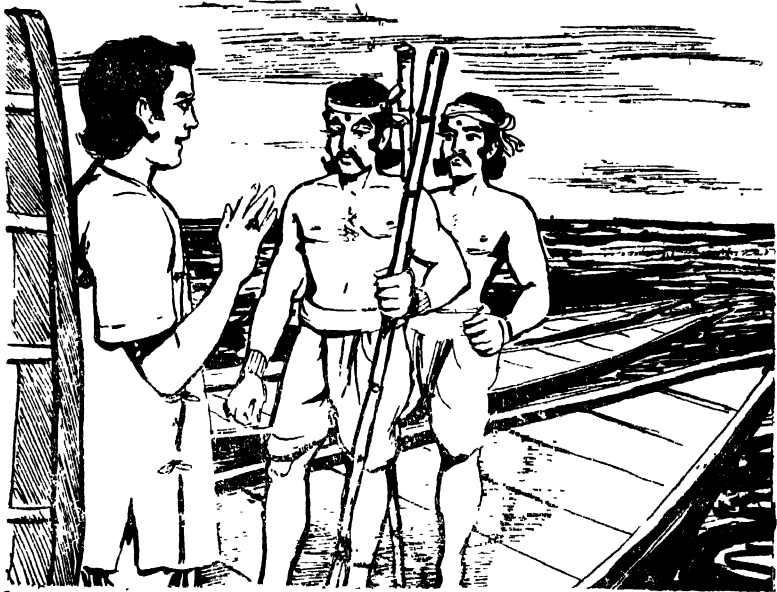
ধরেছে। 'কত্তাবাবু'র মতো লোকের কি আর বুঝতে বাকী আছে যে তারা কারা। এখন একটা মতলব তো কিছু ঠাওরাতে হয়। কিন্তু সর্দার কোনো মতলব ভেজে ফেলার আগেই কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—

—আমাদের কাছে এখন নগদ টাকা বলতে বিশেষ কিছু নেই। ঝুট্‌মুট্‌ লোকজনকে মারধোর করে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। তার চেয়ে তোমরা বরং একদিন সুবিধেমতো আমার কলকাতার গদীতে যেও। আমি তোমাদের খুশী করে দেব। এখন তোমরা যেতে পারো।

এ কি শুনছে তারা! হাবুল সর্দার নিজের কানদুটোকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। রাজামহারাজার মতন একজন মানী লোক কি না তাদের খুশী করে দিতে চান! তাজ্জব ব্যাপার বৈ কি! সর্দারের মুখে কোনো ভাষাই যোগালো না। মাঝি-মাল্লাদের বাঁধন খুলে দিয়ে, সে শুধু 'কত্তাবাবু'কে একটা নমস্কার জানিয়ে, দলবল নিয়ে সুড় সুড় করে চলে গ্যালো। কিন্তু তার মাথায় একটা ভাবনার ভূত চেপে বসলো। সত্যিই কি একদিন তারা কলকাতায় যাবে? সে যে একটা আজব শহর পথ-ঘাটও তাদের একেবারে অজানা। সেখানে গিয়ে শেষকালে বেঘোরে কি তারা প্রাণটাই হারাবে? তারপর সেখানে গিয়ে 'কত্তাবাবু'র পাত্তাই বা করবে কি করে তারা? আবার 'কত্তাবাবু'র কথা তারা ঠেলতেও তো পারে না। আর টাকার লাভ যে বড় লোভ। সে লোভ সামলানো কি মুখের কথা?

॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মডাঙ্গার জঙ্গলের মধ্যে হাবুল সর্দার তার দলবলের সঙ্গে বসে শলা-পরামশশো করছে। সামনে সেই রাণা সর্দারের কালী প্রতিমা। সর্দারই কথা শুরু করে—

—কিরে, কি বলিস তোরা? কোলকাতা যাওয়া কি ঠিক্ হবে?

কেলোর আবার শহর-বাজার দেখার বেজায় শখ। টাকার লোভটা অবিশ্যি তাদের কারুরই কম নয়। কেলোই মাথা চুলকোতে চুলকোতে আরম্ভ করে—

—সর্দার, সারা জেবনটাই আমরা বনে জঙ্গলে কাটালাম। শুনেছি না কি কোলকাতা একটা সাহেবদের আজব শহর। তাই ভাবছিলাম যে শহরটা দেখে একবার চক্ষুকর্ণ সাথক করে নিলে কেমন হয়?

হুঁ। বুঝলাম। কিন্তু 'কত্তাবাবু' যদি শেষে আমাদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে ছান্, তখন?

সবাই তখন, প্রায়,একসঙ্গে, মাথা নেড়ে বলে—

—সে হতেই পারে না, সর্দার। 'কত্তাবাবু'র একটা কথার দাম লাখ্ লাখ টাকা।

—ঠিকই বলেছিস্ তোরা। পাহাড়-পব্বত নড়ে বসতে পারে, কিন্তু কত্তাবাবুর কথার কোনো নড়চড় হতেই পারে না। তবে ?

—তবে কি, সর্দার ?

—পথঘাটের যে আমরা কোনো খবরই রাখি না।

কেলোর মাথায় তখন শহর দেখার শখ চেপেছে। সেই চট্‌পট্ বলে বসে—

—সে সব খবর আমিই যোগাড় করবো। হাটখোলার পথঘাটের খবর অনেকেই এখানে রাখে। একটা কথা জিগ্যেস্ করবো সর্দার ?

—বল্।

—'কত্তাবাবু'র কাছে টাকাকড়ি কতো পাওয়া যাবে বলে মনে হয় ?

সবাই এবার হেসে উঠলো। হাসি থামলে সর্দার তার গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে বলে—

—কি করে তা বলবো, আমি ? তবে ঐ যে কথায় বলে যে বড়-লোকেরা হাত ঝাড়লেও পব্বত। বেশ মোটামুটিই মিলবে বলে মনে হয়। যাক তাহলে তোরা সব তৈরী হয়ে নে। পরশুই আমি রওযানা হতে চাই।

সবাই হাসিমুখে যে যার কাজে চলে গ্যালো। সর্দারের কিন্তু ভাবনা আর ঘোচে না। দলের লোকদের তো আর দায়দায়িত্বের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় না। হুকুম তামিল করেই তারা খালাস। কিন্তু সে যে সর্দার! গোটা দলটাই যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে কাজ করে যায়। তাই যতো রাজ্যের ভাবনার ভার সে বইবে না তো, কে বইবে ? এতগুলো লোককে নিয়ে অজানা অচেনা শহরে যাবার ঝুঁকির কথা সে ভাববে না তো, কে ভাববে ?

'কালী, কালী' বলে দলবল নিয়ে রওয়ানা হলো হাবুল সর্দার। একটানা একঘেয়ে জলপথ। সে পথ আর যেন শেষই হতে চায় না। গল্প-গুজব করে, হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে আর কতটা সময়ই বা কাটানো যায়। শেষে হাক্লান্ত হয়ে তারা কোলকাতার ঘাটে এসে নৌকো বাঁধলো। তখন বেলা প্রায় গড়িয়ে এলো বলে। অজানা অচেনা শহর। সন্ধ্যে

হয়ে গেলে তাদের দুর্দ্দশার আর শেষ থাকবে না। কাজেই খাবার চিন্তা ছেড়ে, হাটখোলার পথই ধরতে হয়। কিন্তু আমাদের সেই বেঁটে বকেশ্বরের পেটে তখন রাবণের চিতে জ্বলছে। পেটে কিছু না পড়লে সে বেচারী আর নড়তেই যেন পারবে না। তাড়াহুড়ো করে পথে যা পেলো তাই দিয়ে কোনোরকমে পেটপূজো সেরে তারা হাটখোলার গদীতে এসে হাজির হলো। তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। ঘাট থেকে হাটখোলায় তারা কেমন করে, কোন পথে এসে পৌঁছেছিলো তা দুচার কথায় বলা যায় না। আর সে সব কথায় আমাদের কাজই বা কি? এটুকু তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে, অনেক ঘুরে হয়রান হয়ে তবেই তারা হাটখোলার সন্ধান পেয়েছিলো। কেলো যে সব খবর যোগাড় করেছিলো তা সব বিলকুল ভুল। তাছাড়া কোলকাতা দেখে মাথাও তাদের গিয়েছিলো ঘুলিয়ে। তবে অবিশ্যি হাটখোলার 'কত্তাবাবু'র গদী তখন লোকে এক কথায় চিনতো। সেইজন্যেই হয়তো শেষ পর্য্যন্ত হাবুল সর্দার তার দলবল নিয়ে কোলকাতায় নিপাত্তা হয়ে যায় নি। সে যাক এখন আসল কথায় ফিরে আসি।

খবর পেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র নিজে এসে হাজির হলেন। এক গাদা লোককে দেখে তিনি একটু অবাক হলেন। কিন্তু তারপরই হাবুল সর্দারকে তাঁর মনে পড়ে গ্যালো। তখন একগাল হেসে তিনি বললেন—

—দলবল নিয়েই এসেছো দেখছি। তা ভালোই করেছ। এই ফাঁকে কোলকাতাটাও দেখা হলো। খেয়েদেয়ে রাতটা এখানেই জিরিয়ে নাও। কাল তোমাদের পাওনা-গণ্ডা সব বুঝে নিও।

হকচকিয়ে গ্যালো সর্দার ও তাদের লোকেরা। 'কত্তাবাবু'র বাড়ীতে তারা খেয়েদেয়ে রাত কাটাবে! তারপর ডাকাতের আবার পাওনা-গণ্ডা! তাও কি না তারাই বুঝে নেবে। 'কত্তাবাবু' মানুষ না দেবতা! না তারাই সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্নে দেখছে। কিন্তু বেশীক্ষণ আর তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হলো না। 'কত্তাবাবু'র লোক এসে তাগাদা দিতে আরম্ভ করে দিয়েছে—চলো ভাই সব। তোমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করি গে। আরে, হাঁ করে তাকিয়ে দেখছো কি সব, চলো। এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তারা চললো বার বাড়ীর দিকে। যেদিকেই তাকায় চোখ আর তাদের ফেরে না। খাওয়া-দাওয়ার যা আয়োজন হয়েছিলো তা আর কি বলবো?

সকলেই গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়ে নিলো। সে বেচারারা এত ভালো ভালো খাবার জীবনে কোনোদিন চোখেই ছাখে নি। আমাদের বেঁটে বক্কেশ্বরের কথা না বলাই ভালো। তার খাওয়া দেখতে প্রায় লোক জমে যাবার দাখিল। কিন্তু তার কোনোদিকেই হুঁস্ নেই। এক মনে সে খেয়েই চলেছে আর লোকেও মজা দেখ্ছে। তখনকার দিনে বেশী যারা খেতে পারতো, কত্তারা তাদের পছন্দই করতেন। বেশী খেতে পারা একটা বাহাত্বরির ব্যাপারই ছিলো। কিন্তু সর্দারের তো সব দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিদেশে বিভুঁয়ে এসে রাক্ষসের মতো গিলে যদি কেউ অসুখে পড়ে, তখন? বেঁটে বক্কেশ্বরকে তাই পাতা ছেড়ে উঠেই পড়তে হলো সর্দার বাধ না সাধলে আর তু'চার গণ্ডা মণ্ডা সে পেটসই করে দিতে পারতো। কিন্তু সর্দারের হুকুম যে গরমান্যি করা যায় না। খাওয়ার পর শোবার ব্যবস্থা দেখে তো তাদের একেবারে আক্কল গুড়ুম। এ যে একেবারে জমিদারবাবুদের মতো কারবার। ফরসা ধব্ ধবে বিছানায় শুয়ে কি আর তারা তুচোখের পাতা এক করতে পারবে!

এদিকে তখন কৃষ্ণচন্দ্র নিজের ঘরে বসে আছেন। মুখ তাঁর রাগে যেন থম্‌থম্ করছে। সদা-প্রসন্ন কৃষ্ণচন্দ্রের মনের শান্তি কে যেন কেড়ে নিয়েছে! তাই গুম্ হয়ে বসে তিনি কি যেন ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে তিনি মনে মনে কি যেন একটা কিছু ঠিক করে নিলেন। তারপর ভরাট গলায় ডাক দিলেন—শোম্ভো। শোম্ভো, আছিস।

শোম্ভোর ভাল নাম হলো শম্ভুচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্র হলেন কৃষ্ণচন্দ্রের ছোটো ভাই শম্ভুচন্দ্রকে কৃষ্ণচন্দ্র খুবই ভালবাসতেন। শম্ভুচন্দ্রও দাদার কাজ-কারবার দেখাশোনা করতেন। দাদার গলার আওয়াজ পেয়ে শম্ভুচন্দ্র একটু যেন ঘা'ড়ে গেলেন। আওয়াজ শুনেই তিনি বুঝেছেন যে দাদার মন-মেজাজ আজ বিগড়ে গেছে। যাই, দাদা' বলে তিনি তাড়াতাড়ি এসে হাজির হলেন। এসে ছাখেন যে, যা ভেবেছেন তিনি ঠিক তাই হয়ে বসে আছে। রীতিমত রেগেই আছেন তাঁর দাদা। এমনিতে দাদা তার শিবতুল্য লোক, শরীরে তাঁর রাগ বলতে কিছু নেই। সেই দাদাই যদি রেগে যায়, তাহলে ভয়ের কারণ বৈ কি? তাই শম্ভুচন্দ্র এসে মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন—

—কি দাদা। ডাকছিলে বুঝি?

—হুঁ

শম্ভুচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে দাদা তার খেজায় চটেছেন। চটার কারণটা মনে পড়ে যেতে তিনি আরও ঘাবড়ে গেলেন। কিছু না বলে তাই তিনি চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর স্নেহের ছোট ভাইকে একবার আগাপাছতলা দেখে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—

—শোম্ভো! তুই নরকে যেতে চাস যা। কিন্তু আমাকেও সেই সঙ্গে তুই নরকে ডোবাবি দেখছি।

—কেন, দাদা?

—আবার, কেন? আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লজ্জায় তোর মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে না।

এরপর আর কি বলবেন শম্ভুচন্দ্র। মাথা হেঁট করেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বলে চল্লেন—

—আমার একটা মুখের কথা বিশ্বাস করে হাবুল সর্দার ও তার লোকজন এতদূর চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, আমারই ঘরে তারা নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর তুই কিনা তাদের ধরিয়ে দেবার ফন্দি আঁটছিস!

—কিন্তু দাদা, ওরা যে ডাকাত।

—ওসব কথায় তোর কাজ কি? কোথায় ছিলি তুই সেদিন, যখন ওরা আমার নৌকো ঘিরে ফেলেছিলো?

—কিন্তু এখন যখন ওদের বে-কায়দায় পেয়েছি—

—এ কথা তোর মুখে আটকালো না। সেদিন তারা ইচ্ছে করলেই আমাকে খতম করে দিতে পারতো। করেনি কেন, জানিস?

শম্ভুচন্দ্র চুপ করেই দাঁড়িয়ে আছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বলে চলেছেন—

—আমার কথায় তারা বিশ্বাস করেছিলো, তাই। বুঝলি? আর আজ তাদের বাগে পেয়ে তুই পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাস্। শেষে এই হলো তাদের বিশ্বাসের পুরস্কার।

—আমি অতো বুঝিনি, দাদা।

—এর আবার অতোশতো কি আছে? আমি তাদের কথা দিয়েছি। আমার প্রাণ থাকতে সে কথার নড়চড় হবে না। ব্যস মিটে গ্যালো ল্যাঠা!

—তাহলে কি তাদের দু'হাজার টাকাই দিতে হবে।

—তবে আর বলছি কি এতক্ষণ ?

—সে যে অনেক টাকা, দাদা। এত টাকা নিয়ে তারা করবেই বা কি ?

—সে খোঁজে তোর কি দরকার। টাকার প্রতি তোর যে বড্ড মায়া পড়ে গেছে, দেখছি। শোন্তো, ছেলে বেলাকার কথা তুই কি সব ভুলে গেলি ? যা, যা বলছি তাই করগে।

এরপর আর কথা চলে না। শম্ভুচন্দ্র দাদাকে খুব ভালভাবেই চিনতেন, শ্রদ্ধাও করতেন। তিনি বুঝলেন যে, এই নিয়ে আর কথা বলে কোনো লাভ নেই। তাই তিনি ধীরে ধীরে দাদার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ২০ ॥

ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গ্যালো হাবুল সর্দারের ও তার দলের লোকজনদের। হঠাৎ তাদের খেয়ালই হলো না যে তারা কোথায় আছে। খেয়াল যখন হলো তখন তারা দেখলো যে কত্তাবাবুর লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে। কত্তাবাবু খবর পাঠিয়েছেন যে তারা ফিরে যাবার আগে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যায়। সকাল সকাল পেটপুরে খেয়ে তারা তৈরী হয়ে নিলো। তারপর 'কত্তাবাবু'র সামনে এসে দাঁড়ালো। কে বলবে যে 'কত্তাবাবু' এতো টাকার মালিক এবং এত বড়ো একজন গণ্যিমান্যি লোক। যেমন তাঁর সাদামাটা চেহারা, তেমনি তাঁর সাদাসিধে পোষাক। চালচলনেও কিছু বড়লোকী ঢং নেই। তাদের দেখে তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—

কি ? খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো ? রাতে ঠিক ঘুম হয়েছিলো তো ?

কথা শুনে হাবুল সর্দারের মন একেবারে গলে গ্যালো। সে হাত জোড়ো করে বলে—

—কত্তাবাবু আপনি মানুষ নয়, দেবতা। এমন ভালোমন্দ জেবনে কোনদিন খাইনি। আর ডাকাতদের কেউ বোধ হয় এমন যত্ন করে খাওয়াবার কথা ভাবেও নি। এখন যদি হুকুম করেন, তাহলে যাই।

কৃষ্ণচন্দ্র হাবুল সর্দারের কথা শুনে প্রাণখোলা হাসিতে একেবারে ফেটে পড়লেন। বললেন—

—সে কি হয় সর্দার ? তোমাদের পাওনা গণ্ডা না নিয়েই চলে যাবে ?

এই বলে তিনি পাশের লোককে নীচু গলায় কি যেন বললেন। লোকটী উঠে গিয়ে একটী সিন্দুক খুলে দু'তুটো নোটের তাড়া এনে কত্তাবাবুর সামনে রাখলো। এতগুলো নোট একসঙ্গে সর্দার ও তার লোকজনেরা কেউ কখনও দেখে নি। তাই তাদের চোখ তখন একদম ছানাবড়া।

কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন—

—এসো, সর্দার। এবার তোমার পাওনা গণ্ডা সব বুঝে নাও।

ডাকাতদের আবার পাওনা কি, দেবতা? দয়া করে আপনি যা দেবেন, তাই আমরা মাথা পেতে নেবো। কিন্তু এ যে অনেক টাকা?

—না, না,—এ এমন কিছু বেশী টাকা নয়। দু'হাজার টাকা মাত্তর—

—দু হা-জা-র টাকা! কিন্তু দেবতা, এ সব নোট ভাঙাতে গেলে আমরা ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবো।

—সে কথাও আমি ভেবে রেখেছি। নোটের ওপর একটা করে চিহ্ন দেওয়া আছে। বিপদে পড়লে, আমার নাম করবে। তাহলেই সব গোলমাল মিটে যাবে। চিহ্নটা অনেকেই চেনে কি না! তবে একটা কথা—

—বলুন, দেবতা।

—পারো যদি, এখন থেকে সৎপথে থাকার চেষ্টা করো। এই টাকাটাকে মূলধন করে তোমরা একটা ছোটোখাটো কারবারও খুলতে পারো। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

টাকার তোড়াদুটো তুলে নিয়ে, সর্দার দূর থেকেই প্রণাম করলো কত্তাবাবু'কে। তারপর দলবল নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গ্যালো। 'কত্তাবাবু'র কথামত ডাকাতি ছেড়ে কারবার খুলছিলো কি না, সে কথা অবিশ্যি আমার জানা নেই।

॥ ২১ ॥

কালস্রোতে সব কিছুই ভেসে চলে যায়। থেকে যায় শুধু মানুষের কীর্তি। কৃষ্ণচন্দ্র অস্তাচলে চলে গেছেন বহুকাল আগে—১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তাঁর সঙ্কল্প, সাধনা ও সিদ্ধির অমর কাহিনী।

সেকালের ব্রহ্মডাঙ্গাই হলো আজকের জমজমাট শহর, রাণাঘাট। [আগেই বলেছি যে রাণাঘাট শহরের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র।] কিন্তু 'রাণাঘাট' নামটীর মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তিকাহিনীর কোনো হদিসই মেলে না। মনে হয় কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়ের আগেই নাম পালটে 'ব্রহ্মডাঙ্গা' হয়েছে 'রাণাঘাট'। কৃষ্ণচন্দ্র নিজের হাতেই রাণাঘাটকে গড়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি নামের কাঙাল ছিলেন না। বলে তাঁর আমলে রাণাঘাটের রূপ পালটালেও নাম বদলালো না। রাণাঘাট নামের সঙ্গে তাই জড়িয়ে রইলো কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তিকাহিনী নয়, রাণা ডাকাতের গল্পগাথা। লোকে বলে যে রাণা [বা রণা] সর্দারের ঘাট বা ঘাঁটি থেকেই 'রাণাঘাট' কথাটী এসেছে। আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে নাকি রাণা সদারের ঘাঁটি ছিলো মোটামুটি সেই জায়গায় আজ যেখানে 'রাধারাণী প্রসূতি সদন'*১ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। রাণার ভয়ে সন্ধ্যের পর কোনো নৌকোই তার ঘাঁটির ধারে কাছে ঘেঁষতো না। জায়গাটার নাম তাই হলো রাণার ঘাট। কালে কালে, 'র' টা পড়লো খসে, এবং নামটী দাঁড়ালো 'রাণাঘাট'। সবাই অবিশ্যি রাণাঘাট নামের এই ইতিহাস মানেন না। কিন্তু এই নিয়ে তর্কাতর্কি করার আমাদের কোনো দরকার নেই। রাণা সর্দারের নাম থেকেই জনপদটীর নাম 'রাণাঘাট' হয়ে থাকলেও থাকতে পারে—এই কথাটাই শুধু তোমাদের বলে রাখলাম।

আমাদের এ কথাটা ঠিক কিনা, ত চূর্ণী নদী অবিশ্যিই জানে। কিন্তু সে তো আর কথা কয়ে কিছু বলবে না।

রাণা সদারের কালীভক্তির কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। আজ যেখানে মা সিদ্ধেশ্বরী রয়েছেন, তার আশেপাশেই ছিলো রাণার প্রতিষ্ঠা করা কালী-প্রতিমা। অনেকেরই বিশ্বাস যে সেদিনের রাণার কালী প্রতিমাই হলো আজকের জাগ্রত সিদ্ধেশ্বরী দেবী।*২ আজও অনেকেই এসে মার কাছে নানারকম মানত করেন। ভক্তিভরে মানত যাঁরা করেন, মা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রার্থনা পূরণ করে থাকেন।

১। ১০৮ পৃষ্ঠার ছবিটি।

২। ১০৭ পৃষ্ঠার ছবিটি।

ঠাকুর ডাকাত

খুলনা জেলা এখন বাংলাদেশে। কিন্তু আমি প্রায় দেড়শো বছর আগেকার খুলনার কথা বলছি। ঠিক খুলনার কথা নয়, খুলনার একটি গণ্ডগ্রামের কথা। গ্রামটীর নাম হলো মোহনপুর। কচুয়া থানার মধ্যে ছিলো আমাদের এই মোহনপুর। অনেকে বলেন যে এই অঞ্চলে কচুর ফলন বেশী হতো বলেই, থানার নাম হয়েছিলো কচুয়া। সে যাক্, মোহন-পুরের গা ঘেঁষে তখন বয়ে চলতো বিষখালি নদী।

আর মোহনপুরের আশেপাশে ছিলো রামচন্দ্রপুর, ময়ালপুর, দৈবজ্ঞহাটি ইত্যাদি গ্রামগুলি। দৈবজ্ঞহাটি নামটি বড়ো সুন্দর তাই না? কে জানে, হয়তো বহুদিন আগে কয়েকজন দৈবজ্ঞ এসে এখানেই ঘর-সংসার পেতে-ছিলো। এই সব অঞ্চলের জমি নয়তো যেন সোনার খনি। অল্পস্বল্প খাটা খাটুনি করলেই খেত ফসলে ভরে উঠতো। ধান, কলাই ও মুসুরি গোলা ও খামার ছাপিয়ে উপচে পড়তো। গাঁয়ের ঘরে ঘরে তখন লক্ষ্মী যেন বাঁধা ছিলো। তাছাড়া সুন্দরবন তো ছিলোই—কাঠ ও মধুর অক্ষয় ভাঁড়ার! হরেক রকমের সওদা নিয়ে বড়ো বড়ো সব মহাজনী নৌকো এসে ভিড়তো বিষখালির ঘাটে ঘাটে। বসে যেতো বেচাকেনার হাট। দেখতে দেখতে মহাজনী নৌকাগুলির মাল গিয়ে উঠতো এই সব অঞ্চলের ব্যাপারীদের ঘরে ও ভাঁড়ারে। খালী নৌকাগুলি আবার এখানকার মিহি বালাম চাল, সীতাশাল চাল, সুন্দরবনের কাঠ ও মধুর পশরা নিয়ে বিষখালির বুকে বেয়ে গিয়ে হাজির হতো কোলকাতায় ও কত না বড়ো বড়ো শহরে। এই ঘাটগুলি তাই তখন ব্যাপারীদের আনাগোনায় গমগম করতো। কালে কালে ছোটো ছোটো গঞ্জই হয়ে দাঁড়ালো এই ঘাট-ঘেঁষা গ্রামগুলি। চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবী যেন পাকাপাকি ভাবেই এখানে আসন পেতে বসলেন।

এই মোহনপুরেই ছিলো 'অভয়ানন্দ স্বামীর' আশ্রম। তিনি ব্রাহ্মণের ছেলে এবং বিয়ে-থা তিনি করেননি। তাই বলে সংসারের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে বসে শুধু ধম্মো-কম্মো নিয়েই থাকতেন না। বরং তিনি 'জীবে দয়া'র ব্রতকেই মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। গরীব দুঃখীদের এককথায় তিনি মা-বাপ' ছিলেন। তাঁর আসল নাম যে কি ছিলো, তা আজ আর বলবে কে? তবে মোহনপুর ও পাশাপাশি কখানা গাঁয়ের লোককে সব রকম বিপদে আপদে থেকে তিনি বুক দিয়ে বাঁচাতেন ও অভয় দিতেন

বলেই বোধ হয় গাঁয়ের লোকেরা তাঁর নাম রেখেছিলো 'অভয়ানন্দ স্বামী'। কয়েক দণ্ডের জন্যে তাঁর আশ্রমে গিয়ে বসলেই আমরা বুঝতে পারবো যে কতখানি মমতায় ও করুণায় ভরা ছিলো এই মহাপুরুষের হৃদয় ও মন।

॥ ২ ॥

মোহনপুর গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই অভয়ানন্দ স্বামীর আশ্রম কোথায় তা জানে। তাছাড়া বেশ খানিকটা দূর থেকেই আশ্রমটী চোখে পড়ে। দালান-কোঠা গোছের কিছুই নেই। তবে কাছাকাছি গেলেই মনে হয় যেন আশ্রমটীকে ঘিরে শান্তির হাওয়া বইছে। সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জমির ওপর ফুলের বাগান—মাঝখানে পায়ে হাঁটা সরু পথ। সেই পথ ধরে বিশ-তিরিশ কদম এগিয়ে গেলেই মেটে দাবা। তার পেছনেই স্বামীজীর বসার ঘর—মানে একটা বড় মাপের আটচালা। আটচালার পিছনের চালাঘরটী স্বামীজীর ঠাকুর ঘর; আর দুধারে দুটো ছোটো ছোটো চালাঘর। তার একটাতে স্বামীজী নিজে থাকেন, আর একটী অতিথি বা শিষ্যদের জন্যে।

দাবা ও ঘরের মেঝে মাটির বটে, কিন্তু একেবারে ঝক্‌ঝকে করে নিকোনো। আসবাব-পত্তর বলতে দু'একখানা চৌকি ও জলচৌকি। শিষ্য ও অতিথিদের জন্যে বেছানো রয়েছে মাদুর। তখন বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। স্বামীজী

একটি জলচৌকির ওপর আসন পেতে বসে আছেন। পরনে তাঁর সাদামাঠা গেরুয়া কাপড়। মাঝবয়সী সুশ্রী স্বামীজীকে গেরুয়া কাপড়ে মানিয়েছেও ভালো। কিন্তু তাঁর মুখে বেদনার কালো ছায়া। তাঁর পায়ের কাছে বসে রয়েছেন একজন মহিলা একেবারে যেন শোকের প্রতিমূর্ত্তি। স্বামীজীর সামনে মাতুরে তু'চারজন অতিথি বসে আছেন—কে জানে তাঁদের কি সমস্যা। আশেপাশে রয়েছে তু'একজন শিষ্য স্বামীজীর ফাই-ফরমাসের অপেক্ষায় তারা যেন কান খাড়া করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীজী মহিলার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললেন—

—ওঠো, মা, ওঠো। বাড়ী যাও। কি করবে মা, বলো? ভগবানই দিয়েছিলেন, আর তিনিই নিয়েছেন।

—সবই বুঝি, বাবা। কিন্তু মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না। একটা সাতবছরের ছেলেকে নিয়ে আমি কতো সুখেই না ছিলাম। কিন্তু ভগবানের তা সইলো না। বাছা আমার মাত্তর তু'দিনের জ্বরে মার কোল খালি করে চলে গ্যালো—

—কেঁদে আর কি করবে মা! ভগবানের নাম করো। তিনিই শোক দিয়েছেন, আবার তিনিই সান্ত্বনা যোগাবেন। আমি বলছি মা, আমার কথা শোনো। তাঁর নাম করলে সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাবে। তাছাড়া যারা আছে, তাদেরও তো দেখতে হবে।

মহিলাটি কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে কোনোরকমে উঠে চলে গেলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বেস ফেলে ডাক দিলেন—

—নিত্যানন্দ,

—বলুন, বাবা।—একজন শিষ্য পাশ থেকে কাছে এসে হুকুম নেবার ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো।

—পরাণ মণ্ডলের ঘরটা ছেয়ে দেওয়া হয়েছে কি?

—কি করে হবে, বাবা? টাকার যে বড়ো খাকতি চলেছে।

স্বামীজী এই কথা শুনে বেজায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কয়েকদিন আগে পরাণ মণ্ডলের চালাঘর হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে বেচারা তাই আর কোনো উপায় না দেখে স্বামীজীর কাছে এসে কেঁদে পড়েছিলো। স্বামীজী তাকে কথাও দিয়েছিলেন যে যাহোক একটা ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। এখন তিনি শুনলেন যে টাকার অভাবে নিত্যানন্দ

কিছুই করে উঠতে পারে নি। তাঁর গলার স্বরে তাই ক্ষোভ যেন ফেটে পড়লো –

—তা বলে, বেচারা বৌ ছেলে-পুলে নিয়ে কি গাছতলায় থাকবে ? একে এই দারুণ খরা·· · উঃ। তোমরা আগে বলোনি কেন ? কিছু না হোক আমার খেতের ধান তো আছে ! এখুনি ধান বিক্রি করে, যা করার করো।

—কিন্তু বাবা, ধানও যে বাড়ন্ত হয়ে এলো। মাঝের কটা মাস এখন চললে হয়।

—কেন ? গত সনে ধানের ফলন তো বেশ ভালোই হয়েছিলো। আমার বিঘে-চল্লিশেক জমির ধানে এ কটা পেট চলবে না বল্লেই হলো ? আর চালাবার মালিক তুমি কবে থেকে হলে বাবাজীবন ?

—অপরাধ নেবেন না, বাবা। মানে পরে—

—আর কথা বাড়িও না। পরের কথা পরে আছে। এখন যা বলছি, তাই করো।

নিত্যানন্দ হুকুম তামিল করতে বেরিয়ে গ্যালো। এমন সময় একজন মাঝবয়সী লোক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে স্বামীজীর পাদুটো জড়িয়ে ধরলো। তারপব তার সে কি কান্না। বিব্রত স্বামীজী তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন—

—আহা, কি বিপদ তা বলবে তো হারু ?

—কি আর বলবো, বাবা। আমার ছ'বছরের ছেলেটারে একেবারে কালরোগে ধরেছে। তারে বোধ হয় আর বাঁচাতে পারলাম না।

চমকে উঠলেন স্বামীজী। বেশ কয়েকদিন ধরে একটানা খরা চলেছে। খাল-বিল, পুকুর-ডোবা সব শুকিয়ে একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে যাবার যোগাড়। বৃষ্টির অভাবে যেন গাঁ গুলি ধুঁকছে। এই ফাঁকে কি কালরোগ ঢুকে পড়লো ময়ালপুরে ? সর্ব্বোনাশ ! শিউরে উঠলেন তিনি। ঢোক গিলে, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—মানে, ওলাওঠা নয় তো ?

—আজ্ঞে, ওলাবিবিরই কোপে পড়েছে আমার ছেলেটা ! কয়েকদিন আগেই আমরা গাঁয়ের দশঘর মিলে ওলাবিবির পুজো—

—বুঝেছি ! হরি—

আর একজন শিষ্য এগিয়ে এসে স্বামীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

—চট্‌পট্‌ আমার ওষুধের বাক্সোটা নিয়ে এসো। আমাদের এখুনি ময়ালপুরে যেতে হবে।

—এই আনছি বাবা। তবে একেবারে ঠিক্ দুপুর বেলায়, পেটে কিছু না দিয়ে

—সময় নষ্ট করো না। ধীরে সুস্থে চিকিৎসে করার রোগ এ নয়!

হরি আর কথা না বলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্সোটা আনতে চলে গ্যালো। স্বামীজী মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন—

—আরে, দারোগাবাবু যে। কখন এলেন? বৃষ্টির তো কোনো নাম-গন্ধও নেই! এদিকে ময়ালপুরে মহামারী আরম্ভ হয়ে গ্যালো বলে!

—হুঁ। আমি সবই শুনলাম। এখনি গিয়ে কর্তাদের খবরাখবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—তা, আপনার কি কোনো বিশেষ কাজের কথা ছিলো?

—সাধুসন্ত লোকের সঙ্গে দারোগার আর কি কাজের কথা থাকবে! চোর-ডাকাতের পেছনে ছুটে ছুটে প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছিলো। তাই ভাবলাম—

—কি যে বলেন, দারোগাবাবু। শান্তিরক্ষাও বড়ো পবিত্র কম্মো।

— শান্তিরক্ষাই বা আর করতে পারলাম কই? এক আলখাল্লা-পরা ডাকাতের দাপটেই নাজেহাল হয়ে গেলাম—খেয়েও শান্তি নেই, শুয়েও শান্তি নেই।

—মন খারাপ করবেন না, দারোগাবাবু। আমি বলছি যে আলখাল্লা-পরা ডাকাতের দিন প্রায় ঘনিয়ে এলো বলে।—

এমন সময়ে দেওয়ালে বসা একটা টিকটিকি বেজায় জোরে 'ঠিক্ ঠিক্' বলে ডেকে উঠলো। সব থেকে বেশী চমকে উঠলেন স্বামীজী নিজেই। এদিকে হরি ওষুধের বাক্সো নিয়ে চলে এসেছে। স্বামীজী নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—

—আজ তাহলে আসি, দারোগাবাবু।

দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে উঠে একটু হাসলেন। হারু ও হরিকে নিয়ে স্বামীজী তখন খরপায়ে হেঁটে চলেছেন ময়ালপুরের পথ ধরে। মাথার ওপর তাঁর দুপুরের কাটফাটা রোদ, আর মনের ভেতরে দুর্ভাবনার কালো মেঘ।

॥ ৩ ॥

স্বামীজীর মমতাভরা মনে কারণে ও অকারণে অনেক দুর্ভাবনারই ঢেউ ওঠে। কাজেই তাঁর মনের নাগাল পাওয়া ভার। কিন্তু দারোগা-বাবুর দুর্ভাবনা ও অশান্তির কারণ খুঁজে বের করা মোটেই শক্ত নয়। মোহনপুর থানার এলাকায় একটার পর একটা ডাকাতি হয়েই চলেছে। ডাকাতদের খোঁজে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দারোগাবাবু হিমসিম খেয়ে গেলেন। কিন্তু ঐ ঘোরাঘুরিই সার হলো। ডাকাতেরা সব যেন একেবারে নিপাত্তা আর মালামালেরও কোনো হদিস্ নেই। দারোগাবাবু থানায় বসে মাথায় হাত দিয়ে এই সব কথাই ভাবছেন। ডাকাতি থামাতে না পারলে চাকরী নিয়েই যে টানাটানি পড়বে। জীবনে তিনি অনেক ডাকাতিই দেখেছেন। তাঁর হাতে চালান হয়ে আজও ঘানি টানছে এমন ডাকাতের সংখ্যাও নেহাৎ কম হবে না। কিন্তু এযে একেবারে তাজ্জব ব্যাপার।

ডাকাতেরা ডাকাতি করার পর যেন একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কোন পথ ধরে তারা যে কোনদিকে চলে গ্যালো, তা পর্য্যন্ত কেউ বলতে পারে না। ব্যাটারা সৌখিনও কম নয়। কাঁচা টাকা ও গয়না ছাড়া কিছুই তারা ছোঁয় না। বাসনপত্তর ও কাপড়চোপড় নিলেও না হয় চোরাই মালের কারবারীদের ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করা যেত। আর সব

ডাকাতির বাদীরাই এসে বলছে যে ডাকাতদের সর্দার হলো এক আলখাল্লা-পরা লোক। তার হুকুমেই ডাকাতরা লুঠতরাজ বা মারধোর যা করার করে। তবে আলখাল্লা-পরা সর্দার অকারণে মারধোর করে না। কে এই আলখাল্লা-পরা সর্দার? একটা জবজড়ং গোছের আলখাল্লা পরেই বা সে ডাকাতি করতে আসবে কেন? কিন্তু বাদীরা সবাই তো আর দেখতে ভুল করতে পারে না। আলখাল্লা পরে তাড়াতাড়ি চলাফেরার ঝামেলাও কম নয়। তাহলে কি সর্দার আলখাল্লা দিয়ে কি কিছু ঢেকে রাখতে চায়! হতেও পারে? কিন্তু কি? ছোটোখাটো ধরনের মারাত্মক কিছু অস্তরপাতি নয় তো? মানুষটাকে ধরতে না পারলে এ সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে কোত্থেকে? মাথা গরম হয়ে ওঠে দারোগাবাবুর। এদিকে আলখাল্লা-পরা সর্দারটীকে ঘিরে হরেকরকমের আজগুবি গল্পও ছড়িয়ে পড়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে। সে নাকি একজন গুণী লোক। সে জানে না এমন মন্তর-তন্তরই নেই। দরজা ভেঙে তাকে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে হয় না। আগেভাগেই তার নিদালি মন্তরের গুণে বাড়ীর ও গাঁয়ের লোকজন সব যেন মরণ-ঘুমে ঢলে পড়ে। তারপর তার দলের একজন পাঁচিল টপকে বাড়ীর ভেতর ঢুকে দরজা খুলে ধরে। এতেই তো আদ্ধেক কাজ ফতে। আলখাল্লাধারীর গুণের কি আর শেষ আছে! হাত গুণেই সে জানতে পারে যে কোন সিন্দুকে বা কোন বাক্সোতে কি আছে এবং কোথায় আছে তাদের চাবি। ব্যস্, এর পরে আর বাধা কি? কাজতো পুরোপুরিই হাসিল। দরজা ভাঙো রে, কর্তাকে খুঁজে পেতে বার করে বাঁধো রে—এসব কোনো ফৈজৎই করতে হলো না। তবে হ্যাঁ, ডাকাতি করে পালাবার সময় অবিশ্যি গাঁয়ের লোকজন তাদের পিছু নিতে পারে। না, তাও তারা পারে না। নিদালি মন্তরের গুণ তো আছেই। তার ওপর সে পথের চারপাশে গণ্ডি দিতে দিতে দলবলকে নিয়ে বিনা বাধায় একেবারে যেন হাওয়া হয়ে যায়। এ যেন সেই লক্ষ্মণের দেওয়া গণ্ডি। এর ভেতরে ঢুকে ডাকাতদের রোখা যে সে লোকের কম্মো নয়। এ গণ্ডি কাটতে গেলে আরও উঁচুদরের একজন গুণীলোক দরকার। অতো রাত্তিরে কোথায় মিলবে অমন একজন গুণীলোক? তাছাড়া আলখাল্লা-ধারী নাকি আবার হরেকরকম পশুপাখীর ডাকও ডাকতে পারে। দরকার হলে সে চার পাঁচ রকম গলায় কথা বলেও লোকজনকে ভড়কে দিয়ে থাকে। এ ধরনের কত কথাই যে রটেছে তা বলে শেষ করা যায়

না। সবাই মনে মনে বুঝেও ফেলেছে যে এ হেন ডাকাতের সর্দারকে জব্দ করা দারোগাবাবুর কেরামতিতে কুলোবে না। তাই ধনী লোকেদের কাছে দৈবজ্ঞ ও গুণীনদের কদর হঠাৎ বেড়ে গেছে। হাত গুনিয়ে, বা ঝাড়-ফুঁক করিয়েই আলখাল্লাধারীকে রোখা যাবে বলে তাদের বিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস তাদের কাছে। কিন্তু তাদের বিশ্বাসের ওপর ভরসা করে দারোগাবাবু কি আর নিশ্চিন্তি মনে বসে থাকতে পারেন? তাই তিনি কাকের মুখে কিছু খবর পেলেও ছোটাছুটি করছেন আর দিনরাত ভেবেই চলেছেন।

॥ ৪ ॥

পলাশডাঙ্গার মহাদেব সমাদ্দারের নাম কে না জানে? মোহনপুর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামটী। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বলেশ্বর নদী। মহাদেব সমাদ্দার হলেন এখানকার একজন নামজাদা তালুকদার। অনেক তালুক মুলুকের মালিক তিনি। যাকে বলে সেই জাজ্বল্যিমান অবস্থা—দুয়োরে বাঁধা হাতী। তবে তাঁর মতো তালুকদার আরও দু'একজন যে, সে অঞ্চলে ছিলো না, তা নয়। কিন্তু মহাদেব সমাদ্দারকে পলাশডাঙ্গার ও আশপাশের গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই একডাকে চিনতো তাঁর পয়সার জন্যে নয়, গুণের জন্যে। তাঁর বাড়ীতে দোল-দুর্গোচ্ছোব ও বারোমাসে তেরো পাব্বণ লেগেই ছিলো। তখন সমাদ্দার বাড়ীর সদর দরজা সকলের জন্যেই খোলা থাকতো। গরীব-দুঃখীরা সে কদিন পেট পুরে খেয়ে দু'হাত তুলে সমাদ্দার মশায়কে আশীর্ব্বাদ করতে করতে বাড়ী ফিরে যেত। এমনিতেই তাঁর কাছে রোজই গরীব-দুঃখীদের একটা ছোটোখাটো ভিড় জমতো। তিনি যথাসাধ্যি তাদের সাহায্য করতেন। একেবারে খালিহাতে কেউ কোনদিনই তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসে নি। তিনি আবার আমাদের অভয়ানন্দ স্বামীর একজন প্রিয় শিষ্য। গুরুর কাছে বিধান না নিয়ে তিনি কোনো কাজেই হাত দিতেন না। এই তো মাত্তর দিন দশেক আগে তাঁর ছোটো ছেলে, সুবিমলের বিয়ে হলো। ছেলের মতো ছেলে বটে সুবিমল—কালে কালে সে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। বহু খোঁজাখুঁজি করে পাশের গ্রামের জমিদার মশায়ের একমাত্র মেয়ে গৌরীকে, সমাদ্দার মশায় ছেলের

বৌ করে ঘরে আনলেন। জমিদারমশায় নাম রাখতে একটুও ভুল করেন নি—মেয়ে যেন তাঁর একেবারে সাক্ষাৎ গৌরী। ঘর আলো-করা বৌ দেখে সবাই বলাবলি করতে লাগলো—বৌ নয়তো, যেন একেবারে মা লক্ষ্মী। একমাত্র মেয়েকে গয়নায় একেবারে মুড়ে দিয়েছিলেন জমিদার মশায়। আর দানসামিগ্রি—যা দিয়েছিলেন তাতে ঘর ভরে উঠলো সমাদ্দার মশায় এর। জমিদার বাড়ীর মেয়ে এলো সমাদ্দার বাড়ীর বৌ হয়ে। একি একটা যেমন তেমন ব্যাপার। সমাদ্দার মশায় একেবারে খোলা হাতে খরচ করলেন। আলোয়, সাজে ঝলমলিয়ে উঠ'লো তাঁর তিন-মহলা বাড়ী। 'রোশন চৌকির সুরে সুরে খুশীর নেশা ছড়িয়ে পড়লো পলাশডাঙ্গার ঘরে ঘরে। আতসবাজি যে কত পুড়লো তার কোনো ঠিক্‌ঠিকানা নেই। আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধু-বান্ধবে ভরে উঠলো সমাদ্দার বাড়ীর অন্দরমহল। পলাশডাঙ্গা ও পাশাপাশি গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাই বেশ কদিন আনন্দ করে বসে নেমন্তন্ন খেলো সমাদ্দার বাড়ীতে। গাঁয়ের বুড়োরাও বললো যে অনেকদিন এ অঞ্চলে কারুর বিয়েতেই এত জাঁকজমক তারা ছাখে নি। জমিদারবাবুকে পাকাকথা দেবার আগে সমাদ্দারমশাই গুরুদেবের মতামত নিতে ভুল করেন নি। তারপর বিয়ের আগেই সাতবেয়ারার পাল্কী ছুটলো গুরুদেবের আশ্রমে। কুলগুরুর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে নতুন বৌ নতুন জীবনের পথে পা বাড়ালো কিন্তু গুরুদেব বেশ কদিনের জন্যে শিষ্য বাড়ীতে আটকা পড়ে গেলেন। তাঁর যে কতো কাজ সে তো আমরা নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু সেই আনন্দের হাটে কে কার কাজের কথা শোনে? আর ভক্তের কথা কবেই বা কোন গুরুদেব পায়ে ঠেলতে পেরেছেন!

॥ ৫ ॥

কিন্তু দশরাত্তির কাটতে না কাটতে সমাদ্দার-বাড়ীতে বিনা মেঘে বাজ পড়লো। সমাদ্দারমশায়ের দান-ধ্যান, গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ—এসবের ফল কি শেষে এই হলো? সুলক্ষণা বৌ ঘরে আসতে না আসতে এ কি বিপদ! কাল রাতে তাঁর বাড়ীতে এক সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে। বলিহারি বুকের পাটা ডাকাতদের। এত বড়ো বাড়ী লোকজনে গম গম করছে, দেউড়িতে রয়েছে দারোয়ানদের দল। কিন্তু

ডাকাতেরা বেমালুম দারোয়ানদের চোখে ধূলো দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো! তারপর তাদের ফেললো বেঁধে— কেউ তারা একটু টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলো না। অবাক কাণ্ড—নয় কি? মন্তর-তন্তর জানা থাকলে অবিশ্যি এ আর এমন কি কথা! দলের সর্দার যখন সেই আলখাল্লাধারী তখন মন্তরের গুণেই হয়তো সব কিছু সে সম্ভব করেছে। দারোয়ানদের কাবু করে ফেলে ডাকাতেরা প্রায় প্রতিটী ঘরে হানা দিয়েছে। সব শেষে উপরে উঠে এসে তারা ভেঙেছে সুবিমলের শোবার ঘরের দরজা। দরজা ভাঙার আওয়াজে দুজনেরই ঘুম গেছে ভেঙে। সুবিমল ঘরের বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালো। সামনে তার আলখাল্লা-পরা ডাকাত। সে কিছু ভাববার আগেই আলখাল্লাধারীর একজন সাকরেদ তাকে জাপটে ধরে বেশ কয়েক ঘা

হাঁকড়ে দিল। নতুন বৌ আতঙ্কে যেন হতভম্ব হয়েছিলো এতক্ষণ। স্বামীর গায়ে হাত পড়তে দেখে তার ঘোর কাটলো। দৌড়ে এসে সে বেচারী আলখাল্লাধারীর পায়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলো। ডাকাতের সর্দারের কাছে সে শুধু একটী মাত্তরই ভিক্ষে চায়—তার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষে। গয়নাগাঁটি যা আছে সবই—ডাকাতেরা নিয়ে যাক্। কিন্তু তার স্বামীকে তারা ছেড়ে দিক, সে প্রাণে বেঁচে থাকুক। তার কাতর কান্না

দেখেই হোক্, বা সিন্দুকের চাবি পেয়েই হোক আলখাল্লাধারীর মন ভিজলো। সুবিমল মারের হাত থেকে রেহাই পেলো। গয়নাগাঁটি অবিশ্যি তারা সিন্দুক একদম খালি করেই লুঠে নিয়ে গ্যালো। তা যাক, তার স্বামী যে প্রাণে বেঁচে গেছে এই যথেষ্ট। বাড়ীর লোকজন ততক্ষণে জেগে উঠেছে। তাদের হাঁকডাক শুনে পাড়া পড়শীরাও এসে জুটেছে। দারোয়ানেরাও এক ফাঁকে তাদের বাঁধন খুলে গাঁয়ের পথ ধরে পাগলের মত দৌড়ে চলেছে। কিন্তু ডাকাতের দল তখন তাদের নাগালের অনেক বাইরে চলে গেছে। দু'দুখানা ছিপ নৌকো তাদের নিয়ে বলেশ্বরীর জল কেটে তীরবেগে ছুটে চলেছে। রাতের জমাট অন্ধকার ফিকে হতে তখনও বেশ দেরী। দাঁড় ফেলার ছপ্ ছপ্ আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে ডাকাতদের দু'একটা কথা কানে ভেসে আসছে। 'অনেক কাল পরে আজ একটা বেশ মোটা দাঁও মারা গ্যাছে', 'এতে আমাদের কাজকম্মো বেশ কদিন চলে যাবে' 'সিন্দুকের চাবিটা যে এতো সহজে পাওয়া যাবে, তা কে জানতো'; 'বড়লোকের ছেলেগুলো স্রেফ ঘি দুধের যম'—এই সব কথা আর কি ? তারা সবাই একেবারে খুশীতে ডগমগ। কিন্তু আলখাল্লাধারীর মুখে কোন রা নেই।

আর রা নেই সমাদ্দার বাড়ীর নতুন-বৌ এর মুখে। ডাকাতরা চলে যাবার পর থেকেই সে বেচারা যেন কেমন হয়ে গেছে। চুপচাপ্ আপন মনে বসে কি যেন সে ভেবেই চলেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে হুঁ, হ্যাঁ করেই সে কাজ সারে, কখনও বা মাথাটা শুধু নাড়ে। কি এতো আকাশ-পাতাল যে সে ভাবে, তা সেই জানে। মন খারাপ অবিশ্যি হবারই কথা—বিয়ের গয়না বলতে তার আর একখানিও রইলো না। তবে বাবা যার জমিদার, শ্বশুর যার তালুকদার তার নতুন গয়না হতে আর কতক্ষণ ? সমাদ্দার মশায় তো তাকে বলেইছেন—'গয়নার জন্যে দুঃখু করো না, মা। স্যাক্‌রাকে খবর দিয়েছি। সে তোমার পছন্দ সই গা-সাজানো গয়না গড়ে দেবে।' কিন্তু কিছুই যেন তার কানে যায় না। শ্বশুরের সামনে কথা বলার রেওয়াজ তখন বড় একটা ছিলো না। কিন্তু কথা না হয় নাই বললে। মুখের ভাবও যে তার একটুও বদলায় না। সমাদ্দারমশায়ের মতো বিচক্ষণ লোকও ভাবনায় পড়ে গেলেন—ঐ তো এতটুকু মেয়ে, এ রকম মুখ গোঁজ করে থাকলে যে অসুখে পড়ে যাবে। কিন্তু করারই বা কি আছে। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি মাথা চুলকোতে চুলকোতে কথাটা পাড়লেন—

'ছাখো মা, তোমাকে আমি অনেক সাধ করে ঘরে এনেছি। কিন্তু কটা দিন যেতে না যেতেই এত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গ্যালো। কিন্তু সে আমাদের কপাল! কপালের গেরো কে খণ্ডাবে, মা? তাই বলে তুমি যেন নিজেকে অপয়া মনে করে মুখ ভার করে থেকো না।' এতেও কোন বিশেষ ফল হলো না। শুধু একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠলো নতুন-বৌ'এর মুখে। তাতেই ভরসা পেয়ে সমাদ্দার-মশাই বলে চল্লেন—'বরং তোমার সিঁথির সিঁদুরের জোরেই খোকা আমার প্রাণে বেঁচে গেছে। ডাকাতদের মার থেকে স্বামীকে বাঁচানো আর যমের কবল থেকে স্বামীকে ফিরে পাওয়া—অনেকটা একই ব্যাপার। তুমি শুধু লক্ষ্মীই নও মা, তুমি আমাদের সাবিত্রীর সমান।' লজ্জায় শুধু লাল হয়ে উঠলো নতুন-বৌ'এর মুখ। কিন্তু মুখ থেকে কথা কিছু সরলো না। খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হলেন জমিদারমশায়। মেয়ের রকমসকম দেখে তিনিও ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মেয়ে এমন কিছু ভয়-তরাসে নয়। তাছাড়া ডাকাতরা থাকতে সে ভয়ে দিশেহারা হয়ে যায় নি। ডাকাতদের কথা মনে করে এখন সে কেন তবে ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে বসে থাকবে। নিশ্চয়ই সেই হতভাগা আলখাল্লাধারী তাঁর মেয়েকে কিছু তুক্-গুণ করে গেছে। এখন একজন গুণীনকে ডেকে ঝাড়-ফুঁক করালেই সব গোল মিটে যাবে। সমাদ্দার-মশাই'এর সঙ্গে এই নিয়ে তিনি পরামর্শো করতে বসলেন। মেয়ের কানেও একথাটা এক সময় পৌঁছে যায়। এবার সে বাবার কাছে মুখ খুলে বলে—'আমায় কেউ কোনো তুক্-তাক্ করে নি, বাবা। আমার জন্যে মিছে ভেবোনা, তোমরা। দু'চারদিনের মধ্যেই সব কিছু ঠিক্ হয়ে যাবে।' এর পর আর কিই বা করবেন তাঁরা? কতদিনই বা আর মেয়ের বাড়ী থাকা যায়। জমিদারমশায় তাই নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তবু তো যাহোক তাঁর মেয়ে মুখ খুলে দু'চারটে কথা অন্তত বলেছে।

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকদিন কাবার হলো। কিন্তু নতুন বৌ'এর ভাব ভঙ্গির বিশেষ কোনো হেরফের হলো না। কতদিন আর চুপচাপ থাকা যায়। এবার কিছু একটা না করলেই যে নয়।

কিন্তু কাউকেই কিছু একটা করতে হলো না। হঠাৎ একদিন যেন নতুন-বৌ'এর মাথা থেকে ভাবনার ভার নেমে গ্যালো। মনের ওপর থেকে তার অস্বস্তির কালো মেঘ বিদায় নিলো। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে

এলো নতুন-বৌ'এর চলাফেরা ও কথাবার্তা। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো—বিশেষ করে বেচারী সুবিমল। তাকে বাঁচাতে গিয়েই না ডাকাতের সর্দারের পায়ে পড়তে হয়েছিলো নতুন-বৌকে। তাতেই বোধহয় জোর ধাক্কা লেগেছিলো তার মনে। এসব কথার কোনো উত্তর অবিশ্যি নতুন-বৌ'এর কাছ থেকে মেলে নি। সে শুধু মুখ টিপে হেসে বলতে থাকে—বাব্বাঃ, একটা যা ধাঁধার পাল্লায় পড়েছিলুম।

এদিকে দারোগাবাবু তখনও গোলক-ধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সমাদ্দার বাড়ীতে ডাকাতি। এ যে দারুণ সাহসের ব্যাপার। আল-খাল্লাধারীর সাহস একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর তা যাবে নাই বা কেন? পর পর এতগুলো বাড়ীতে ডাকাতি করে দিব্যি সে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। কাজেই সে ধরেই নিয়েছে যে কচুয়ার দারোগাবাবু একটা অকম্মার ধাড়ি। না—আলখাল্লাধারীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ডাকাতের দশদিন আর দারোগার একদিন। খিদে তেষ্টা ভুলে তাই তিনি একেবারে উঠেপড়ে লেগে গেছেন। গোটা এলাকাটা তিনি তোলপাড় করে ফেলেছেন। চারদিকে তাঁর চরেরাও খবরের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আলখাল্লা-পরা ডাকাতের কোনো হদিসই নেই। এলাকার প্রতিটী ডাকাতের ঘাঁটিতে তিনি আচমকা হানা দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও কিছু সুবিধে করতে পারেন নি। সমাদ্দার বাড়ীতে তিনি গেড়ে বসে একের পর এক সকলের জবানবন্দী নিয়েছেন। আড়াল থেকে নতুন বৌকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এইটুকুই শুধু জেনেছেন যে আলখাল্লা-পরা একজন লোকের হুকুমেই ডাকাতরা যা করবার করছিলো। কিন্তু আর কিছুই কেউ বলতে পারে না। এমন কি কোন পথে যে ডাকাতরা উধাও হয়ে গ্যালো, তাও কেউ জানে না। তাহলে কি লোকে যা বলে তাই ঠিক? আলখাল্লাধারী কি তাহলে তার দলবল নিয়ে ডাকিনীদের মতো আকাশ পথেই আসা-যাওয়া করে? কে জানে? কথাটা তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একবার অভয়ানন্দ স্বামীর সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করা দরকার। কিন্তু তাঁর যে দেখা পাওয়াই ভার। ময়ালপুরে কলেরা প্রায় মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে দিনরাত প্রায় সেখানেই পড়ে আছেন। তবুও আজ একবার খোঁজ করে তাঁকে ধরতেই হবে। স্বামীজী একজন কালী সাধক। কালীসাধকদের গুণাগুণের কথাও তাঁর অজানা নয়। তার ওপর তিনি দরিদ্রনারায়ণের

সেবার কাজে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ান। আলখাল্লাধারীর কোন তল্লাস তাঁর কাছে মিললেও মিলতে পারে।

স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার গরজ দারোগাবাবুর না হয় থাকতে পারে; কিন্তু সমাদ্দার বাড়ীর নতুন-বৌ কেন যে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে চায় তা আমি জানি না। বাড়ীর লোকজনেরাও সব অবাক। এই তো সেদিন গুরুদেব এসে তাদের আশীর্ব্বাদ করে গেলেন। এ কদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আবার কি দরকার পড়লো? তাছাড়া সমাদ্দার বাড়ীর বৌ-ঝিদের একটা আলাদা মান-মর্য্যাদা আছে। হরঘড়ি বাড়ীর বাইরে যাওয়া তাদের মানায় কি? আর যেতে গেলে পাকাপোক্ত ব্যবস্থাও তো চাই। জিজ্ঞাসা করলে নতুন-বৌ শুধু বলে—'আমি একবার গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করতে চাই।' সমাদ্দার মশাই কাঁচা লোক নন। তিনি বেশ হাড়ে হাড়েই বুঝেছেন যে বৌমাটী তাঁর বেজায় জেদী। জমিদারের মেয়ের মেজাজ তো! কে জানে আবার যদি মুখ ভার করে বসে থাকে! সেই ভয়েই তিনি আর এই নিয়ে টালবাহানা করতে সাহস পেলেন না। তাঁর মত ও পায়ের ধূলো নিয়ে সুবিমলও নতুন-বৌ গিয়ে উঠলো পাল্‌কীতে। আবার ছুটলো সেই সাত-বেয়ারার পাল্কী। নতুন-বৌ বেশ দিব্যি হাসি-খুশী, কিন্তু সুবিমল বেচারা একেবারেই চুপচাপ। নতুন-বৌ'এর কাণ্ডকারখানা দেখে সে যেন বেশ অস্বস্তিতেই পড়ছে। ভাবনাও একটা ঢুকেছে তার মাথায়। নতুন-বৌ'এর মাথার কোনো গোলমাল নেই তো?

বেয়ারাদের কাছে পাঁচ মাইল পথ এমন একটা কিছু নয়। দেখতে দেখতে মোহনপুরের আশ্রম এসে গ্যালো। গুরুদেবের সম্মানে আশ্রমের হাতার বাইরেই পাল্‌কী থামলো। সমাদ্দার-বাড়ীর সাত বেয়ারার পাল্‌কী কে না চেনে, আশেপাশের ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। বড়রা এগিয়ে এসে তাদের সরিয়ে পথ করে দিলো। সুবিমল ও নতুন-বৌ ধীরে ধীরে আশ্রমের ঘরের দিকে এগিয়ে চললো। সমাদ্দার-বাড়ীর বৌকে আশ্রমে আসতে দেখে সবাই বেশ হকচকিয়ে গেছে। কারণটা যে কি সে তো কারুর জানার উপায় নেই। তবে ব্যাপারটা যে গুরুতর সেটা সকলেই আন্দাজ করে নিয়েছে। শিষ্যরা দৌড়ে এসে স্বামীজীকে খবরও দিয়ে দিয়েছে। স্বামীজীর ইসারায় সকলেই তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে ওদিকে বসে বা দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু

স্বামীজী তাঁর জায়গায় বসে আছেন। করুণায় ভরা ও প্রশান্তিতে ঘেরা তাঁর মুখের দিকে তাকালে কার মন না শান্তিতে ভরে ওঠে? নতুন-বৌকে সামনে নিয়ে সুবিমলকে ঢুকতে দেখে তিনি অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে বললেন—

—এসো, মা, এসো। এসো সুবিমল, এসো।

নতুন-বৌ তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা এসে গড় হয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করলো। তারপর তাঁর দুটো পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লো। ফুলে ফুলে সে কি কান্না? কিন্তু এতো কান্নার কারণ কি? ডাকাতির পরেও তাকে কেউ কাঁদতে দ্যাখে নি। তবে কি গুরুদেবকে দেখেই তার এতদিনের জমাট-বাঁধা কান্না আজ অঝোরে ঝরে পড়ছে। সুবিমল ভাবলো—এ ভালোই হলো। ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে থাকার চেয়ে কেঁদে বুক হাল্কা করে ফেলা অনেক ভালো। গুরুদেব তাঁর শিষ্যের বাড়ীতে যে ডাকাতি হয়ে গেছে, তা অবিশ্যি জানতেন। কিন্তু ডাকাতির পরে নতুন-বৌ'কে নিয়ে সমাদ্দার-মশাই যে কি আতান্তরে পড়েছিলেন সে খবর তাঁর কাছে পৌঁছায় নি। তিনি তাই ধরে নিলেন যে আর পাঁচটা মেয়ের মতো নতুন-বৌটীও গয়নার শোকে কাতর হয়ে পড়েছে। তার মাথায় হাত দিয়ে তিনি সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলেন—

গয়নার জন্যে দুঃখু করো না, মা। তুমি যে সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী। তোমার গয়নার অভাব কি মা? তোমার রাজার মতো শ্বশুর—

মাথা নেড়ে বাধা দিয়ে নতুন-বৌ কান্না-ভেজা গলায় বলে ওঠে—

—গয়নার জন্যে দুঃখু করি না, বাবা। তবে আমিও ঘরে এলাম, আর বাড়ীতেও ডাকাত পড়লো! বাবা, আমি কি তবে অপয়া, অলক্ষ্মী?

—ছিঃ মা। এসব কথা ভুলেও মনে স্থান দিও না। তোমার মতো লক্ষণযুক্ত মেয়ে লাখেও একটা মেলে না।

—তবে বাবা, কেন এমন বিপদ হলো? আমি যে লজ্জায় কারুর কাছে আর মুখ দেখাতে পারি না।

—গ্রহের ফের মা, গ্রহের ফের। তাছাড়া, এটা যে ভগবানের একটা পরীক্ষা নয়, তাই বা কে বলতে পারে?

—বাবা, ভগবান কি তাহলে আমাকে পরীক্ষা করছেন?

—সে আর আমি কি করে বলবো, মা? আমি শুধু এইটুকুই জানি যে তিনি মঙ্গলময়। তিনি যা করেন সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যেই করেন।

—তাহলে বাবা, এই ডাকাতিটাও কি তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্যেই ঘটালেন ?

—নিশ্চয়ই। এ ব্যাপারে মনে কোনো সংশয় রেখো না। আমি প্রাণভরে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি যে তোমার মঙ্গল হোক ; ভগবানের প্রতি তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি অচলা হোক।

এবার নতুন-বৌ উঠে দাঁড়িয়ে, চোখ মুছতে মুছতে বলে চলেছে—

—আমরা সংসারী মানুষ। সহজেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। তবে বাবা, আপনার কাছে এলে মনে অনেকটা শান্তি পাই।

—তা বেশ তো। সময় পেলে মাঝে মাঝে আসবে বৈ কি মা! আজ তাহলে এখন এসো মা। বেলা অনেক হলো।

—কিন্তু বাবা, আমার একটা আবদার ছিলো। অভয় দ্যান তো বলি।

—অনুমতি নিয়ে কে আর কবে বাবার কাছে আবদার করে ?

এই কথা বলে প্রাণখোলা প্রসন্ন হাসিতে গুরুদেব ঘর ভরিয়ে তুললেন। তাঁর হাসি থামলে, নতুন-বৌ তার আবদারটা পেশ করে—

—আজ সোমবার। আগামী বুধবারে আমাদের বাড়ীতে আপনার পেসাদ পাবার আমার বড় সাধ। যদি দয়া করে পায়ের ধূলো—

—এই কথা! কিন্তু মা, ময়ালপুরের রুগীদের নিয়ে আমি যে বড়ই ব্যস্ত।

—না, আমি কোনো কথা শুনবো না, বাবা। আমি বুধবার সকালেই পাল্‌কী পাঠিয়ে দেবো।

—নাও, বেটী যেন একেবারে হুকুম জারি করে বসলো। বেশ তাই হবে। এ হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করার যে কোনো আদালতই নেই, মা!

এই বলে আবার তিনি হাসিতে ঘর ভরে ফেললেন। সুবিমল ও নতুন-বৌ বিদায় নিয়ে ফিরে চললো সেই পলাশডাঙায়। কিন্তু তারা চলে যাবার পরই স্বামীজীর মুখের চেহারা একেবারে বদলে গ্যালো ? দুর্ভাবনার কালো মেঘে ঢাকা পড়লো তাঁর মুখের স্বাভাবিক প্রসন্নতা। কিন্তু তা মাত্তর কয়েক মিনিটের জন্যেই। তারপর আবার যে কে সেই শান্ত সুন্দর অভয়ানন্দ স্বামী। মুখে তার বরং হাসির রেখা উঠলো ফুটে। এবং তিনি গুণগুণ করে নিজের মনেই গান ধরলেন—

'সকলই তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি করো, মা
লোকে বলে করি আমি॥'

তাঁর শিষ্যের দল গুরুদেবের ভাবভঙ্গীর কোনো মানেই বুঝতে পারলো না। আমাদের অবস্থাও অনেকটা একই রকমের।

তবে সুবিমলের মনের ভাব আমরা খানিকটা আঁচ করতে পারি বৈ কি। মাত্র সেদিন হলো বেচারার বিয়ে হয়েছে। তার দিনদশেক পরেই বাড়ীতে ডাকাত পড়লো। সেটা দুর্ভাগ্যের কথা ঠিকই। কিন্তু একটা অদ্ভুত কোনো ঘটনা সেটা নয়। তারপর থেকে নতুন বৌ যা করে চলেছে তার কোনো মাথামুণ্ডুই যে সে খুঁজে পাচ্ছে না। প্রথম কটা দিন তো সে গোঁজ হয়েই বসে রইলো। তারপর হঠাৎ একদিন আবার তার সে ভাবটা গ্যালো কেটে। তার চলাফেরা অনেকটা স্বাভাবিক হলো। দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার এক বায়নাক্কা—গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করতে যাবো। শ্রীচরণ দর্শন করে সে একেবারে কেঁদে কেটে অস্থির। কি যে হল তার, তা সেই জানে। আর নতুন-বৌ যে অমন পাকা গিন্নীর মত গুছিয়ে কথা বলতে পারে তাই বা কে জানতো? দুঃসাহসও কম নয়। কাউকে জিজ্ঞাসা না করে দিব্যি গুরুদেবকে নেমন্তন্ন করে এলো। পাল্কীতে বসে মুখ ভার করে এই সবই ভেবে চলেছে সুবিমল। আর নতুন-বৌ তখন বাইরের দিকে মুখ করে মিটিমিটি হাসছে। তার কান্না বা হাসি কোনোটারই মানে বোঝা ভার।

॥ ৭ ॥

নতুন-বৌ বাড়ী ফিরেই আবার গম্ভীর। কোনোরকমে দুটী ভাত মুখে তুললো কি না তুললো। তারপর বসে বসে সে ভেবেই চলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যতো কিছু দুশ্চিন্তার সবই যেন তার মাথায় চেপে বসেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে রীতিমতো বিরক্ত হয়। কাউকে বলে—'আমি একটু একলা থাকতে চাই', কাউকে বা দুটো কড়া কথাও শুনিয়ে ছায়। সুবিমলকে অবিশ্যি সে বলেই রেখেছে—'আমি আমার ধাঁধার উত্তর পেয়ে গেছি। তোমাদের ধাঁধার জবাবও আজ রাতে মিলবে।' তাই যদি হয় তবে এখন আর মুখ ভার করে বসে থাকার কি দরকার? এ প্রশ্নের উত্তর অবিশ্যি সে নতুন-বৌ'এর কাছ থেকে পেয়ে গেছে—'বৌ-মানুষের যে কত জ্বালা, সে আর তোমরা কি বুঝবে?' কিন্তু তা বল্লেই তো সব কিছু চুকেবুকে যায় না। বলা নেই, কওয়া নেই,

গুরুদেবকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গ্যালো। এ খবরটা বাবাকে দিতে বেচারা সুবিমলের সাহসেই কুলোচ্ছে না। বাবা শুনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন না। আবার এদিকে এর যতকিছু দায়-দায়িত্ব নতুন-বৌ'এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সে বলতেও পারবে না—'আমায় মাফ করবেন বাবা। এসব আপনার নতুন-বৌ'এর কাণ্ড।' তার হয়েছে এক উভয় সঙ্কট। এর ওপর আবার ধাঁধা। তার আবার উত্তর! শ্বশুরমশায় বোধ হয় ঠিকই বলেছিলেন। বাবা তাঁর মেয়েকে চিনবে না, তো চিনবে কে? নতুন বৌ'এর মাথায় নিশ্চয়ই কিছু ভর করেছে। তাই সে মনে মনে ধাঁধা তৈরী করে চলেছে এবং নিজে নিজেই সে সব ধাঁধার জবাব খাড়া করছে। আজ রাতে অবিশ্যি তার ধাঁধার জবাব মিলবে—এই যা ভরসা। দেখাই যাক। আজ রাতটা তো কাটুক, তারপর বাবাকে সবকিছু খুলে বলতেই হবে।

রাতটা কিন্তু ভালোয় ভালোয় কাটলো না। ধাঁধার জবাব অবিশ্যি মিলেছে। কিন্তু সে জবাবটাকে সুবিমল কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। আর তাকে কেটে ফেললেও বাবার কাছে এ সমস্ত কথা সে কিছুতেই বলতে পারবে না। এ যে একেবারে আষাঢ়ে গল্প। নতুন-বৌ'এর মাথার তাহলে সত্যিই কিছু গোলমাল আছে না কি? কিন্তু নতুন-বৌ'এর সেই এক কথা —'আমি এতদিন ধরে এই কথাটাই সারাক্ষণ মনে মনে তোলাপাড়া করেছি। দেখতে আমার কিছুমাত্র ভুল হয় নি। আমি যা বলছি তাই করো—এবং তা কাল সকালেই বাবাকে সবকিছু খুলে বলো।' আসল ভয়টা তো সেখানেই। এ সব কথা শুনলে বাবা আর কি তার মুখ দেখবেন? এ যে মহা কেলেঙ্কারির কথা। কিন্তু নতুন-বৌ যা জেদী মেয়ে! বাবাকে না বলেও তার পার পাবার উপায় কোথায়? এইসব ভাবনাগুলো সারা রাত্তির ধরে তার মাথার মধ্যে দাপাদাপি করতে লাগলো। কাজেই ঘুমের তার দফারফা। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগতে সে অবিশ্যি ঘুমিয়ে পড়লো। নতুন-বৌ কিন্তু রাতভোর বেশ নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে নিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে বাবাকে একফাঁকে আড়ালে পেলো সুবিমল। কোনো-রকমে কথা কটা সে বাবার কাছে বলে যেন দায় খালাস হলো। যা ভেবেছিলো, ফল কিন্তু ঠিক তাই হলো। শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখখানা একেবারে আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে হয়ে উঠলো। এই যেন ফেটে পড়ে আর কি? কিন্তু রেগেমেগে চেঁচামেচি করে বাড়ী মাথায় করা কি সমাদ্দারমশায়'এর মত লোকের মানায়? তিনি খানিকটা গুম মেরে বসে

রইলেন,—মানে ব্যাপারটা আগাগোড়া মনে মনে খতিয়ে দেখে নিলেন। তারপর ধীর স্থির ভাবেই বললেন—'বৌমার সঙ্গে কথা বলা দরকার।' তিনি বোধ হয় বুঝেই ফেলেছেন যে সুবিমলের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করে কোনো লাভ নেই। আড়াল থেকে নতুন-বৌ সব কিছুই তাঁকে ধীরে ধীরে খুলে বললো। এবার অবাক হবার পালা তাঁর। নতুন বৌমাটী তাঁর একেবারে যাকে বলে সেই রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী। তিনি প্রসন্ন মনে বললেন—'তুমি যখন গুরুদেবকে নেমন্তন্ন করে এসেছো মা, তখন তোমার ইচ্ছেমতো সব ব্যবস্থাই করা হবে। তবে ব্যাপারটা আমি আর একটু তলিয়ে দেখি।' দিন ভোর তিনি কি করলেন তা আমরা জানি না। তবে সন্ধ্যে নাগাদ নতুন-বৌমাকে জানিয়ে দিলেন—'মা, আমি ভেবে চিন্তে দেখলাম যে তোমার কথাই ঠিক। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।' দূর থেকে বৌমাও তাঁকে গড় হয়ে প্রণাম জানালো।

পরের দিন সকালে আবার সাত-বেয়ারার পাল্কী ছুটলো মোহনপুরের আশ্রমের দিকে। সমাদ্দার-বাড়ীতে তখন যেন এক উৎসবের ধুম পড়ে গেছে। কে বলবে যে মাত্তর কদিন আগেই এ বাড়ীতে এত বড়ো একটা বিপদ ঘটে গেছে। গুরুদেব হাসি-ভরা মুখে যথাসময়ে হাজির হলেন। ভক্তিতে যেন আনত হয়ে পড়লো গোটা সমাদ্দার-বাড়ীর সব লোকজন। চললো প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের পালা। দুপুর বেলায় গুরুদেবের ভোগের এলাহি ব্যবস্থা করেছিলেন, সমাদ্দার-মশাই। গুরুদেব কিন্তু মোটেই গুরু-ভোজনে অভ্যস্ত নন। তিনি, সামান্যতেই সন্তুষ্ট। বাড়ীর সবাই পরে আনন্দ করে তাঁর পেসাদ পেলো।

তারপর গুরুদেবকে নিরিবিলি পেয়ে সমাদ্দার-মশাই তাঁর পাদুটো জড়িয়ে ধরে বললেন—

'বাবা, আমার যা কিছু তালুক-মুলুক আছে, সবই আজ থেকে আপনার আমাদের প্রার্থনা—আপনি আর ডাকাতি করবেন না।'

ঘরের মধ্যে যেন একসঙ্গে একশো বাজ পড়লো। রাগে, অপমানে লাল হয়ে উঠলেন গুরুদেব। এমন সময় আড়াল থেকে নতুন-বৌ এসে গুরুদেবের পায়ের উপর যেন আছড়ে পড়লো। বললো—

—বাবা আমি আপনার অবোধ মেয়ে। অপরাধ সব আমারই।

গুরুদেব কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—

—তুমি কি করে জানলে যে আমি ডাকাতি করে বেড়াই।

নতুন-বৌ এবার মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে—

—ডাকাতির সময় আমি আলখাল্লাধারীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে আপনার ছেলের প্রাণভিক্ষে চেয়েছিলাম। তখনই আমার চোখে পড়ে যে ডাকাতের সর্দারের বাঁ পায়ে একটা লম্বা কাটা দাগ। আমি চমকে উঠি—এ রকম কাটা দাগ কার পায়ে যেন কদিন আগেই দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না যে কার পায়ে দেখেছি ঠিক এমন একটা দাগ। খাওয়া দাওয়া আমার মাথায় উঠলো। দিনরাত এই চিন্তাই। উঠতে বসতে মনের ভেতর খচ্‌খচ্‌ করতে লাগলো। মা কালীই আমাদের গাঁয়ের জাগ্রত দেবী। আকুল হয়ে তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। শেষে তাঁরই আশীর্ব্বাদে একদিন হঠাৎ মনে পড়লো যে বিয়ের পর প্রণাম করার সময় আপনারই পায়ে দেখেছি এই কাটা দাগ। কিন্তু এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা। এযে কাউকে বলাই যায় না! তারপর এ বাড়ীতে সবাই আপনাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। তাই ভাবলাম—

এতক্ষণে গুরুদেব সব কিছুই বুঝতে পেরেছেন। মুখেও তাঁর ফিরে এসেছে স্বাভাবিক প্রসন্নতা। তিনি হেসে বললেন—

—তাই বুঝি মা তুমি প্রণাম করার ছলে আমার আশ্রমে গিয়েছিলে। অনেকক্ষণ আমার পা জড়িয়ে ধরে বসেছিলে। তখন আমার পায়ের দাগ দেখে তোমার মনে আর কোনো সন্দেহই রইলো না। কেমন?

—সন্তানের অপরাধ নেবেন না, বাবা। আর ব্যাপারটার একটা ফয়সাল্লা করার জন্যেই—

—বুঝেছি মা, আর তোমায় কিছু বলতে হবে না। মার কাছে কিছুই লুকোতে নেই। তাই মা। তোমার কাছে আমি সব দোষই কবুল করলাম। আলখাল্লাধারী ডাকাত ও আমি একই লোক। পায়ের কাটা দাগটা লুকোবার জন্যেই আমি আলখাল্লা পরতাম। কিন্তু মার কাছে আর আমার জারি জুরি খাটলো কই? তা মা, ডাকাত তো ধরে ফেললে, এবার তার বিচারের ব্যবস্থা করো।

—এ সব কথা শুনলেও পাপ হয়, বাবা।

এই কথা বলে নতুন-বৌমা আবার গড় হয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করলো। গুরুদেব তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললেন—

—বেশ! বিচার না হয় দেশের দারোগা-হাকিমেরাই করবেন। তবে আমার সাফাই, আমি মা তোমার কাছেই রেখে গেলাম। কিছুকাল

আগে এ অঞ্চলের বাগ্দীদের নিয়ে আমি একটা ডাকাতের দল গড়ি। —কিন্তু কেন? আমি বিয়ে-থা করিনি। বিঘে চল্লিশের জোত-জমিও আমার আছে। শিষ্য ভক্তদের কাছ থেকে প্রণামী যা পাই, তাও কিছু কম নয়। আমার তো তাহলে ভাল ভাবেই চলে যাবার কথা। কিন্তু গোটা কচুয়া থানার দুঃখী লোকদের মুখে হাসি ফোটাবার ভার যে মাথায় তুলে নিয়েছে, তার কি এতে চলে মা? মোটেই চলে না। তাই নাচার হয়ে আমাকে ডাকাতির পথই ধরতে হয়েছে। অবিশ্যি বড়লোক ছাড়া আমি কারুর বাড়ীতেই হানা দিই নি। অকারণে খুন-জখমও আমি কখনো করিনি। মিথ্যে কথা আমি বলি না। আর মার কাছে মিথ্যে কথা বলে এ সন্তান কি আর পার পাবে? ডাকাতির টাকাও আমি কখনো ছুঁই নি। সে সব টাকা বা গয়নাপত্তর দরিদ্র নারায়ণের ভোগেই লেগেছে।

—বেশ তো, বাবা। আজ থেকে আমাদের তালুক-মুলুক সবই আপনার। এবার দরিদ্র নারায়ণের ভোগের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করুন না কেন?

—না, মা। তার আর দরকার নেই। তোমাদের সম্পত্তি তোমাদেরই থাক। এবার থেকে সেবার কাজ শিষ্যদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, কালীমায়ের নাম জপেই পাপ ক্ষয় করার চেষ্টা করবো।

বিকেলের দিকে, রোদ পড়লে, সাত-বেয়ারার পাল্কী করেই অভয়ানন্দ স্বামী তাঁর আশ্রমে ফিরে এলেন। তার আগে সমাদ্দার-বাড়ীর সবাইকে প্রাণ ভরে তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন। নতুন-বৌএর মাথায় হাত দিয়ে হাসতে হাসতে শিষ্যকে বললেন—

—এ বেটী আমাদের একাধারে দুঁদে দারোগা, বাঘা উকিল ও কড়া হাকিম। তোমার জয় হোক, মা। কি বলো, বাবা?

বাবা হাসি মুখে মাথা নেড়ে জানালেন।

—সে আর বলতে!

এ কাহিনী কারুর জানার কথা নয়। তবে কি করে জানি না সমাদ্দার-বাড়ীর দেয়াল-দেউড়ি টপকে কথাগুলো লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই জানলো যে তাদের স্বামীজীই হলেন আলখাল্লাধারী ডাকাত— ডাকাত দলের সর্দার। সেই থেকে অভয়ানন্দ স্বামীর নামই হয়ে গ্যালো—'ঠাকুর-ডাকাত'। আজও সে অঞ্চলের পুরোনো লোকজনের মুখে ঠাকুর-ডাকাতের গল্প শুনতে পাওয়া যায়।

কচুয়া থানার দারোগাবাবু সব খবর শুনে নিশ্চয়ই বিস্ময়ের ধাক্কায় একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলেছিলেন—যাক্! এতদিনে আলখাল্লাধারীর লীলা খেলা শেষ হলো। কিন্তু একগাদা মামলার দায় থেকে তিনি কেমন করে অভয়ানন্দ স্বামীকে রেহাই দিয়েছিলেন, সে খবব আমার জানা নেই।

॥ সমাপ্ত ॥